JACK LONDONER SRESTHA GALPA

Rama Bhattacharjee/Sidhartha Ghosh

প্রথম প্রকাশ
১৫ই এপ্রিল, ১৯৬৮

প্রকাশক
সুনীলকুমার ঘোষ এম. এ.

প্রচ্ছদ
পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রাকর
সতীশচন্দ্র সিকদার
বন্দনা ইম্প্রেশন প্রাইভেট লিঃ
৯এ, মনমোহন বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রকাশকের নিবেদন

পৃথিবীর সব দেশেই এমন কিছু সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেন যাঁদের রচনা দেশকালের গণ্ডী অতিক্রম করে সমগ্র মানব সমাজকে মুগ্ধ করে। তাঁদের সাহিত্যকর্ম গভীর সমাজ চেতনায় ও কল্যাণের আদর্শে নিবেদিত।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কৌতূহলের সীমা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ফলে একে অপরকে জানার আগ্রহও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং এই কারণেই শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আদান-প্রদান শুরু হয়ে গেছে অনেকদিন আগে থেকেই। রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক কারণেই আমাদের দেশের কিছু মানুষ ইংরেজী ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল এবং ক্রমে ক্রমে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য এদেশের শিক্ষিত মানুষের কাছে একটি আবশ্যিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

আমাদের দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সেরা সাহিত্যিকদের রচনা এই বিষয়ের ছাত্রদের প্রায় অবশ্য পাঠ্য।

আমেরিকার প্রথম সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার লেখক জ্যাক লণ্ডন। এঁর রচনা আমেরিকার পরিমণ্ডল অতিক্রম করে সর্বদেশের পাঠকের কাছে সমাদৃত। সুতরাং তুলনামূলক সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদের এই কৃতি সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির অনুবাদ কাজে লাগবে মনে করেই এই শ্রেষ্ঠ-গল্প সংকলন প্রকাশিত হলো।

রমা ভট্টাচার্য ও সিদ্ধার্থ ঘোষ জ্যাক লণ্ডনের দুরূহ অথচ শ্রেষ্ঠ ছটি গল্পের সযত্ন অনুবাদ করেছেন। এজন্য ওদের দুজনকে ধন্যবাদ।

প্রকাশক—

জ্যাক লণ্ডন : আমেরিকান বিদ্রোহী

লেনিন জ্যাক লণ্ডনের গল্প পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন, 'ব্যাটল্‌শিপ পোটেমকিন্'-এর জন্মদাতা চিত্রপরিচালক চিরস্মরণীয় আইজেন্‌স্টাইন্ তাঁর 'মেক্সিকান'-গল্পটিকে প্রোলেট্‌কাল্ট থিয়েটারে মঞ্চস্থ করার সূত্রে কর্মজীবনে পদক্ষেপ করেছিলেন, আর আমেরিকার সমাজতন্ত্রী পত্রিকা 'নিউ মাসেস্'-এ মার্টিন রুশ্যাক্ তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন :

'একজন খাঁটি প্রলেতারীয় লেখককে শুধু শ্রমিক শ্রেণীর কথা লিখলেই চলবে না, তাঁর লেখা যাতে শ্রমিক শ্রেণীর সকলে পড়ে সেটাও দেখতে হবে। শুধু প্রলেতারীয় জীবনের কথাকে লেখার বিষয় করলেই চলবে না, খাঁটি প্রলেতারীয় সাহিত্য বিদ্রোহের আগুনে জ্বলবে। জ্যাক লণ্ডন ছিলেন এমনি খাঁটি প্রলেতারীয় সাহিত্যিক, আমেরিকার প্রথম এবং আজ অবধি একমাত্র প্রলেতারীয় সাহিত্যিক। অক্ষর-জ্ঞান সম্পন্ন এমন একজন শ্রমিক নেই (আমেরিকায়) যিনি জ্যাক লণ্ডনের লেখা পড়েননি। আর কিছু না পড়লেও তাঁরা জ্যাক লণ্ডন পড়েছেন। সাহিত্যের সঙ্গে তাঁদের পরিচয়ের সাধারণ সূত্র—জ্যাক লণ্ডন। কারখানার মজুর, চাষী, মাঝি-মাল্লা, খনি-শ্রমিক, খবরের কাগজের ফিরিওলা—সবাই তাঁর লেখা পড়েছেন। আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণীর সবচেয়ে প্রিয় লেখক জ্যাক লণ্ডন।'

জ্যাক লণ্ডনের আগে আমেরিকার বাস্তববাদী গদ্য সাহিত্যিকদের মধ্যে 'রাস্তার মেয়ে ম্যাগি'র লেখক স্টিফেন ক্রেন ও 'অক্টোপাস'-এর লেখক ফ্র্যাঙ্ক নরিস্ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার নিষ্ঠুর অত্যাচারী সত্তাটিকে উদ্‌ঘাটিত করেন। কিন্তু জ্যাক লণ্ডনই প্রথম সচেতন বাস্তববাদী সাহিত্যিক যিনি একটা নতুন ও উন্নততর সমাজ গঠনের কথা প্রচার করেন—**সমাজতান্ত্রিক সমাজ**।

১৮৭৫ এর ১২ই জানুয়ারি জ্যাক লণ্ডনের জন্ম হয় ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান ফ্রান্সিসকোয়। এই সময় সারা আমেরিকা জুড়ে নেমে এসেছিল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পৌনঃপুনিক অবদান অর্থনৈতিক মন্দার কালো ছায়া। লণ্ডনের বয়স যখন এক, আমেরিকায় তখন লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার, লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের মজুরি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজের সন্ধানে ভবঘুরে জীবন গ্রহণ করেছে, বাস করেছে বাসের অযোগ্য বস্তিতে, ডাস্টবিনের নোঙরা ঘেঁটেছে রত্নসম এঁটোকাঁটার সন্ধানে। এই বিভীষিকার মধ্যেই শ্রমিক পরিবারের সন্তান জ্যাক লণ্ডনের প্রথম পাঁচটা বছর কেটেছে। তারপর—জ্যাক লণ্ডনের নিজের বিবৃতি অনুসরণ করাই বাঞ্ছনীয়—

'আমার স্থান ছিল সমাজের নিম্নতম অংশে। এখানে জীবনের কাছ থেকে শুধু নীচতা দীনতা আর হীনতা ছাড়া পাবার কিছু ছিল না। যেখানে দেহ ও মন, রক্তমাংস ও আত্মা, উভয়ই সমান ভাবে ক্ষুধাপীড়িত ও বঞ্চিত।

আমার মাথার ওপরেই ছিল সমাজ নামক সুউচ্চ অট্টালিকাটি। আমি ভাবতাম একমাত্র ওখানে আরোহণ করতে পারলে তবেই মুক্তি পাবো। তাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল আমার—ওপরে উঠবোই।......কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে থেকে ওপরে ওঠা খুব সহজ কাজ নয়।.. ওপরে ওঠবার সিঁড়িটা খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর।'

'আমার শৈশব কাটে ক্যালিফোর্নিয়ার কৃষিক্ষেত্রে, আমার বাল্যকাল কাটে একটি প্রাণপ্রাচুর্যময় পশ্চিমা শহরের রাস্তায় রাস্তায় সংবাদপত্র ফিরি করে, আমার কৈশোর কাটে স্যানফ্রান্সিসকো বে ও প্রশান্ত মহাসাগরের জলে ভেসে। আমি মুক্ত দুনিয়ার জীবনটা ভালবেসেছি, মুক্ত দুনিয়ায় খেটেছি, কঠিনতম কাজে অংশ নিয়েছি। মুক্ত দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে আমি বলেছি—তোমাকে আমার ভাললাগে, যে কোন রূপে তোমায় আমার ভাললাগে। আবার বলছি, আমার এই আশাবাদের কারণ, আমি ছিলাম সুস্থ ও সবল, দুর্বলতা কাকে বলে জানতাম না, অসুস্থতার কারণে কোন কর্মদাতা কোনদিন ফিরিয়ে দেয়নি। কয়লা যোগাড়ে, কী নাবিক হিসেবে বা যে-কোন কায়িক পরিশ্রমের কাজ একটা না একটা জুটে যেতই। প্রকৃতির প্রিয়পাত্র হিসেবে 'সবল বাহু অভিজাত' হতে পেরে আমি গর্বিত বোধ করতাম।...আমার চেয়ে বেশী অনুগতভাবে কেউ পুঁজিপতিদের কাছে চাকরির দাসত্ববৃত্তি করেনি।'

'শেষ পর্যন্ত অত্যধিক কাজের চাপ অসহ্য হয়ে উঠল। সব কাজকর্ম ছেড়ে ভবঘুরের জীবন বেছে নিলাম। যে আমি ছিলাম শ্রমিক শ্রেণীর সন্তান, আঠার বছর বয়সে পৌঁছে দেখলাম আরো তলিয়ে গেছি সমাজের গহ্বরে। ভীতিই আমাকে ভাবতে বাধ্য করাল। বাঁচা মানেই খাদ্য ও বাসস্থান। খাদ্য ও বাসস্থান পাবার জন্যে মানুষকে কিছু না কিছু বেচতে হয়। ব্যবসায়ীরা জুতো বেচে, রাজনীতিকরা বেচে পুরুষত্ব, জনতার প্রতি-নিধিরা কিছু ব্যতিক্রম বাদে তাদের বিশ্বাস বেচে, আর প্রায় সবাই বেচে দেয় তাদের মর্যাদা। নারীরাও—সে রাস্তাতেই হোক, কী বিবাহের ধর্মীয় বন্ধনের মধ্যেই হোক, দেহ বেচতে বাধ্য। শ্রমিক শ্রেণীর বেচবার মতো পণ্য একটাই—পেশীশক্তি। বাজারে শ্রমের মর্যাদার কোন মূল্য নেই। শ্রমিকদের পেশীশক্তি আছে, শুধু পেশীশক্তি, যা বিকোনো যায়।

'কিন্তু এর মধ্যে একটা গুরুতর প্রভেদ আছে। জুতো, বিশ্বাস ও মর্যাদা আবার ফিরে পাওয়া যায়। এই পণ্যগুলোর ক্ষয় হয় না। পেশীশক্তির কিন্তু নবীকরণ সম্ভব নয়। ব্যবসায়ী তার জুতো বেচার পর আবার নতুন জুতো এনে ভাঁড়ারে পোরে। শ্রমিকের কিন্তু তার পেশীশক্তির ভাঁড়ার পুনরায় পূর্ণ করার কোন উপায় নেই। সে যত তার পেশীশক্তি বেচে ততই তার ঘাটতি বাড়ে। শেষপর্যন্ত পেশীশক্তির ভাঁড়ারে লালবাতি জ্বললে তার আর কিছুই করার থাকে না। সমাজের ভূগর্ভস্থ কুঠরিতে তিল তিল করে পচে মরতে হয়।

'আমি আরো জানতে পারলাম যে মস্তিষ্কও একটা পণ্য। তবে পেশীশক্তি বেচার সঙ্গে মস্তিষ্ক বেচার তফাত আছে। পঞ্চাশ বা ষাট বছরে পৌঁছে একজন মস্তিষ্ক বিক্রেতা সবচেয়ে বেশী দর পেতে পারে কিন্তু শ্রমিকরা পঁয়তাল্লিশ বা পঞ্চাশ বছর বয়সেই ভেঙে পড়ে বা নিঃশেষ হয়ে যায়।...আমি স্থির করলাম আর পেশীশক্তি বিক্রি নয়, এবার মস্তিষ্কের কারবারী হবো।'

এরপর শুরু হয় জ্যাক লণ্ডনের পড়াশোনা, জ্ঞানান্বেষণ। শেষ পর্যন্ত সফলও হন তিনি সমাজ অট্টালিকার উচ্চতম মহলে প্রবেশাধিকার লাভ করতে, কিন্তু আবার আসে মোহভঙ্গের পালা। ওপর তলার মার্জিত রুচি, বিদ্যা, চাকচিক্য আর প্রাচুর্যের বনিয়াদ গড়া হয় শ্রমিকের অস্থি মজ্জা দিয়ে। অভিজাতদের নিকট সংস্পর্শে আসতে লণ্ডনের চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল তাদের মধুমাখা আবরণের তলায় হিংস্র-কুটিল-নীচ স্বার্থপর মনগুলো। আবার ফিরে এলেন লণ্ডন শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে। তবে এবার সচেতনভাবে, সমাজতান্ত্রিক মানুষ হিসেবে। আবার ফিরে আসছি লণ্ডনের নিজের কথায় :

'সমাজের চোখ ধাঁধানো বিশাল অট্টালিকার প্রতি আর আমার কোন আকর্ষণ রইল না। আকর্ষণ রইল ওই অট্টালিকার ভিতটার প্রতি। একদিন না একদিন শাবল গাঁইতি হাতে বেশ কিছু লোক মিলে আমরা ওটাকে উপড়ে ফেলবো, সেইসঙ্গে দূষিত গলিত জীবন, জীবন্মৃত যত মানুষ, তাদের দানবিক স্বার্থপরতা ও রক্তপিপাসু বৈষয়িকতা সমস্ত ধূলিস্মাৎ হয়ে যাবে। তারপর শুরু হবে সব নোঙরা সরিয়ে মানুষজাতির নতুন বসতি গড়ার কাজ। এই বসতিতে ওপর তলার ঘর থাকবে না, এই বসতির প্রতিটি ঘরেই আলো আর হাওয়া খেলা করবে, সতেজ অমলিন বাতাস থেকে গ্রহণ করা হবে শ্বাস।

'আমি সেইদিনের জন্যে অপেক্ষা করছি, যেদিন মানুষ ক্ষুধা তাড়িত হয়ে কাজ করবে না, কাজ করবে মহত্তর প্রয়োজনে। আমি বিশ্বাস করি মানুষ

মহত—গৌরবময়। তাছাড়া আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে শ্রমিক শ্রেণীর ওপর। একই কারণে একজন ফরাসী বলেছিলেন: 'সময়ের সিঁড়িটা থেকে চিরকাল শুধু কাঠের জুতোর ওপরে ওঠার, আর পালিশ-করা জুতোর নীচে নামার শব্দ শোনা যায়।'

মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে জ্যাক লণ্ডনের মৃত্যু হয়। ষোল বছরের সাহিত্য জীবনে উনিশটি উপন্যাস, আঠারটি ছোটগল্প ও প্রবন্ধ সঙ্কলন, তিনটি নাটক ও আটটি আত্মজীবনী ও সমাজ বিষয়ক গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। এর মধ্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে সী উল্‌ফ, কল্‌ অফ দা ওয়াইল্ড, বার্নিঙ ডেলাইট, মার্টিন ইডেন ও আয়রন হিল। আয়রন হিল্‌ মার্ক্সবাদী সাহিত্য জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে তার উগ্র শ্রেণীসচেতনতায়, সশস্ত্র বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী বিজয়বার্তায়, ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা উৎপাটিত করে শ্রমিকরাজ স্থাপনের নিশ্চিত ঘোষণায়।

এই গ্রন্থের 'আগুন জ্বালতে হলে', 'জীবন-তৃষ্ণা' ও কিছু পরিমাণে 'গল্পের শেষে'—এই তিনটি গল্পের পটভূমি উনিশ শতকের শেষভাগের আলাস্কা অঞ্চল। স্বর্ণলাভের মরীচিকায় হাজার হাজার বেকার মানুষ তখন এখানে ছুটে এসেছে, রুদ্র প্রকৃতির সঙ্গে পাঞ্জা কশতে এতটুকু দ্বিধা করেনি।

'মেক্সিকান' গল্পটি মেক্সিকোর অসফল বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে। মেক্সিকোর স্বৈরতন্ত্রী একনায়ক পরফিরিও ডায়াজের বিরুদ্ধে মেক্সিকান জনতা বিদ্রোহে উদ্বেল হয়ে উঠলে, মার্কিন সরকার সাম্রাজ্যবাদীর অভিপ্রায় পূর্ণ করতে সৈন্য-বাহিনী প্রেরণ করে। সে সময় আমেরিকার সচেতন শ্রমিক শ্রেণী একটি পার্টি গঠন করে বিদ্রোহী বাহিনী তৈরি করেছিলেন বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করার জন্যে।

১৯০৯ সালে লেখা 'ডেব্‌সের স্বপ্ন' গল্পটি 'আয়রন হিল'-এর মতোই ভবিষ্যত বার্তা—১৯৪০ সালে সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী ধর্মঘট ডেকে তাদের অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছে। ইউজিন ভি ডেব্‌স্‌ ছিলেন আমেরিকার সোসালিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা নেতা।

শেষ জীবনে জ্যাক লণ্ডনকে সমাজতন্ত্রী মহল থেকে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁর চিন্তাধারা ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে বৈপরীত্যের সূত্রে। জ্যাক লণ্ডন ১৯১৬ সালে সোসালিস্ট পার্টির সদস্যপদে ইস্তফা দিতে আরো সোরগোল পড়ে যায়। তাঁর ইস্তফার কারণটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি সেদিন পার্টির কর্মধারার যে-সমালোচনা করেছিলেন পরবর্তী কালে তা সত্য হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জ্যাক লণ্ডনের ইস্তফা পত্রের একাংশ—

'আমার সোসালিস্ট পার্টিতে ইস্তফা দেবার কারণ, পার্টির চরিত্রে বলিষ্ঠতা ও লড়াকু মনোভাবের অভাব, শ্রেণী সংগ্রামের ওপর গুরুত্ব আরোপ না করা। আমার বিশ্বাস এই যে, শ্রমিক শ্রেণী একমাত্র লড়াই করেই নিজেদের মুক্ত করতে পারে। শত্রুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে নয়, শত্রুর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে নয়। কয়েক বছর যাবত আমেরিকায় সমাজতন্ত্রবাদের রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে শান্তিরক্ষা করা ও আপোষ করে চলা। পার্টির সদস্য থাকার আর আমার অভিপ্রায় নেই। তাই এই ইস্তফা।'

রমা ভট্টাচার্য

সিদ্ধার্থ ঘোষ

আগুন জ্বালতে হলে

দুর্জয় একটি শীতের সকাল। দিনের আলো ফুটেছে কিন্তু চারধার ঘোলাটে। লোকটি এতক্ষণ ইউকন নদীর তীর বরাবর পায়ে হাঁটা পথটা ধরে এগোচ্ছিল। এবার নদীর তীর ছেড়ে খাড়া চড়াই বেয়ে উঠে এল পাড়ের ওপর। দেবদারু বনের মাঝ দিয়ে পূর্ব দিকে চলে গেছে সরু একটা পায়ে হাঁটা পথ। পথটিতে মানুষের পায়ের চিহ্ন খুব কমই পড়েছে বোধহয়। চড়াই ভেঙে সমতলে উঠে হাঁপিয়ে পড়ে লোকটি। দম নিতে একটু দাঁড়ায়। নিজের দুর্বলতাকে সে নিজের কাছেও ব্যক্ত করতে নারাজ। এমন ভাবে ঘড়ির দিকে দৃষ্টি ফেরায় যেন ক'টা বেজেছে দেখার জন্যেই থামা। বেলা কম হয়নি, ন'টা বাজে। আকাশের বুকে একটুও মেঘ জমেনি, তবু সূর্যের দেখা নেই, কোন লক্ষণই নেই দেখা দেবার। মেঘমুক্ত দিনটির ওপর যেন বিষণ্ণতা তার ওড়না বিছিয়ে রেখেছে। প্রতিটি বস্তুকে ঘিরে রয়েছে একটা মলিন ধূসরতা। সূর্যের আত্ম-প্রকাশ ঘটেনি বলেই এরকম লাগছে। অবশ্য লোকটি তার জন্যে বিন্দুমাত্রও চিন্তিত নয়। কেননা সূর্যহারা দিনের সঙ্গে ওর দীর্ঘ-দিনের পরিচয়। পরপর বেশ কয়েক দিন সূর্য ওঠেনি এবং আরো কয়েক দিন উঠবেও না, তারপর হঠাৎ একদিন দক্ষিণ গগনে একটি রক্তিম পিণ্ড মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়েই আবার দিগন্ত পারে মুখ লুকাবে।

লোকটি পিছনে ফেলে আসা পথের দিকে তাকাল। মাইল খানেক চওড়া ইউকন নদীর ওপর তিন ফুট বরফের কঠিন আস্তরণ। তার ওপর আবার তিন ফুট উঁচু তুষারপুঞ্জ অমলিন শুভ্রতার বুকের ওপর ছোট ছোট ঢেউ-এর মতো বিছিয়ে আছে। উত্তর কি দক্ষিণ যে দিকে তাকান যাক শুধু অবিচ্ছিন্ন তুষারের আবরণ আর তার মধ্যে চুলের মতো একটি রেখা এঁকে বেঁকে এগিয়ে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। এইটিই প্রধান সড়ক। আর এই সড়কের ওপরেই

লোকটি এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তুষার সমুদ্রের মধ্যে যেন দ্বীপের মত নিঃসঙ্গ এই দেবদারু বনভূমি। সুদূর উত্তরে অবশ্য আরেকটি দেবদারু গাছের দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। পথরেখাটি ওই খানেই লুপ্ত হয়েছে। পথটির দক্ষিণ-মুখী দৈর্ঘ্য পাঁচশো মাইল। চিলকুট পাশ, ডাইয়া হয়ে সমুদ্রের তীরে গিয়ে শেষ হয়েছে। উত্তরে এগোলে হাজার মাইল পার করে পথটি এসে পড়েছে মুলাটোয়। মুলাটো ছেড়ে আরো হাজার মাইল পেরিয়ে পথটি বেরিঙ্ সাগরের কুলে সেণ্ট মাইকেলে এসে শেষ হয়েছে।

চুলের মতো সরু এক ফালি এই রহস্যময় পথ, সূর্যহীন আকাশ, তীব্র শীত বা বিচিত্র কতকগুলো পরিস্থিতির সমাবেশ—কোনটাই লোকটির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। লোকটি যে দীর্ঘকাল এ জীবনে অভ্যস্ত তাও নয়। বলতে গেলে সে সম্প্রতিই এসেছে। এ অঞ্চলের শীতকালের সঙ্গে এই-ই তার প্রথম পরিচয়। মুস্কিল বেধেছে লোকটির চিন্তাশক্তি অত্যন্ত কম বলেই। জীবনে যাই ঘটুক না কেন সে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে খাপ খাইতে নিতে পারে, কিন্তু তার ভবিষ্যৎ ফলাফল কি হবে সে সম্বন্ধে কোন ধারণা করতে পারে না। মাইনাস পঞ্চাশ ডিগ্রি মানেই হিমাঙ্কের নীচে আশি ডিগ্রি পরিমাণ তুষার। এই অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যাপারটার গুরুত্ব বলতে সে বোঝে শুধু ঠাণ্ডায় খানিকটা অস্বস্তি বোধ করা। আর কিচ্ছু না। সে একবারও ভাবেনা যে মানুষ চিরঞ্জয়ী নয়, শীত ও গ্রীষ্মের একটা নির্ধারিত মাত্রার মধ্যেই তার পক্ষে জীবন ধারণ করা সম্ভব। সে কোনদিনই মানুষের নশ্বর দেহের কথা ভাববে না, মহাবিশ্বে মানুষের স্থান কোথায় তাই নিয়ে চিন্তিতও হয়ে পড়বে না। তাপমাত্রা শূন্য ছাড়িয়ে পঞ্চাশ ডিগ্রি নীচে নামা মানে তার কাছে হাড় কাঁপানো শীতে কষ্ট পাওয়া আর তাই তার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে পশমী দস্তানা, কানঢাকা টুপি, গরম জুতো আর মোটা মোজা পরা। মাইনাস পঞ্চাশ ডিগ্রি মানে তার কাছে মাইনাস পঞ্চাশ

ডিগ্রি। এছাড়াও যে এর আর কোন অর্থ থাকতে পারে সেটা তার মগজে কোনদিনই ঢুকবে না।

যাত্রা শুরু করার আগে কি ভেবে লোকটা হঠাৎ থুতু ফেলল। অমনি পটকা ফাটার মতো একটা তীক্ষ্ণ শব্দ হল। লোকটি আবার থুতু ছেটাল। আবার পটকা ফাটার শব্দ। লোকটি অবাক হয়ে ভাবে হিমাঙ্কের পঞ্চাশ ডিগ্রি নীচে তুষারের সংস্পর্শে এলে থুতু এরকম শব্দ করে ফাটে কিন্তু এখন তো তুষার স্পর্শ করারও প্রয়োজন হচ্ছে না! বাতাসেই বিস্ফোরণ ঘটছে। তার মানে পায়ের নীচে তাপমাত্রা পঞ্চাশ ডিগ্রিরও কম। অবশ্য কতটা কম তা জানার উপায় নেই, আর তা নিয়ে ওর চিন্তাও নেই। এখন ওর হেণ্ডারসন খাঁড়ির বাঁ ফালিতে অবস্থিত খনি অঞ্চলটায় পৌঁছানো দরকার। দলের বাকী লোকেরা ইতিমধ্যেই সেখানে হাজির হয়েছে। ওরা ইণ্ডিয়ান ক্রিক প্রদেশ থেকে জলভাগ পেরিয়ে এসেছে আর চলেছে একটু ঘুরপথে। ইউকন দ্বীপ থেকে বসন্তকালে গাছের গুঁড়ি সরবরাহ করা যাবে কিনা খোঁজ নেবার জন্যই এই পথে ওর আগমন। ছ'টার মধ্যেই শিবিরে পৌঁছে যাবে নিশ্চয়। ততক্ষণে অন্ধকার নেমে আসবে ঠিকই কিন্তু শিবিরে পৌঁছে গেলে আর দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। ততক্ষণে ওরা আগুন জ্বেলে ফেলবে। রাতের খাবারও তৈরি থাকবে। আর দুপুরের খাওয়া—কথাটা মনে পড়তেই ও পেটফোলা জ্যাকেটের ওপর হাত ঠেকায়। জ্যাকেট আর শার্টের তলায় একেবারে গায়ের চামড়া স্পর্শ করে আছে একটা পুঁটলি। রুমাল দিয়ে জড়ানো বিস্কুটগুলো যাতে জমে না-যায় তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। বিস্কুটের কথা মনে পড়তেই লোকটির মুখে ঈষৎ হাসির আভাস দেখা দেয়। শুয়োরের চর্বি মাখানো বিস্কুটগুলো টুকরো করে কাটা আছে আর টুকরোগুলোর মাঝে আছে শুয়োরের মাংসের পুরু পুরু ফালি।

লোকটা এবার দেবদারু গাছের ফাঁক দিয়ে এগোতে শুরু করে। শেষ শ্লেড গাড়িটা পেরিয়ে যাবার পর কম করে অন্তত এক ফুট

তুষারপাত হয়েছে। লোকটি ভাবে ভাগ্য তার ভাল যে সঙ্গে স্লেভ গাড়ি নেই। সঙ্গে মালপত্র থাকলে এখন দারুণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত। সত্যি বলতে কি তার কাছে ওই খাবারের পুঁটলিটা ছাড়া আর কিছুই নেই। ও কিন্তু শীতের প্রকোপ দেখে বিস্মিত হয়। অবশ নাক আর গালের ওপর দস্তানা পরা হাতটা বোলায়। সত্যিই দারুণ ঠাণ্ডা পড়েছে আজকে। মুখভর্তি দাড়ি থাকা সত্ত্বেও গালদুটো একেবারে হিম হয়ে গেছে। নাকের ডগাটারও একই অবস্থা। যা উঁচু নাকটা, শীতল বাতাসের মধ্যে একেবারে যেন গুঁজে রয়েছে।

লোকটির পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে একটা ধূসর বর্ণ লোমওলা কুকুর। বুনো নেকড়ের একেবারে সাক্ষাৎ জাত ভাই। যেমন মেজাজ তেমনি তার চেহারা। কুকুরটাও ঠাণ্ডার চোটে কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে। ও জানে এটা পথ চলার উপযুক্ত সময় নয়। ইন্দ্রিয়-নির্ভর কুকুরটির বিশ্লেষণ দেখা যাচ্ছে বিচারক্ষম মানুষটির চেয়ে অনেক বেশী নির্ভুল। আসলে তাপমাত্রা এখন হিমাঙ্কের নীচে পঞ্চাশ ডিগ্রি নয়, ষাট ডিগ্রি নয়, এমন কি সত্তর ডিগ্রিও নয়। হিমাঙ্কের নীচে পঁচাত্তর ডিগ্রি। শূন্যের ওপর বত্রিশ ডিগ্রিতে হচ্ছে হিমাঙ্ক, তাই এখন যা তাপমাত্রা তাতে একশো ডিগ্রি সমান তুষারপাত হয়েছে। কুকুরটা থার্মোমিটার সম্বন্ধে অজ্ঞ। মানুষের মতো, 'খুব ঠাণ্ডা' বলে একটা অবস্থাকে সনাক্ত করার মতো ক্ষমতা খুব সম্ভবত কুকুরের মস্তিষ্কের নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও সহজাত প্রবৃত্তি বলে একটা জিনিস আছে। কুকুরটাও তাই একটা অস্পষ্ট অথচ ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার আশঙ্কায় কেমন জবুথবু হয়ে পড়েছে। লোকটির একেবারে পায়ে পায়ে জড়িয়ে রয়েছে। যেন প্রতি পদক্ষেপেই সে মানুষটিকে প্রশ্ন করছে, কী প্রয়োজন এদিকে যাবার? চলো সোজা ক্যাম্পে ফিরে যাই! নয়তো একটা আস্তানার সন্ধান করো। একটা আগুন জ্বালিয়ে তার পাশে বসা যাক!

কুকুরটার নিঃশ্বাসের সঙ্গে নির্গত জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে কণা কণা তুষার হয়ে তার গায়ের লোমের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। বিশেষ করে ঠোঁট, নাক আর চোখের পাতা একেবারে শুভ্র হয়ে উঠেছে। তবে কুকুরটির চেয়েও আরো বেশী পরিমাণে এবং আরো ঘন হয়ে তুষার জমেছে লোকটির লাল দাড়ি আর গোঁফের ওপর। এক এক বার উষ্ণ নিশ্বাস পড়ছে আর জমাট বরফের পরিমাণ আরো বাড়ছে। লোকটি খৈনি চেবাচ্ছে কিন্তু ঠোঁটের চারপাশে বরফ থাকার দরুণ ভাল ভাবে হাঁ করে পিচ ফেলতে পারছে না। ফলে পিচটা চিবুক দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে আর সঙ্গে সঙ্গেই জমাট বেঁধে খয়েরী রঙের একটা স্ফটিকের দাড়ির উত্তরোত্তর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করছে। দৈবাৎ ও যদি পড়ে যায় ভঙ্গুর কাঁচের দ্রব্যের মতো ওই দাড়িটিও গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়বে। তবে এই অভিনব অঙ্গ-সংযোজন নিয়ে লোকটি মোটেই চিন্তিত নয়। এ অঞ্চলে যাদের খৈনির নেশা আছে তাদের প্রত্যেককেই এই খেসারতটি দিতে হয়।

বেশ কয়েক মাইল সমতল বনভূমি অতিক্রম করে, একটি ছোট্ট নদীর পাড় ডিঙিয়ে লোকটি তুষার পূর্ণ নদীবক্ষে পদার্পণ করল। এটাই হেণ্ডারসন খাঁড়ি। আর দশ মাইল এগোলেই এই খাঁড়ির দ্বিধাবিভক্ত মুখটির কাছে পৌঁছানো যাবে। এখন দশটা বাজে। ঘণ্টায় ও চার মাইল করে এগোচ্ছে। কাজেই খাঁড়ির মুখটার কাছে পৌঁছতে বেলা সাড়ে বারোটা হবে। লোকটি ঠিক করল দুপুরের ভোজন পর্বটা ও ওখানে পৌঁছেই সারবে।

বরফ জমা নদীর ওপর নামতেই কুকুরটাও তাকে অনুসরণ করল। লেজটা প্রায় পেটের মধ্যে গুটিয়ে রেখেছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে কুকুরটা হতাশ হয়েছে। স্লেড চলার দাগ স্পষ্ট চোখে পড়ছে এখনো কিন্তু স্লেডের সহযাত্রীদের পদচিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেছে প্রায় ফুট খানেক তুষারের তলায়। গত এক মাসের মধ্যে এ অঞ্চলে কারুর পায়ের ছাপ পড়েনি। নীরবে লোকটি

এগিয়ে চলে। চিন্তা করার ব্যাপারটা ওর আদৌ আসে না। এই মুহূর্তে ওর মাথায় আছে শুধু দুপুরের ভোজন সাঙ্গ করার আর তারপর ক্যাম্পে গিয়ে অন্যদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার চিন্তা। সঙ্গে একজনও লোক নেই যে কথা বলবে। তবে কথা বলার লোক থাকলেও সে কথা বলতে পারত না। ঠোঁটের দু'ধারে জমে আছে বরফ। লোকটি শুধু একটানা খৈনি চিবিয়ে যাচ্ছে আর তার স্ফটিকের দাড়ি ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে।

এরই মধ্যে এক আধবার ওর মনে হয়েছে যে ঠাণ্ডাটা সত্যিই আজ খুব বেশী পড়েছে। এরকম অভিজ্ঞতা এই প্রথম। হাঁটতে হাঁটতেই বার বার সে দস্তানা পরা হাতের তালু দিয়ে একবার গাল ঘষছিল আর একবার নাক। প্রায় যন্ত্রচালিতের মতো আপনা থেকেই একবার বাঁ হাত আর একবার ডান হাত ব্যবহার করছিল। কিন্তু যতই ঘষুক হাত সরালেই ছাখে নাক আর গাল সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডায় আবার অবশ হয়ে যাচ্ছে। লোকটি বুঝতে পারে গালে তুষারক্ষত হবার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। মনে মনে অনুশোচনা হয় বাডের কথা মতো নাক ঢাকার একটা ব্যবস্থা করেনি বলে। ফিতে লাগানো নাক-ঢাকার ব্যবস্থাটা থাকলে গাল দুটোতেও আর তুষার-ক্ষত হত না। কিন্তু এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করার তেমন কোন কারণ নেই। গালে তুষার-ক্ষত হলেই বা কি? বড় জোর একটু যন্ত্রণা পেতে হবে। তেমন বিপজ্জনক কিছু ঘটার আশঙ্কা নেই।

লোকটির মাথায় কোন চিন্তা না থাকলেও তার দৃষ্টি কিন্তু অত্যন্ত সজাগ। খাঁড়ির এঁকাবেঁকা গতিপথ আর আটকে থাকা গাছের গুঁড়ির দিকে সতর্ক চোখ রেখে তবেই সে পদক্ষেপ করছে। একটা বাঁক পেরিয়ে প্রথম পা ফেলেই সে হঠাৎ যেন বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল। নিমেষের মধ্যে পা সরিয়ে নিল এক পাশে। তারপর পিছিয়ে এল কয়েক পা। ও জানে খাঁড়ির জল তলা অবধি সম্পূর্ণ জমে আছে। শীতকালে কোন খাঁড়িতেই জল

থাকা সম্ভব না হলেও এসব অঞ্চলে এমন অনেক পাহাড়ী ঝরনা আছে যার জল ওই বরফ জমা খাঁড়ির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় কিন্তু ঝরা তুষারের আড়ালে থাকে বলে ওপর থেকে কিছু বোঝা যায় না। যতই ঠাণ্ডা পড়ুক এইসব ঝরনার জল কিন্তু জমে না। এগুলো এক-একটা অত্যন্ত বিপজ্জনক ফাঁদ। কখনো কখনো আধ ইঞ্চি পুরু বরফের তলায়ও আত্মগোপন করে থাকে জলের কুণ্ড। বরফের ওপর আবার পড়ে থাকে তুষারের আস্তরণ। কখনো কখনো পরপর বেশ কয়েক স্তর জল আর বরফ এইভাবে লুকিয়ে থাকে। একবার যদি সেখানে পা পড়ে, একের পর এক বরফের পর্দা ভেঙে এক কোমর জলের মধ্যেও তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

ভীত হয়ে পিছিয়ে আসার কারণ এইটাই। স্পষ্ট টের পেয়েছে পায়ের চাপে মড়মড় করে উঠেছে এমনি একটা পাতলা বরফের পর্দা। তুষারে ঢাকা আছে তাই কিছুই বুঝতে পারেনি। এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় পা ভিজে যাওয়া মানেই হাঙ্গামা আর বিপদ। আর কিছু যদি নাও হয় যাত্রায় বিলম্ব তো হবেই। প্রথমেই একটা আগুন জ্বালতে হবে তারপর সেই আগুনের সামনে পা রেখে জুতো মোজা খুলে সেগুলো শুকিয়ে নিতে হবে। এক জায়গায় দাঁড়িয়েই খাঁড়ির পৃষ্ঠদেশ আর পাড়গুলো খুব ভাল করে পর্যবেক্ষণ ক'রে লোকটি শেষপর্যন্ত স্থির করে যে জলস্রোতটি এসেছে তার ডান দিক থেকে। নাক আর গাল ঘষতে ঘষতে খানিকক্ষণ চিন্তা করে শেষপর্যন্ত বেজার মুখে সে বাঁ-দিক ঘেঁষে চলতে শুরু করে। প্রতিটি পদক্ষেপের আগে আলতো করে একবার পা ছুঁইয়ে দেখে নিচ্ছে। বিপদসীমা অতিক্রম করে লোকটি আবার মুখে খৈনি পোরে। এতক্ষণে সে আবার আগের মতো ঘণ্টা পিছু চার মাইল বেগে হাঁটতে শুরু করেছে।

পরবর্তী দু'ঘণ্টার মধ্যে লোকটি বেশ কয়েকবার এরকম ফাঁদের সম্মুখীন হয়েছে। সাধারণত গুপ্ত জলের স্তর ওপর কুজমা

তুষারের মাঝখানটা একটু ভেতর দিকে বসে যায়। এটাই বিপদ সঙ্কেত জারী করে। এর মধ্যে একবার অবশ্য ও অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। হঠাৎ সন্দেহ হওয়ায় একটা জায়গায় ও কুকুরটাকে আগে ঠেলে দিয়েছিল। কুকুরটা প্রথমটায় যেতে চায়নি। শেষ পর্যন্ত তাড়া খেয়ে নিরুপায় হয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। সাদা বরফের ওপর ক' পা না এগোতেই হঠাৎ বরফ ভেঙে প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েছিল কুকুরটা। কোন রকমে সামলে নিয়ে সরে এসেছে। ততক্ষণে কিন্তু তার সামনের পা তুটো হীম শী'ল জলে ভিজে গেছে। জল থেকে পা বার করা মাত্র পায়ে যেটুকু জল লেগেছিল তা বরফ হয়ে জমে যায়। বরফ-মুক্ত হবার জন্যে কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে পা চাটতে শুরু করে দেয়। তারপর তুষারের ওপর বসে দাঁত দিয়ে কামড়ে কামড়ে পায়ের আঙুলের ফাঁকে জমা বরফ কাটতে শুরু করে। এটা একটা প্রবৃত্তিগত ব্যাপার। বরফটা থাকলে যে পায়ে ক্ষত সৃষ্টি হবে এ কথা কুকুরটা জানেনা, তবু তার প্রাণীসত্বার গভীরে জাত এক রহস্যময় নির্দেশকে সে মান্য করে। লোকটি কিন্তু ব্যাপারটা জানে বলেই ডান হাতের দস্তানা খুলে কুকুরটার আঙুলের ফাঁক থেকে বরফের কুচিগুলো সরিয়ে দেয়। দস্তানাটা আবার পরে নিতে মিনিট খানেকের বেশী লাগেনি কিন্তু লোকটি অবাক হয়ে দ্যাখে ইতিমধ্যেই আঙুলগুলো অবশ হয়ে গেছে। সত্যিই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আজ। তাড়াতাড়ি দস্তানাটা গলিয়ে নিয়ে বুকের ওপর সজোরে একটা থাপ্পড় কসাল অবশ ডান হাতটা দিয়ে।

ঠিক বারোটার সময় আকাশের উজ্জ্বলতা সবচেয়ে বৃদ্ধি পেল, কিন্তু সূর্য তার শীতকালীন সফরের পথে এখন সুদূর দক্ষিণে পৌঁছে গেছে তাই দিগন্ত আর উদ্ভাসিত হয়ে উঠল না। সূর্য আর হেণ্ডারসন খাঁড়ির মাঝখানে পৃথিবীর ফুলো পেটটা একটা অবরোধ সৃষ্টি করেছে। মাঝ তুপুরে মেঘমুক্ত আকাশের নীচে হেঁটে চলেছে লোকটি কিন্তু মাটিতে তার ছায়ার রেশও পড়ছে না। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে বারোটার সময় লোকটি হেণ্ডারসন

খাঁড়ির দ্বিধাবিভক্ত মুখটায় এসে পৌঁছল। নিজের হাঁটার গতি দেখে নিজেই খুব সন্তুষ্ট। এভাবে হাঁটতে পারলে ছ'টার মধ্যেই নিশ্চয় দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে। জ্যাকেট আর জামার বোতাম খুলে দুপুরের খাবারটা বার করে আনল। সেকেণ্ড পনেরোর বেশী সময় লাগেনি কাজটি সারতে কিন্তু তারই মধ্যে উন্মুক্ত আঙুলগুলো অবশতার শিকার হয়েছে। দস্তানাটা না পরে প্রায় দশ বারো বার হাতটা সে সজোরে থাবড়াল ডান পায়ের ওপরে। তারপর তুষার জমা একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে পড়ল খাবে বলে। পায়ে থাপ্পড় মারার জন্যে যে শিরশিরে ব্যথাটা প্রথমে অনুভব করেছিল দেখতে দেখতে সেটা কেটে গেল। এত দ্রুত আঙুলগুলোকে আবার অবশ হতে দেখে চমকে গেল লোকটি। বিস্কুটে একটা কামড় বসাবারও সুযোগ মেলেনি। ডান হাতের আঙুলগুলো দিয়ে আবার বার কয়েক থাপ্পড় কষিয়ে দস্তানাটা এবার গলিয়ে নিল। এবার বাঁ হাতের দস্তানাটা খুলেছে খাবে বলে। বিস্কুট কিন্তু মুখে পোরা গেল না। তার বরফজমা ঠোঁট ফাঁক হল না। আগেই আগুন জ্বেলে গায়ের বরফ গলিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেই লজ্জা পায় লোকটি। ইতিমধ্যে বাঁ হাতের আঙুলগুলো অসাড় হতে শুরু করেছে। লোকটি আরো অনুভব করল যে গাছের গুঁড়িটার ওপরে চড়ে বসবার সময় পায়ের আঙুলগুলো চিনচিন করে উঠেছিল কিন্তু এখন আর করছে না। তাহলে কি পায়ের আঙুলগুলোও অসাড় হয়ে গেল! পরীক্ষামূলক ভাবে মোকাসিনের মধ্যে আঙুল নাড়িয়ে দেখল সত্যিই অবশ হয়ে গেছে আঙুলগুলো।

ত্বরিতে দস্তানা পরে উঠে দাঁড়াল সে। আতঙ্কের ছোঁয়া লেগেছে। জোরে জোরে মাটির ওপর পা ঠুকতে শুরু করে দেয়। শেষ পর্যন্ত ব্যথার অনুভূতি ফিরে আসে। লোকটি ভাবে সত্যিই এমন ঠাণ্ডা সচরাচর দেখা যায় না। সালফার খাঁড়ির ওখানে সেই লোকটা ঠিকই বলেছিল। এ অঞ্চলের শীতের প্রকোপ

মাঝে মধ্যে এমনি দুঃসহ হয়ে ওঠে। তখন লোকটার কথা ও হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল। এর থেকেই বোঝা যায় সব বিষয়ে নিজের খুশী মতো সিদ্ধান্ত নেওয়াটা অনুচিত। আজকের শীতলতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। লোকটি আগু পিছু ছোটাছুটি শুরু করে দেয়, মাটিতে পা ঠোকে জোরে জোরে, হাত দিয়ে অনবরত চাপড় মারে। শেষ পর্যন্ত সাড় ফিরে এসেছে বুঝে নিশ্চিন্ত হয়ে আগুন জ্বালাতে দেশলাই বার করে। গত বছর বসন্তের সময় জোয়ারের জলে ভেসে আসা ডালপালা কাছেই এক জায়গায় জমা হয়েছিল। তার থেকেই ও আগুন জ্বালার কাঠ পেয়ে যায়। দু'একটা গাছের ডালে আগুন ধরিয়ে নেয় প্রথমে, তারপরে সেটা গনগনে আগুনের এক চুল্লীতে পরিণত হয়। আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমে মুখের ওপর জমা বরফ গলিয়ে নেয় তারপর সারে দ্বিপ্রহরের বিস্কুট ভক্ষণ। কিছুক্ষণের জন্য শীতলতা পরাস্ত হয়। কুকুরটাও সন্তুষ্ট চিত্তে যতটা সম্ভব আগুনের ধার ঘেঁষে পা ছড়িয়ে বসে।

খাওয়া শেষ করে পাইপে তামাক ভরে বেশ আমেজের সঙ্গে ধূমপানের পর্ব সাঙ্গ করে উঠে দাঁড়াল লোকটি। দস্তানাদুটো খুলে কানঢাকা টুপিটাকে বেশ ভাল করে টেনে দিল দু'কানের ওপর। আবার শুরু হল হাঁটা। কুকুরটা হতাশ হয়ে বারবার সতৃষ্ণ নয়নে পিছন ফিরে ফিরে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকাচ্ছে। এই লোকটির শীত সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। হয়তো তার বংশের কেউ কোনদিন প্রচণ্ড শীতের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেনি। তাপমাত্রা হিমাঙ্কের একশো সাত ডিগ্রি নীচে এই কথাটার অর্থ বোঝার সুযোগ পায়নি নিশ্চয়। কুকুরটা কিন্তু এর অর্থ বোঝে, তার পূর্বপুরুষরাও সবাই বুঝতো। তাই এই জ্ঞান সে উত্তরাধিকার সূত্রে আহরণ করেছে। কুকুরটা স্পষ্ট বুঝতে পারছে যে এই ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডায় পথচলার কোন মানেই হয় না। এখন তুষারের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে চুপটি করে তার মধ্যে ঢুকে বসে থাকার কথা।

তারপর আকাশে মেঘ ঘনালে বায়ু প্রবাহিত শীতের প্রকোপ যখন কমে আসবে তখন আবার শুরু করা উচিত পদযাত্রা। কিন্তু কুকুর আর লোকটির মধ্যে কোন সদ্ভাব নেই। কুকুরটি ওর ক্রীতদাস। যা বলা হয় ওকে তাই করতে হয় আর আদর বলতে জোটে শুধু চাবুকের ঘা আর কর্কশ কণ্ঠের শাসানি। এইজন্যেই কুকুরটি তার চিন্তার কথা মানুষটির কাছে ব্যক্ত করার কোন প্রয়াসই পায়নি। শুধু মানুষটির মঙ্গলের কথা ভেবে ও পিছন ফিরে অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকায়নি। তাকিয়েছিল নিজের আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই। লোকটি কিন্তু সেদিকে কোন আমল না দিয়েই শিষ দিয়ে আর হিসহিস শব্দে চাবুক মারার মতো করে ওকে শাসিয়ে উঠল। কুকুরটি সঙ্গে সঙ্গে কাছে চলে এসে আবার পিছনে পিছনে ছুটতে শুরু করল।

লোকটি আবার খৈনি পুরল মুখে। সঙ্গে সঙ্গে গজাতে শুরু করল স্ফটিকের নতুন দাড়ি আর ভিজে নিশ্বাস মুহূর্তের মধ্যে গোঁফ ভুরু আর চোখের পাতায় সাদা পাউডার হয়ে জমতে লাগল। হেণ্ডারসনের বাঁ ফালিতে আগের মতো ঝরনা নেই। প্রথম আধ ঘণ্টায় তো একটাও ঝরনা চোখে পড়েনি। কিন্তু তারপরেই দুর্ঘটনাটা ঘটল। জায়গাটা দেখে কিছু বোঝবার উপায় ছিল না। নরম তুষারের অবিচ্ছিন্ন আস্তরণ নিম্নাংশের কঠিনতার কথাই ঘোষণা করছিল। হঠাৎ হুড়মুড় করে জলের মধ্যে পড়ল লোকটি। গর্তটা খুব গভীর নয়। কোন রকমে নিজেকে টেনে হিঁচড়ে কঠিন জায়গার ওপর এসে উঠল যখন, হাঁটু অবধি ভিজে গেছে।

রাগত কণ্ঠে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে লোকটি। ছ'টার মধ্যে শিবিরে পৌঁছতে পারবে ভেবেছিল। এখন আরো এক ঘণ্টা দেরী হয়ে গেল। আগুন জ্বেলে পায়ের জুতো মোজা সব শুকিয়ে নিতে হবে। এত নিম্ন তাপমাত্রায় এটা বাধ্যতামূলক। দিক্ পরিবর্তন করে লোকটি পাড়ের ওপর উঠে আসে। পাড়ের ওপর কয়েকটা ছোট ছোট গাছের

গুঁড়ির চারদিক ঘিরে গজানো ঝোপ-ঝাড়ের গায়ে এসে আটকে রয়েছে বেশ কিছু জ্বালানী কাঠকুটো। গ্রীষ্মকালে জোয়ারের জলের সঙ্গে ভেসে এসেছিল। কাঠকুটোর মধ্যে বড়সড় কিছু ডালপালাও আছে। আর আছে, গতবছরের শুকনো পাতার রাশি। বরফের ওপর প্রথমেই ও কটা বড়সড় ডাল বিছিয়ে দিল। তা না হলে আগুন জ্বালা মাত্র বরফ গলে সব জলে চুবে নিভে যাবে। পকেট থেকে বার্চ গাছের একটা ছাল বার করে নিল। কাগজের টুকরোর চেয়েও এতে দ্রুত আগুন ধরে। জ্বলন্ত টুকরোটাকে বড় ডালপালার ওপর রেখে এবার ও তার ওপর শুকনো ঘাস আর ছোট-ছোট ডালপালা চড়াতে শুরু করল।

অত্যন্ত সতর্কভাবে ধীরে সুস্থে ও কাজ করে চলে। আশু বিপদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ। আগুনের শিখা আকারে ক্রমে বড় হয়ে ওঠায় সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় দেখে ডালপালা গুঁজে যায় লোকটি। তুষারের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে। ডালপালার জঞ্জাল থেকে একটা করে ডাল টেনে নিচ্ছে আর সটান গুঁজে দিচ্ছে আগুনে। ও জানে এখন কোন মতেই ব্যর্থ হওয়া চলবে না। তাপমাত্রা যখন শূন্য থেকে পঁচাত্তর ডিগ্রি নীচে নেমে যায় তখন আগুন জ্বালাবার প্রথম প্রচেষ্টায় বিফল হওয়া মারাত্মক। বিশেষ করে তার পা ছু'টো যদি ভিজে থাকে। পা যদি ভিজে না থাকে তাহলে আগুন জ্বালাতে না পারলেও আধ মাইল ছুটে নিয়ে রক্ত সঞ্চালন ফিরিয়ে আনা যায়। কিন্তু ভিজে বরফ-জমাট পায়ের রক্ত সঞ্চালন শুধু ছুটে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। তাপমাত্রা এখন হিমাঙ্ক ছাড়িয়ে পঁচাত্তর ডিগ্রি নেমে গেছে কাজেই যত জোরেই ছুটুক না কেন ওর ভিজে পা জমাট বাঁধবেই।

লোকটি এসব কথা ভালভাবেই জানে। গন্ধক খাঁড়ির অভিজ্ঞ লোকটির কাছে গত বছর এইসব গল্পই শুনেছে। লোকটিকে মনে মনে ধন্যবাদ জানায় ওকে এই গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দেওয়ার জন্যে। ইতিমধ্যেই তার পায়ের সাড় লোপ পেয়েছে। আগুন জ্বালাবার

জন্যে দস্তানা খুলতে বাধ্য হয়েছিল বলে আঙুলগুলো অবশ হয়ে গেছে। এতক্ষণ ঘণ্টায় চারমাইল বেগে হাঁটছিল তাই হৃৎপিণ্ডটা রক্ত পাম্প করে পাঠাচ্ছিল শরীরের সর্বত্র - প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শেষ-প্রান্ত পর্যন্ত। কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়া মাত্র পাম্পের গতি গেছে কমে। মহাশূন্য থেকে ঝরে পড়ছে শীতলতা—পৃথিবীর এই অনাচ্ছাদিত শীর্ষাঞ্চলে প্রচণ্ড তার প্রকোপ। আর সেই শীতল প্রকোপে তার দেহের রক্তও যেন ভয় পেয়েছে। ঠিক কুকুরটার মতোই বোধহয় জ্যান্ত তার দেহের রক্ত। তাই কুকুরটার মতো রক্তও চাইছে এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে লুকিয়ে পড়তে। ঘণ্টা পিছু চার মাইল করে হাঁটার সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কিন্তু এখন তাতে ভাঁটা পড়েছে, তার দেহের অন্দর-মহলের কোন এক ফোকরে গিয়ে সব জমা হয়েছে। অঙ্গের প্রান্তভাগগুলি প্রথম টের পেয়েছে রক্তের এই অনুপস্থিতি। ভিজে পা দুটো দ্রুত থেকে দ্রুততর জমে যাচ্ছে, বেআবরু আঙুল-গুলো জমে না গেলেও ক্রমশই আরো সাড় হারাচ্ছে। নাক আর গালও জমতে শুরু করেছে। সারা গায়ের চামড়া হিমশীতল হয়ে উঠছে রক্তসঞ্চালন কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু ওর আর ভয় নেই। আঙুল, নাক আর গালটাতেই যা তুষার ক্ষত হবে। আগুনটা বেশ গনগন করে জ্বলছে। আঙুলের মত মোটা দেখে ডাল সরবরাহ করছে এখন, কয়েক মিনিটের মধ্যেই কব্জির আকারের ডাল গুঁজতে পারবে। তখন ভিজে জুতো মোজা খুলে ফেলতে পারবে। যতক্ষণ না সেগুলো শুকনো হচ্ছে নগ্ন পা দুটো আগুনের ধারে রেখে সেঁকবে! বলাই বাহুল্য তার আগে বরফ দিয়ে পা দুটো খানিকক্ষণ ঘষে নিতে হবে। আগুনটা ভাল ভাবে জ্বলছে। ও এখন নিরাপদ। গন্ধক-খাঁড়ির প্রবীণ লোকটার কথা মনে পড়তেই ওর হাসি পায়। লোকটি খুব জোর দিয়ে ঘোষণা করেছিল যে তাপমাত্রা শূন্যের নীচে পঞ্চাশ ডিগ্রি নেমে গেলে এই ক্লনডাইকে কারুর একা পথে বেরোন উচিত নয়। কিন্তু এই তো ও

এখানে এসেছে, একাই এসেছে এবং দুর্ঘটনায়ও পড়েছে, তবু নিজেকে ঠিক বাঁচিয়েছে তো! আসলে মাথা গরম না করলে কোন বিপদই বিপদ নয়। পুরোনো দিনের লোকগুলোর একটু মেয়েলি স্বভাব হয়। মরদের মতো মরদ হলে যে কেউ একা পথে বেরোতে পারে। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে যে তার নাক আর গালদুটো অত্যন্ত দ্রুত জমে যাচ্ছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে তার আঙুলগুলো যে প্রাণ হারিয়ে ফেলবে ভাবতেও পারেনি। সত্যিই কোন সাড় নেই আঙুলে। কোনরকমে আঙুল দিয়ে এখন মুঠো করে ডাল ধরতে পারছে। নাড়াচাড়া করা প্রায় দুঃসাধ্য। মনে হচ্ছে আঙুলগুলো যেন তার নিজের দেহের অংশ নয়। একটা ডাল ছুঁয়ে ওকে বেশ ভাল করে নজর করতে হচ্ছে যে সত্যিই সে ডালটা মুঠো করে ধরছে কিনা।

তবে এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। আগুন তো জ্বলছেই। চড়চড় শব্দ হচ্ছে অগ্নিকুণ্ডে আর তার প্রতিটি নৃত্যরত শিখা জীবনের পক্ষে শপথ নিচ্ছে। লোকটি তার মোকাসিন জুতো খুলতে শুরু করে। পুরো জুতোটার ওপরেই কঠিন বরফ জমেছে। মাঝ হাঁটু অবধি টানা মোটা জার্মান মোজাগুলো যেন লোহার পাত আর মোকাসিনের ফিতেগুলো যেন প্যাঁচানো লোহার রড। অবশ আঙুল দিয়ে কিছুক্ষণ টানাটানি করেই ও নিজের বোকামির কথা বুঝে পকেট থেকে ছুরিটা বার করে নিল।

কিন্তু ফিতে কাটার আগেই ব্যাপারটা ঘটে গেল। দোষটা ওরই। অবশ্য দোষ না বলে ভুল বলাই ভাল। গাছের তলায় আগুন জ্বালানো ঠিক হয়নি। ফাঁকা জায়গায় আগুন জ্বালানো উচিত ছিল। কিন্তু ঝোপ থেকে ডালপালা টেনে সোজা আগুনে গুঁজে দেবার সুযোগটা ছিল এখানে। যে-গাছটার তলায় ও আগুন জ্বেলেছে তার প্রতিটি ডালপালার ওপরেই জমে ছিল তুষার। কয়েক সপ্তাহ ধরে মোটেই বাতাস বয়নি তাই ডালপালাগুলোর ওপর তাদের ভার বহনের শেষ সীমা অবধি তুষার জমেছে।

যতবার একটা করে ডাল টেনেছে সামান্য কাঁপুনি লেগেছে গাছটায়। সেটা ওর চোখে অত্যন্ত অকিঞ্চিতকর হলেও দুর্ঘটনা বাধাবার পক্ষে যথেষ্ট। গাছের ওপর দিকের একটা ডাল থেকে হঠাৎ ঝরে পড়ল বরফের বোঝা। ঝরে পড়া বরফের বোঝা এসে পড়ল নীচের ডালগুলোর ওপর, আরে সেগুলো থেকে ঝরে পড়ল আরো তুষার আরো অনেক ডালের ওপর। এই প্রক্রিয়া দ্রুত বিস্তার লাভ করল সারাটা গাছ জুড়ে। বিনা সঙ্কেতে হঠাৎ এক তুষার প্রপাত সৃষ্টি হল। আগুনের ওপর ধ্বসে পড়ল রাশি রাশি স্তূপ স্তূপ তুষার। দেখলে বোঝা যাবে না যে একটু আগেও এখানে অমন গনগনে আগুন জ্বলছিল।

লোকটি স্তম্ভিত। এ যেন স্বকর্ণে নিজের মৃত্যুদণ্ডাদেশ শোনা। নির্বাপিত অগ্নিকুণ্ডটার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে বসে রইল ও মুহূর্তক্ষণ তারপর সমস্ত অস্থিরতা একেবারে শান্ত হয়ে এল। গন্ধক খাঁড়ির লোকটা বোধহয় ঠিকই বলেছিল। এখন একজন সঙ্গী থাকলে কোন বিপদ হত না। সেই আবার আগুন জ্বালতে পারত। সে যাই হোক ওকেই এখন আবার আগুন জ্বালতে হবে। এবার আর ব্যর্থ হলে চলবে না। অবশ্য আগুন জ্বালতে পারলেও পায়ের কয়েকটা আঙুল বোধহয় খোয়াতেই হবে। ইতিমধ্যেই পা দুটো বেশ জমে গেছে। আগুন জ্বালতেও তো খানিকটা সময় লাগবে।

লোকটি কিন্তু নিষ্কর্মার মত শুধু বসে বসে চিন্তাস্রোতে গা ভাসায়নি। এই সময়টুকুর মধ্যেই সে আরেকটা আগুন জ্বালবার প্রস্তুতি নিয়েছে। এবার ফাঁকা জায়গাতেই কাঠকুটো জড়ো করেছে। এবার কোন গাছ আর শয়তানি করে আগুন নেভাতে পারবে না। নদীর উঁচু পাড় থেকে শুকনো ঘাস আর ছোট ছোট ডালপালা সংগ্রহ করতে এগিয়ে এসেও মুস্কিলে পড়তে হয়। আঙুলগুলোকে কিছুতেই বশ মানাতে পারছে না, বাছাই করে তুলবে কি করে ঘাস বা ডালপালা! শেষ পর্যন্ত মুঠো ভর্তি করে যা পারে তুলে

নেয়। কিছু অবাঞ্ছিত পচা ডালপালা আর কাঁচা ঘাসও উঠে এসেছে। কিছু করার নেই। নিয়মানুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। এমন কি কতকগুলো বড় ডালও হাতের কাছে যোগাড় করে রেখেছে আগুন ভাল করে ধরার পর গুঁজে দেবে বলে। ওর ওপর নজর রেখে চুপ করে বসে আছে কুকুরটা। অধীর আকাঙ্খার প্রকাশ তার দৃষ্টিতে, কারণ লোকটিই তাকে যোগাড় করে এনে দেবে আগুন। কিন্তু বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে যে!

সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেয় লোকটি। বার্চ গাছের শুক্‌নো আরেক টুকরো ছাল আছে পকেটে। ছালটা আঙুলে ঠেকেছে, খড়খড় শব্দ শুনতে পাচ্ছে কিন্তু তবু কিছুতেই আর ধরতে পারে না। এক দিকে অনলস প্রয়াস অন্য দিকে সারাক্ষণের মানসিক দংশন যে প্রতি মুহূর্তেই তার পা দুটো আরো জমে যাচ্ছে। এই চিন্তাটা তাকে আতঙ্কগ্রস্ত করে ফেলতে চাইছে কিন্তু তার বিরুদ্ধে ও সফল লড়াই চালিয়ে শান্তভাব বজায় রেখেছে। দাঁত দিয়ে হাতের দস্তানা দুটো খিমচে ধরে টান মেরে খুলে নেয়। হাত দুটো দুলিয়ে দুলিয়ে সজোরে পায়ের ওপর আঙুল দিয়ে বাড়ি মারে সাড় ফিরিয়ে আনতে। প্রথমে বসে বসে মারছিল তারপর উঠে দাঁড়িয়ে। কুকুরটা সেই বরফের মধ্যে বসে আছে। লোমশ লেজটা পেঁচিয়ে রেখেছে সামনের পা দুটো ঢেকে। নেকড়ের মতো ছুঁচোলো কানদুটো সামনের দিক করে খাড়া—উৎকর্ণ। মানুষটির কার্যকলাপ দেখছে। লোকটি আঙুলের সাড় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে আর কুকুরটাকে দেখে তার হিংসে হয়। কেমন লোমের স্বাভাবিক আবরণের তলায় উষ্ণতার আমেজ পোয়াচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে হাতের আঙুলগুলোয় সে সাড় ফেরার একটা সুদূরবর্তী অনুভূতির প্রথম সঙ্কেত পেল। মৃদু দপদপানিটা ক্রমে তীব্র বেদনার রূপ নেয় কিন্তু লোকটি তাতে খুশীই বোধ করে। ডান হাত থেকে দস্তানাটা খুলে পকেট থেকে গাছের ছালের

টুকরোটা বার করে আনে। খোলা আঙুলগুলো আবার দ্রুত অবশ হয়ে আসছে। গন্ধক দেশলাইগুলোর বাণ্ডিলটাও এবার বার করেছে। বাণ্ডিল থেকে একটা কাঠি আলাদা করতে গিয়ে পুরো বাণ্ডিলটাই পড়ে গেল বরফের ওপর। কাঠিগুলোকে বরফ থেকে কুড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। তীব্র শীত তার আঙুলের প্রাণ হরণ করেছে। মৃত আঙুলগুলো কিছু ছুঁতে পারছে না, কিছু ধরতেও পারছে না। অত্যন্ত সতর্ক হয়ে জমাট বাঁধা পা, নাক আর গালের সব দুশ্চিন্তা মন থেকে সরিয়ে একাগ্রচিত্তে দেশলাই পুনরুদ্ধারে উঠে পড়ে লাগে। স্পর্শানুভূতির অভাব দৃষ্টিশক্তিকে ব্যবহার করে পূরণ করে নিতে চায়। দেশলাইয়ের বাণ্ডিলটার দুধারে আঙুলগুলো পৌঁছেছে দেখে আঙুলগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে। না, বলতে ভুল হল—আঙুলগুলো মুঠো করারই ইচ্ছে ছিল তার, কিন্তু আঙুলগুলো তার নির্দেশ মানেনি। ডান হাতের দস্তানাটা গলিয়ে নিয়ে লোকটি এবার হাঁটুর ওপর ক্ষ্যাপার মতো একটা থাপ্পড় কষায়। দস্তানা পরা দু' হাত দিয়ে এক রাশ বরফ সমেত দেশলাইয়ের বাণ্ডিলটা তুলে নিয়েছে কোলে। তবু কোন লাভ হয়নি।

একটু পরে কোনক্রমে বাণ্ডিলটাকে সে দস্তানা পরা দু' হাতের চেটোর মধ্যে চেপে মুখের কাছে উঁচু করে ধরল। তীব্র চাপ দিয়ে মুখ ফাঁক করতেই কড়মড় শব্দে জমাট বরফগুলো ফুটিফাটা হয়ে গেল। নীচের ঠোঁটটা মুখের ভেতর দিকে মুড়ে ওপরের পাটির দাঁত দিয়ে বাণ্ডিল থেকে একটা কাঠিকে আলাদা যদি বা করল, কাঠিটা মুখ থেকে খসে পড়ল কোলে। কিছুতেই আর কুড়োতে পারেনা। শেষ পর্যন্ত মুখ নামিয়ে দাঁতে করে চেপে কাঠিটাকে তুলে আনল। দাঁতে করে চেপেই কাঠিটাকে ঘষতে শুরু করল পায়ের ওপর। একবার দু'বার তিনবার—কমপক্ষে কুড়িবার চেষ্টা করার পর দেশলাই জ্বললো। জ্বলন্ত দেশলাইটা দাঁতে চেপেই গাছের ছালটায় আগুন ধরাবে ভেবেছিল কিন্তু বিশ্রি ধোঁয়াটা নাক

হয়ে একেবারে ফুসফুসে গিয়ে সেঁধিয়েছে। আচমকা কাশির দমকে দিশেহারা হতেই কাঠিটা বরফের ওপর খসে প'ড়ে নিভে গেল।

সালফার ক্রিকের অভিজ্ঞ স্যাঙাত ঠিকই বলেছিল। এখন সে কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে। হিমাঙ্কের পঞ্চাশ ডিগ্রি নীচে সঙ্গী ছাড়া পথে বেরোনো উচিত নয়। হাত দুটো বারবার ঠুকেও কোন সাড় ফিরে পায় না। হঠাৎ ও দাঁতে চেপে দস্তানাদুটো এক টানে খুলে ফেলল। দেশলাইয়ের পুরো বাণ্ডিলটাকে দু' হাতের চেটোর মধ্যে চেপে ধরল। হাতের পেশীগুলো জমে যায়নি বলেই পেরেছে। এবার পুরো বাণ্ডিলটাকে পায়ের ওপর ঘষতেই এক সঙ্গে সত্তরটা দেশলাই কাঠি দপ্ করে জ্বলে উঠল। একটুও হাওয়া নেই তাই নেভবার ভয়ও নেই। শ্বাসরোধকারী ধোঁয়া এড়াবার জন্যে লোকটা মাথাটা একটু কাত করে রাখে। গাছের ছালটা বাড়িয়ে ধরে জ্বলন্ত কাঠিগুলোর ওপর। এতক্ষণে হাতে একটা সাড় পায়। হাতের চামড়া পুড়ছে। পোড়া গন্ধটা নাকে আসছে। চামড়ার তলায় প্রথম পাওয়া সাড়টা ক্রমশ যন্ত্রণার রূপ নেয়। যন্ত্রণা ক্রমশ তীব্রতর হয়ে ওঠে। তবু দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণার কথা ভুলে গাছের ছালটায় অগ্নিসংযোগ করতে চায়। সহজে ধরতে চায়না ছালটা। জ্বলন্ত দেশলাই কাঠির আগুনের বেশীর ভাগ তাপটাই খরচ হয়ে যাচ্ছে তার হাতের ছাল চামড়া মাংস পোড়াবার কাজে।

সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে এক ঝটকায় হাতদুটো ফাঁক করল লোকটি। জ্বলন্ত কাঠিগুলো বরফের ওপর পড়ে চড়বড় করে উঠে নিভে গেল। গাছের ছালটায় কিন্তু আগুন ধরে গেছে। এক এক করে শুকনো ঘাস আর ছোট ছোট ডালপালাগুলোকে সে আগুনের মধ্যে গুঁজতে শুরু করল। মুস্কিল হচ্ছে ওর পক্ষে তেমন ভাবে বাছাই করা সম্ভব নয়। দু'হাত এক ক'রে তালুর মধ্যে চেপে ডালপালাগুলো তুলে নিতে হচ্ছে। তাই পচা কাঠের ছোট ছোট

টুকরো আর কাঁচা ঘাসও লেগে থাকছে অনেক ক্ষেত্রেই। যতটা পারে দাঁত দিয়ে কামড়ে সে ওগুলোকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। আগুন জ্বালাবার ভঙ্গিমাটি যতই অদ্ভুত হোক সতর্কতার কিন্তু কমতি নেই। এখন আগুনও যা জীবনও তাই। কিছুতেই আগুন নিভতে দেওয়া চলবে না। দেহের বহির্ভাগে রক্তশূন্যতার দরুন লোকটি এবার কাঁপতে শুরু করে। নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা আরো হ্রাস পায়। এবার অগ্নিকুণ্ডের ঠিক ওপরে খসে পড়ে কাঁচা ঘাসের বেশ বড় একটা চাঙড়। আঙুলে করে ঘাসটাকে সরিয়ে দিতে চায় কিন্তু হিতে বিপরীত ঘটে। নিয়ন্ত্রণহীন আঙুলটা আগুনটাকে বেশী ঘেঁটে ফেলে। জ্বলন্ত ঘাস আর ছোট ছোট ডালপালাগুলো চারধারে ছিটিয়ে পড়ে। আবার সেগুলোকে একত্রিত করার চেষ্টা করেও তাকে হার স্বীকার করতে হয়। হাত পা এমনই ঠক ঠক করে কাঁপছে! ছিটোনো ডালপালাগুলো এক এক করে কালো ধোঁয়া ছাড়ে আর নিভে যায়। আগুন আর জ্বালা হল না। তার অসহায় করুণ চোখের দৃষ্টি হঠাৎ গিয়ে পড়ল কুকুরটার ওপর। নিহত অগ্নিকুণ্ডের ওধারে বরফের ওপর বসে রয়েছে। অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছে তার অঙ্গভঙ্গিতে। একবার সামনের ডান পা'টা একটু উঁচু করছে তারপর আবার বাঁ পা'টা। ব্যাকুল আগ্রহে একবার এ পা আর একবার ও পায়ের ওপর দেহের ওজন রাখছে।

কুকুরটার দিকে তাকাতেই একটা উন্মাদ চিন্তা তার মাথায় ভিড় করে। গল্পে পড়েছিল একটি লোক একবার তুষার-ঝড়ের মধ্যে আটকা পড়ার পর একটি হরিণ মেরে তার শবদেহের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে বসে নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছিল। ঠিক এমনি ভাবে কুকুরটাকে খুন করে ওর গরম শরীরের মধ্যে হাত দুটো গুঁজে রাখা যেতে পারে। কিছুক্ষণ বাদে নিশ্চয় অসাড় ভাব কেটে যাবে। তখন সে আবার আগুন জ্বালতে পারবে। কুকুরটাকে ও কাছে ডাকে কিন্তু তার শঙ্কাজড়িত অদ্ভুত কণ্ঠস্বর শুনে জন্তুটিও ভীতি বোধ করে। এমন ভাবে লোকটিকে কখনো

কথা বলতে শোনেনি। অবোধ প্রাণীও বুঝতে পারে কিছু একটা ঘটেছে। ব্যাপারটা ঠিক কি না বুঝুক, তার সন্দেহপ্রবণ মনটা বিপদের গন্ধ পায়। লোকটির ডাক শোনা মাত্র কুকুরটা তার খাড়া কান নামিয়ে নেয়, তার অস্থিরতা আরো বৃদ্ধি পায়। সামনের পা দুটো আরো ঘন ঘন নাড়ছে কিন্তু লোকটির কাছে আসার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। লোকটি এবার চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোবার চেষ্টা করে আর এই বিচিত্র ভঙ্গি দেখে কুকুরটার সন্দেহের মাত্রা আরো বাড়ে। কুকুরটা খানিকটা দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ায়।

লোকটি বরফের ওপর বসেই মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবতে চেষ্টা করে। দাঁত দিয়ে টেনে দস্তানাদুটো হাতে গলিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। পায়ে কোন সাড় নেই তাই ভাল করে জমির দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করতে হচ্ছে, সত্যিই সে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিনা। লোকটিকে স্বাভাবিক ভাবে উঠে দাঁড়াতে দেখেই কুকুরটির সন্দেহের ভাবটা হাল্কা হয়ে আসে। সেই সুপরিচিত প্রভুত্বব্যঞ্জক শাসানি কানে যেতেই সে স্বভাব আনুগত্যে লোকটির দিকে এগিয়ে আসে। কুকুরটাকে হাতের নাগালে পেতেই সে আচমকা দু'হাত বাড়িয়ে কুকুরটার টুঁটি টিপে ধরতে চায়। পরক্ষণেই তার বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। অবশ আঙুলগুলো আর ভাঁজ করা যাচ্ছে না। কিছু টিপে ধরাও সম্ভব নয়। ব্যাপারটা মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যাওয়ায় কুকুরটা পালাবার সুযোগ পায়নি। দু' হাতে কুকুরটাকে জাপটে ধরে লোকটি বরফের ওপর বসে পড়ে। ক্ষুব্ধ কুকুরটা রাগে গরগর করে। বাঁধন ছাড়াবার জন্যে গায়ের জোর খাটায়।

কুকুরটাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বসে থাকা ভিন্ন লোকটির আর কিছু করার নেই। পরিষ্কার বুঝতে পারছে কুকুরটাকে বধ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। অবশ অকেজো আঙুল দিয়ে না ধরতে পারবে ছুরি, না পারবে টুঁটি টিপে মারতে। তাই হাতের বাঁধন আলগা

করে দিতেই কুকুরটা পাগলের মতো পেটের মধ্যে লেজ পুরে ছুটে পালাল। চল্লিশ ফুট দূরে গিয়ে দাঁড়াল কুকুরটা। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে কান খাড়া করে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল লোকটিকে।

লোকটি তার হাত দুটোর দিকে দৃষ্টি ফেরায়। হাত দুটো শরীরের দুপাশে ঝুলছে। ভাবতেই অবাক লাগে যে চোখের নজরের ওপর নির্ভর করে তাকে এখন তার হাত দুটো কোথায় রয়েছে সেই খোঁজ নিতে হচ্ছে। আবার হাত দুলিয়ে দুলিয়ে পায়ের ওপর বাড়ি মারতে শুরু করে। নাগাড়ে মিনিট পাঁচেক ধরে প্রাণপণে থাপ্পড় মেরে খানিকটা সুফল মেলে। হৃৎপিণ্ডের কৃপায় শরীরের উপরিভাগেও কিঞ্চিৎ পরিমাণ রক্ত চলাচল শুরু হওয়ায় কাঁপুনিটা বন্ধ হয়েছে। হাতে কিন্তু কোন অনুভূতিই সঞ্চারিত হয়নি। দুটো বাটকারার মতো হাত দুটো তার দু'বাহুর প্রান্তে ঝুলছে বলে মনে হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এই ধারণা সমর্থনে অনুভূতিরা বিন্দুমাত্র সাহায্য করছে না।

এবার মৃত্যুভীতি তাকে গ্রাস করতে শুরু করেছে। ভয়টা আতঙ্কের রূপ গ্রহণ করতে দেরি করে না। স্পষ্ট বুঝতে পারছে ব্যাপারটা এখন আর শুধু হাত ও পায়ের কটা জমে যাওয়া আঙুল খোওয়া যাওয়ার মধ্যে সীমিত নেই। প্রশ্নটা জীবন মৃত্যুর এবং পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে প্রতিকূল। ত্রাসে আতঙ্কে ক্ষিপ্তপ্রায় লোকটি অকস্মাৎ দৌড়তে শুরু করে আবছা পুরোনো পথরেখা ধরে। উদ্দেশ্যবিহীন, দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য। ভয়ই তাকে এমন ভাবে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জীবনে সে কখনো এমন ভয় পায়নি। তুষারের মধ্যে ছুটতে গিয়ে নাকাল হতে হয় পদে পদে। খানিকক্ষণ বাদে আবার সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। ওই তো খাঁড়ির কিনারা—গুঁড়ি আটকে আছে নদীর জমাট বুকে—ওই তো পাতা-ঝরা পপলার গাছ আর আকাশ। ছুটে উপকারই হয়েছে। কাঁপুনিটা আর নেই। হয়তো আরো ছুটলে পায়ের বরফ গলে যাবে, এমন কি বেশ কিছুদূর যদি ছুটতে পারে তো তাঁবুতেই গিয়ে হাজির হবে। সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে

আবার দেখা হবে। হাত পায়ের কয়েকটা আঙুল আর মুখের অংশবিশেষ নিশ্চয় হারাতে হবে কিন্তু বন্ধুরা তাকে ঠিক প্রাণে বাঁচাবে। আশার সঙ্গে সঙ্গে নিরাশার মেঘও মনের কোণে ছায়া বিছোয়। মনে হয় ক্যাম্পে ফেরা আর তার হবে না। পথ তো আর কম নয়। ইতিমধ্যেই সারা শরীর জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে তুষার-ক্ষত। কিছুক্ষণের মধ্যেই শীতল শরীর কঠিন হয়ে মৃত্যু আসবে। মৃত্যুর চিন্তাটাকে সে মন থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু ঘুরে ফিরে সেই একই চিন্তা এসে ভিড় জমায়। তখন সে অন্য কথা ভেবে জোর করে চিন্তাস্রোতকে ভিন্নমুখী করতে চায়।

ভাবতে অবাক লাগে যে এখনও সে ছুটতে পারছে। পা দুটো এমন জমে গেছে যে মাটি স্পর্শ করার অনুভূতিটা পর্যন্ত লোপ পেয়েছে অথচ এই পা দুটোই তার দেহের ভার বহন করছে। মনে হচ্ছে মাটির সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ নেই, শুধু হাওয়ায় ভেসে চলেছে। কোথায় একবার সে ডানাওলা মার্কারি দেবতার ছবি দেখেছিল। মার্কারি দেবতারও কি এইরকম লাগে পৃথিবীর ওপর ভেসে ভেসে বেড়াতে ?

ক্যাম্প অবধি ছুটে যাওয়ার চিন্তাটার মধ্যে একটাই খুঁত ছিল। ওর সে ক্ষমতা আর নেই। ছুটতে ছুটতেই বেশ কয়েকবার হোঁচট খায় তারপর একেবারে মাথা ঘুরে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। উঠতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। এখন একটু বসে জিরিয়ে নেওয়া দরকার। আর ছোটা চলবে না, হেঁটে হেঁটেই এগোতে হবে। কিছুক্ষণ বসার পর দম ফিরে পেয়ে লক্ষ্য করে এখন আর আগের মতো শীত করছে না। কাঁপুনি তো বন্ধ হয়েইছে এমন কি বুকে আর থাইয়ে একটা উষ্ণতার ছোঁয়া লেগেছে। কিন্তু নাক আর গাল স্পর্শ করে দ্যাখে কোন সাড় নেই। শুধু ছুটে নাক গাল বা হাত কি পা কোনটারই জমাট ভাব কাটবেনা। হঠাৎ মনে পড়ে যায় যে তার জমাট অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো ক্রমশ ফুলে ফুলে উঠছে। এই নিয়ে ও আর ভাবতে চায় না। চিন্তাটাকে ভুলতে অন্য কথা ভাবতে চায়। না হলে

আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে পড়তে পারে। চিন্তাটা কিন্তু কিছুতেই ওর সঙ্গ ছাড়ে না। শেষ পর্যন্ত মানস চক্ষে ভেসে ওঠে একটা তুষার জমাট মানুষের ছবি। ছবিটা তারই। অসহ্য—অসহ্য এই চিন্তা! আবার সে পাগলের মত ছুটতে শুরু করে। একবার গতি কমিয়ে হাঁটতে গেছল কিন্তু আবার সেই জমে যাওয়ার ভয় তাকে ছুটতে বাধ্য করিয়েছে।

কুকুরটা ওর পায়ে পায়ে ছুটছিল। আবার পড়ে যেতেই কুকুরটা ওর সামনে এসে মুখোমুখি বসে পড়ল। লেজটা পেঁচিয়ে সামনের পা দুটো ঢেকে অধীর উৎসুক চোখে চেয়ে আছে। কুকুরটার উষ্ণ দেহ, নিঃসংশয় প্রাণ লোকটিকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ করে। এমন গালিগালাজ শুরু করে যে কুকুরটা তার খাড়া কান নুইয়ে ফ্যালে। এবার কিন্তু আরো তাড়াতাড়ি কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে। বরফের সঙ্গে লড়াইয়ে সে হেরে যাচ্ছে। শীতলতা অতি সন্তর্পনে তার দেহের প্রতিটি অঙ্গে অনুপ্রবেশ করছে। লোকটি আবার দৌড় শুরু করে। এবার আর একশো ফুটও যেতে হয়না, তার আগেই একেবারে মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়ে। দম আর আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ফিরে পেতেই লোকটি উঠে বসে। ভাবে, মরতেই যদি হয় সসম্মানে মরাই ভাল। আসলে তার একটা উপমার কথা মনে পড়ে গেছে। একটা ছিন্ন-মস্তক মুরগীর এলোপাথাড়ি ছুটে বেড়ানোর মতোই বোকামি করছে সে। মরতে যখন তাকে হবেই, আর ঠাণ্ডায় জমেই মরতে হবে, তখন ভালোভাবে মরাই তো ভাল। এই নতুন পাওয়া মানসিক প্রশান্তির সঙ্গে সঙ্গেই তন্দ্রা ঘনিয়ে আসে। ভাবে, এ ঘুম যদি আর না ভাঙে সেই তো ভাল। এ যেন অজ্ঞান করার জন্য ওষুধ খাওয়াবার পরের অবস্থা। জমে মরাটা এমন কি খারাপ! এরচেয়েও তো কত কষ্টকর ভাবে এবং হাজারো উপায়ে মরণ আসতে পারে।

ঠিক ছবির মতো চোখের সামনে দ্যাখে পরের দিন তার দলের ছেলেরা এসেছে তার খোঁজে। দ্যাখে সেই অনুসন্ধানকারী দলের

মধ্যে সে নিজেই এসেছে নিজের খোঁজে। সদলবলে এগোতে এগোতে পথের একটা বাঁক ঘুরেই সে নিজেকে দেখতে পায়। তুষার শয়নে শায়িত। এখন আর ও নিজের মধ্যে নেই। নিজের বাইরে আর পাঁচজনের সঙ্গে এক হয়ে নিজেকে দেখতে পাচ্ছে। সত্যিই প্রচণ্ড শীত পড়েছে। আমেরিকায় ফিরে বন্ধুবান্ধবদের বলতে পারবে সত্যিকার ঠাণ্ডা কাকে বলে। চিন্তা প্রবাহে হঠাৎ ছেদ পড়ে। সালফার ক্রিকের পুরোনো স্যাঙাতের কথা মনে পড়ে যায়। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ও এখন আরামে বসে উষ্ণতার আমেজ পোয়াচ্ছে আর পাইপ টানছে।

'তুমি ঠিকই বলেছিলে হে—ঠিকই বলেছিলে।' সালফার ক্রিকের ঝানু লোকটিকে যেন শোনাতে চায় কথাগুলো।

এতক্ষণে লোকটি ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে। ঘুমিয়ে যে এত সুখ, ঘুম যে এত আরামের হতে পারে এই প্রথম সে জানল। কুকুরটা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। ক্ষণস্থায়ী দিবস প্রলম্বিত গোধূলিতে পদার্পণ করল কিন্তু আগুন জ্বালবার কোন লক্ষণ নেই। তাছাড়া কুকুরটা এই প্রথম দেখছে যে আগুন না জ্বেলে কোন মানুষ বরফের মধ্যে এমন ভাবে চুপ করে বসে থাকতে পারে। যতই সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসে আগুনের আকাঙ্খায় কুকুরটার অস্থিরতা তত বাড়ে। পা দুটো বারবার নাড়ায়। তার চাপা কণ্ঠের গোঙানি শুনে লোকটি নিশ্চয় শাসাবে বলে আগেভাগেই কানদুটো নামিয়ে নেয়। লোকটি কিন্তু নীরব। কুকুরটা এবার উচ্চরবে ডেকে ওঠে। তবু সাড়া নেই। লোকটার কাছে কয়েক পা চুপিসারে এগিয়ে আসতেই সে মৃত্যুর গন্ধ পায়। কুকুরটা চমকে পিছু হটে আসে। তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে খানিকক্ষণ নাগাড়ে ঘেউ ঘেউ করে। তারাগুলো শীতল আকাশের বুকে জ্বল জ্বল করে নাচছে। এবার কুকুরটা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পায়ে হাঁটা পথটা ধরে ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে চলে। ও জানে ওখানে অনেক মানুষ আছে। তারা ওকে খেতে দেবে, আগুন জ্বালিয়ে দেবে।

জীবন তৃষ্ণা

সব কিছু মুছে গিয়েও থাকে কিছু—
ওরা যে হেসেছে, খেলেছে, ফেলেছে দান।
জীবনের পাশা খেলায় এইটুকুই লাভ,
সোনার ঘুঁটিটা না হয় গেলই হারিয়ে।

তীর ধরে ওরা দুজনে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগোচ্ছিল। খুব কষ্ট হচ্ছিল ওদের হাঁটতে। আগের জন টাল সামলাতে না পেরে ছড়ানো পাথরের ওপর হঠাৎ আছড়ে পড়ল। দুজনেই অত্যন্ত ক্লান্ত এবং দুর্বল। দীর্ঘদিন ধরে কষ্ট সহ্য করে করে ওদের মুখে ফুটে উঠেছে সহিষ্ণুতার কঠিন এক অভিব্যক্তি। কম্বলের গাঁটের বিরাট এক একটি বোঝা ওদের পিঠে ফিতে দিয়ে বাঁধা। দুজনের হাতেই একটি ক'রে বন্দুক। আনত ওদের ভঙ্গি, কাঁধ দুটো সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে, মাথাটা আরো বেশি। দৃষ্টি মাটির ওপর নিবদ্ধ।

'আমাদের বোঁচকাটার মধ্যে মাত্র দুটো করে যদি কার্তুজ থাকত তো খুব ভাল হত।' দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল। বিষণ্ণ, অনুভূতিহীন কণ্ঠস্বর। আগ্রহশূন্য উক্তি।

পাথরের ওপর প্রবহমান ফেনিল জলস্রোত। প্রথম ব্যক্তি সদ্য তখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নেমেছে সেই জলস্রোতের মধ্যে তাই প্রশ্নের উত্তর দেবার কোন তাগিদ অনুভব করল না সে।

অন্যজন ওর পিছু পিছু চলেছে। হীম শীতল জল। এত ঠাণ্ডা যে হাঁটুতে তীব্র যন্ত্রণা হতে থাকে, পা দুটো ক্রমশ অসাড় হয়ে আসে। জুতো মোজা পরেও এই অবস্থা। মাঝে মাঝে ওদের হাঁটুর ওপর জল আছড়ে পড়ছে। ঠাণ্ডায় ভারসাম্য হারিয়ে দুজনেই পা রাখার মতো একটু জায়গা খোঁজে।

মসৃণ এক টুকরো পাথরে পা পড়তেই পেছনের লোকটির পা পিছলে গেল। আরেকটু হলেই পড়েছিল আর কি। কোন রকমে সামলে নেয় নিজেকে। যন্ত্রণায় ককিয়ে ওঠে ওর কণ্ঠস্বর।

মনে হয় ওর মাথা ঘুরছে. বিভ্রান্ত। টলমল করতে করতে একটা অবলম্বন খোঁজার জন্যে বাতাসের গায়েই একখানা হাত বাড়িয়ে ধরে। সামলে উঠে আবার এক পা এগোয় কিন্তু ফের মাথা ঘুরে গিয়ে আছড়ে পড়ার উপক্রম হয়। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ও একবার সঙ্গীর দিকে তাকায়। ওর সঙ্গী কিন্তু একবারও ঘাড় ফেরানোর প্রয়োজন বোধ করেনি।

পুরো এক মিনিট লোকটি ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। ভাব দেখে মনে হয় যেন নিজের সংগে তর্ক করছে ও। তারপর চেঁচিয়ে বলল —'এই বিল! আমার গোড়ালিটা মচকে গেছে রে!'

বিলের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। পেছন ফিরে একবার তাকালোও না। শুভ্র ফেনিল জলস্রোতের মধ্যে টলমল করে তখন সে এগিয়ে চলেছে একমনে। পেছনের লোকটি সঙ্গীর দিকে চেয়ে থাকে, ভাবলেশহীন মুখ, চোখে আহত হরিণের দৃষ্টি।

বিল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওপারে ওঠে। উত্তাল জলস্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে ও লক্ষ্য করে বিলকে। ঠাণ্ডায় ওর ঠোঁটছুটো থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে। ঠোঁট ঢাকা গোঁফের ঝাড়টিও নেচে ওঠে তালে তালে। জিভ বার করে ও ঠোঁট ছুটোকে ভিজিয়ে নেয় অন্যমনস্ক ভাবে কয়েক বার।

চেঁচিয়ে ডাকে, 'বিল!'

দুর্দশা কবলিত একটি সবল মানুষের আর্ত আবেদন। তবু বিলের মাথা পিছন ফিরল না।

বিল এগিয়ে চলেছে। বাধবাধ টলমলে চলন ভঙ্গি। বিচিত্র ভাবে খুঁড়োতে খুঁড়োতে চড়াইটা পেরোচ্ছে। নিম্নভূমির পাহাড়টার মোলায়েম আকাশ সীমারেখার দিকে নজর রেখে এগিয়ে চলেছে। শিখর পেরিয়ে বিল যতক্ষণ না চোখের আড়াল হল ততক্ষণ ও চেয়ে থাকে। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। বিল চলে গেছে দৃষ্টির বাইরে। এখন ওর সঙ্গী বলতে শুধু নিঃশব্দ জাগতিক পরিমণ্ডল।

দিগন্ত পারে ধীর প্রজ্জ্বলিত ম্লান সূর্য ঘন কুয়াশার আবরণে ঢাকা পড়ে আরো ম্লান হয়ে যায়। সীমারেখাহীন স্পর্শাতীত বিচিত্র এক জড় জগৎ! লোকটি এক পায়ে ভর রেখে পকেট থেকে ঘড়ি বার করে। চারটে বেজেছে। বুঝতে পারে, সূর্য উত্তর পশ্চিম দিক নির্দেশ করছে কারণ, সময়টা এখন খুব সম্ভবত জুলাইয়ের শেষভাগ কি আগস্টের গোড়ার দিক। হিসাবে দু' এক সপ্তাহের হেরফের এড়ানো বর্তমানে ওর পক্ষে অসম্ভব। লোকটি দক্ষিণে তাকায়। ও জানে ওই জনশূন্য পাহাড়গুলোর ওপারে কোন এক জায়গায় গ্রেট বিয়ার লেক। তা ছাড়া ওই দিকেই যে কোথাও কানাডিয়ান ব্যারেন্‌স্‌-এর মাঝ দিয়ে আর্কটিক্‌ সার্কেলের ভয়াবহ বিস্তৃতি, এও জানে। যে নদীটিতে ও এখন দাঁড়িয়ে সেটি কপার মাইন্‌স্‌ নদীকে পুষ্ট করেছে এবং শেষোক্তটি দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে করোনেশান খাঁড়ি ও আর্কটিক সাগরে নিজেকে উজাড় করেছে। ওখানে কখনো ও যায়নি বটে তবে হাড্‌সনস্‌ বে কম্পানির চার্টে অঞ্চলটা একবার দেখেছিল।

যতদূর দৃষ্টি যায় চারিদিকেই আরেকবার চোখ বোলায় লোকটি। সর্বত্রই কোমল আকাশ-রেখা। দৃশ্যটি এমন কিছু উৎসাহোদ্দীপক নয়। প্রতিটি পর্বত নিম্নভূমি ছুঁয়ে আছে। গাছপালা ঝোপঝাড় থাকা তো দূরের কথা, ঘাসের ডগাটিরও চিহ্ন নেই কোথাও— থাকার মধ্যে আছে শুধু ভয়ানক এক নির্জনতা। ওর দু-চোখে তারই দ্রুত প্রতিফলন।

'বিল! বিল!' ফিস্‌ ফিস্‌ করে বার কয়েক উচ্চারণ করে নামটা।

দুধগোলা ঘোলাটে জলের মধ্যে কুঁজো হয়ে দাঁড়ায় লোকটি। চারিদিকের সীমাহীন বিশালতা ওকে যেন গ্রাস করে। বিশালত্বের অসহনীয় ভয়াবহতা ওকে নির্মমভাবে পেষণ করে। পালা জ্বরগ্রস্ত রোগীর মত ও কাঁপতে শুরু করে। কাঁপতে কাঁপতে এক সময় রাইফেলটা হাত থেকে খসে পড়ে যায়। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে

পেয়ে নিজের ভয় ভাঙাতে চেষ্টা করে লোকটি। জল হাঁটকে রাইফেলটাকে উদ্ধার করে। আহত গোড়ালিটার ক্ষত বাঁচিয়ে সতর্ক ভাবে ধীরে ধীরে তীরের দিকে এগোতে থাকে।

আঘাত ও ক্ষতের যন্ত্রণা, শরীরের সব ক্লান্তিকে উপেক্ষা করে একটানা বদ্ধ উন্মাদের মতো এগিয়ে চলেছে—লক্ষ্য তার পর্বতের শিখরদেশ। এরই ওপারে তার সঙ্গীটি কিছুক্ষণ আগে অন্তর্হিত হয়েছে। টলমলে পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এক সময়ে ও পর্বতের শিখর দেশে এসে হাজির হয়। শিখরে তো পৌঁছনো গেল কিন্তু সামনেই যে অগভীর এক উপত্যকা। জীবনের কোন চিহ্ন সেখানে চোখে পড়ে না! জলসিক্ত পিচ্ছিল এই উৎরাই পেরোনো কি সহজ কাজ! মরিয়া হয়ে ওঠে লোকটি।

সঙ্গীহীন হলেও ও কিন্তু পথভ্রষ্ট নয়। জানে, উপত্যকা পেরিয়ে খানিক দূর এগোলে ছোট একটা দীঘির কাছে পৌঁছবে। গ্রাম্য ভাষায় দীঘিটির নাম 'টিচিনিচিলি' অর্থাৎ 'কচি-কঞ্চির দেশ'। দীঘির পাড় ঘিরে ছোট ছোট শুকনো পাইন আর ফারের সারি। এখানে একটা নদী এসে পড়েছে। এর জল সুস্বাদু, দুধগোলা ঘোলাটে নয়। বেশ মনে আছে, নদীটির দু' তীরে নল খাগড়ার বন। ওকে এই নদীর তীর ধরেই এগোতে হবে। যেখান থেকে এই নদীটি বাঁক নিয়েছে সেখানে না পৌঁছে ও থামবে না। নদীর এই বাঁকের মুখ থেকে পশ্চিমে আর একটি নদী প্রবাহিত হয়েছে। এই জল-ধারাটি ডিজে নদীতে গিয়ে পড়েছে। এই দুই জলধারার সংযোগ-স্থলে অনেক পাথর দিয়ে চাপা একটা উপুড় করা নৌকার তলা থেকে ও একটা বোঁচকা পাবে। এই বোঁচকার মধ্যে আছে শূন্য রাইফেলটার জন্যে কিছু টোটা, বড়শি, ছিপ্ আর একটা ছোট জাল। খাদ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন সরঞ্জাম। খুব বেশী না হলেও খানিকটা ময়দা মিলবে। সেইসঙ্গে কিছু বিন্ আর এক টুকরো বেকন।

ওখানে বিল অপেক্ষা করবে। ডিজে নদীতে নৌকা বেয়ে ওরা

দুজনে গ্রেট বিয়ার লেকে পৌঁছবে। তারপর লেক পেরিয়ে দক্ষিণ মুখে রওনা দেবে। ম্যাকেঞ্জি নদীতে না পৌঁছনো পর্যন্ত ওদের গতি দক্ষিণ মুখেই অব্যাহত থাকবে। ওখানে পৌঁছে আবার দক্ষিণে। হাড় কাঁপানো শীত ওদের পিছু ধাওয়া করে করুক, নদীর ঘূর্ণিজলে বরফ দেখা দেয় দিক, তবু ওদের চলার গতি থামবে না। সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাকে উপেক্ষা করে ওদের মনের জোরই ওদের গন্তব্য স্থলে এগিয়ে দেবে। দক্ষিণে হাডসন বে কম্পানির উষ্ণ কোন অঞ্চলে পৌঁছে ওরা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে। এ অঞ্চল অরণ্য সম্পদে ঐশ্বর্যময়ী, অপর্যাপ্ত খাদ্য সম্ভারে পরিপূর্ণ। পেট পুরে খেয়েও শেষ করা যাবে না কিছুতে।

দুর্গম যাত্রাপথ, কষ্টকর পথ পরিক্রমা, তাই মনকে তাগদ যোগাতে নানা রকম চিন্তার জাল বুনে চলেছিল লোকটি। শরীরের সঙ্গে মনও লড়াই চালাচ্ছিল সমান তালে। ও কল্পনা করতে চায়, বিল ওকে একেবারে পরিত্যাগ করে যায়নি, রসদের বোঁচকাটার কাছে বসে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে ওর জন্যে। একথা না ভেবে ওর উপায় নেই। কেননা এই পরিশ্রমের তা হলে আর কোন অর্থই থাকেনা। আর সে ক্ষেত্রে মৃত্যুকেই স্বীকার করে নিতে হয়। তা ও পারবে না।

ম্লান সূর্যের রক্তাক্ত গোলাটা উত্তর পশ্চিমে ধীরে ধীরে অস্ত যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই লোকটি এক পা এক পা করে মনে মনে অনেক বার বিলের সঙ্গে পাড়ি দিয়ে ফেলেছে দক্ষিণের দিকে। হাডসন বে কম্পানির পোস্টে আর বোঁচকাটার মধ্যে কি কি রসদ আছে তার তালিকা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবতে থাকে লোকটি। দু'দিন খাওয়া হয়নি। আর মনোমত খাওয়ার সাধ তো অপূর্ণ রয়েছে বহু দিন। মাঝে মধ্যেই ঝুঁকে পড়ে বিবর্ণ মাসকেগ বেরী কুড়িয়ে নিয়ে মুখে পুরে চেবাচ্ছে লোকটি। ও জানে এই বেরীতে কোন পুষ্টি নেই। তাতে কি! অর্জিত জ্ঞানের চেয়ে ক্ষুধা অনেক সত্যি। তাই অভিজ্ঞতাকে তুচ্ছ করে জলভরা তেঁতো মাসকেগ বেরী চিবিয়ে চলেছে।

তখন প্রায় ন'টা হবে। ছোট্ট একটা পাথরে পায়ের আঙুলটা ঠুকে গেল। ক্লান্ত দুর্বল শরীর, টাল সামলাতে না পেরে লোকটি হুড়মুড়িয়ে পড়ে মাটিতে। পাশ ফিরে খানিকক্ষণ নিশ্চল ভাবে শুয়ে থাকে ও। তারপর বোঁচকার বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে কোনক্রমে ঘষড়ে ঘষড়ে উঠে বসার চেষ্টা করে। এখনো তেমন অন্ধকার হয়নি। যাই যাই করেও গোধূলির ম্লান আলো ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে। সেই আলোয় পাথরের ফাঁকে ফাঁকে শুকনো শ্যাওলার সন্ধানে এদিক ওদিক হাতড়ায় লোকটি। শ্যাওলার ছোট্ট একটা স্তর জড়ো হলে তাতে আগুন জ্বালে। জল ফোটাবে বলে একটা টিনের পাত্রে করে খানিকটা জল বসায় আগুনে। আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে আর প্রচুর ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

বোঁচকা খুলেই সর্ব প্রথমে দেশলাই কাঠি গুনতে শুরু করে লোকটি। সাতষট্টিখানা রয়েছে। নিশ্চিত হতে তিন তিনবার গোনে কাঠিগুলোকে। শেষে ভাগ ভাগ করে কাঠিগুলোকে অয়েল-পেপারে মুড়ে ফ্যালে। এক ভাগ রাখে তামাকের থলিটায়। এক ভাগ ভাঙাচোরা টুপিটার ভেতরকার ফেট্টিটার তলায়, আর তৃতীয় ভাগ রাখে সার্টের নীচে বুকের মধ্যে। কাজটা শেষ হবার পর আবার ওর ভয় করে, সব কটা মোড়ক খুলে ফেলে ফের গোনে। সেই সাতষট্টিখানাই রয়েছে।

আগুনের ধারে ভিজে জুতো-মোজা রেখে শুকিয়ে নিয়েছে। মোকাসিনটার একেবারে শতছিন্ন অবস্থা। কম্বলের তৈরি মোজার জায়গায় জায়গায় ফুটো, পা দুটো একেবারে রগরগে। রক্ত পড়ছে। গোড়ালিটা দপদপ করছে ব'লে একবার পরীক্ষা করে—ফুলে উঠে প্রায় হাঁটুর আকার ধারন করেছে। কম্বল দুটোর একটা থেকে লম্বা করে একটা ফালি ছিঁড়ে নিয়ে গোড়ালিটায় কষে বাঁধে। আরো কয়েক ফালি ছিঁড়ে পায়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জড়ায়, মোকাসিন আর মোজা দু'ইয়ের কাজ করবে। বাটি ভরে

ফুটন্ত জল পান ক'রে, ঘড়িতে দম দিয়ে কম্বলের তলায় গুড়ি মেরে ঢুকে পড়ে।

লোকটি মড়ার মতো ঘুমোচ্ছিল। মাঝ রাত বরাবর কিছুক্ষণের জন্যে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে তারপরই অন্ধকার কেটে যায়। উত্তর পূর্ব কোণে সূর্য ওঠে। ধূসর মেঘের আড়ালে ঢাকা মলিন সূর্য, কাজেই দিন শুরু হয়েছে কেবল ওদিকের অংশেই।

ছ'টার সময় লোকটির ঘুম ভাঙল। ও তখনও শান্তভাবে চিৎ হয়ে শুয়ে। দৃষ্টি গিয়ে পড়ে ধূসর বর্ণ আকাশের দিকে। বুঝতে পারে ক্ষিদে পেয়েছে। কনুইয়ে ভর দিয়ে উপুড় হতেই একটা নিশ্বাস ফেলার মতো শব্দ কানে আসে। চমকে দ্যাখে পঞ্চাশ ফুট দূরে একটা বলগা-হরিণ সতর্ক ও কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ্য করছে। সঙ্গে সঙ্গে সেঁকা ও ঝলসানো এক টুকরো বলগা-হরিণের মাংসের রূপ আর স্বাদের কথা মনে পড়ে। যন্ত্রচালিতের মত শূন্য বন্দুকটার-দিকে হাত বাড়ায়। লক্ষ্য স্থির করে ঘোড়া টেপে। হরিণটা ঘোৎ করে উঠে লাফ মেরে পালায়। পাথরের টুকরো পেরিয়ে ছোটার সময় খট-খট করে আওয়াজ হয় খুরে।

লোকটা গাল পেড়ে ফাঁকা বন্দুকটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে সরবে কাতরে ওঠে। কাজটা শ্রম-সাধ্য ও সময় সাপেক্ষ। দেহের প্রতিটি গ্রন্থির অবস্থা মরচে ধরা কবজার মতো। দৈহিক কবজাগুলো বাধবাধ ভাবে কাজ করছে। ঘর্ষণ প্রক্রিয়া বেশ প্রকট। প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-গুলো নাড়াচাড়া করা সম্ভব হচ্ছে। পায়ে ভর রেখে দাঁড়াবার পর মিনিট খানেক লেগে গেল দেহটাকে সোজা করতে।

ছোট্ট একটা ঢিপির ওপর উঠে গুড়ি মেরে আশপাশ লক্ষ্য করল লোকটি। গাছ নেই, ঝোপঝাড় অবধি নেই। থাকার মধ্যে কেবল ধূসর শ্যাওলার অরণ্য। মাঝেমধ্যে এক আধটা ছোট নদী কিংবা সরোবর চোখে পড়ে। আকাশেরও ধূসর বর্ণ। সূর্য নেই। এমন কি তার অস্তিত্বের কোন ইঙ্গিতও নেই। লোকটি আন্দাজ করতে

পারে না কোনটা উত্তর দিক। তা ছাড়া কোন পথ ধরে গত রাত্রে এই জায়গাটিতে এসেছে তাও ভুলে গেছে সে। তবে এটা ভাল করেই জানে যে পথ হারায়নি। শীগ্‌গিরই "কচি-কঞ্চির দেশে" পৌঁছতে পারবে। অনুভব করে জায়গাটা বাঁদিকে কোথাও, খুব দূরেও নয়—সম্ভবত নীচু পাহাড়টার ওপারেই।

বোঁচকাটার আকার ভ্রমণের উপযোগী করে তোলার জন্যে ফিরে আসে। নিজেই নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে দেশলাইয়ের কাঠি গুনতে গিয়ে সে খুব একটা বেশী সময় নষ্ট করেনি। সময় নষ্ট হয়েছে হরিণের চামড়ার পেটমোটা থলিটা সম্বন্ধে মনস্থির করতে গিয়ে। থলিটা খুব একটা বড় নয়। দু' হাত এক করলে তার তলায় অনায়াসে এটাকে ঢেকে রাখতে পারে। কিন্তু ওজন প্রায় পনের পাউণ্ড। জিনিসপত্র সমেত পুরো বোঁচকার ওজনের সমান। ভাবনাটা এই কারণেই। অনেক ভেবে চামড়ার ব্যাগটাকে এক পাশে সরিয়ে রেখে বোঁচকার জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করে। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে ফের চামড়ার ব্যাগটার দিকে তাকায়। তারপর এক হেঁচকায় ব্যাগটাকে মাটির ওপর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বোঁচকায় পোরে। দেখে মনে হয় চারিদিকের জনশূন্যতাই বুঝি চোরের মতো ওর কাছ থেকে ব্যাগটাকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল। বোঁচকাটাকে কাঁধে নিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটি। ধীর পায়ে যাত্রা শুরু করল দিনটির মোকাবিলা করতে।

লোকটি এখন বাঁ দিক বরাবর চলতে শুরু করেছে। মাঝে মাঝে মাসকেগ বেরী খাবার জন্যে চলায় ছেদ পড়ছে। গোড়ালিটা আড়ষ্ট, খোঁড়ান ভাবটা আরো প্রকট হয়েছে। তবু এ যন্ত্রণা পেটের যন্ত্রণার কাছে অতি নগণ্য। ক্ষিধের জ্বালায় পেটটা মোচড় দিয়ে উঠছে বারবার। ক্রমাগত পেট কামড়ানির ফলে যে পথ দিয়ে ওকে 'কঞ্চির দেশে' পৌঁছতে হবে, তার ওপর আর স্থির ভাবে মনসংযোগ করতে পারেনা সে। মাসকেগ বেরী পেটের

জ্বালার উপশম ঘটাতে তো পারেইনা উল্টে তার কঠিন দংশনে জিভ আর মুখের তালু জ্বালা করে।

একটা উপত্যকায় এসে পৌঁছল লোকটি। দেখতে পেল, পাহাড়ী মুরগীর দল মাসকেগ বেরী আর শৈল স্তবক ছেড়ে ডানা ঝাপটে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। ক্যার, ক্যার, ক্যার, শব্দ করে ওরা উড়ছে। পাখিগুলোকে লক্ষ্য করে একটা পাথর ছোঁড়ে কিন্তু আঘাত করতে পারেনা। বোঁচকাটাকে মাটির ওপর নামিয়ে রেখে, বেড়াল যেমন গুটি গুটি পায়ে এগোয় ঠিক তেমনি করে গুটি গুটি পায়ে সন্তর্পণে পাখীগুলোর নিকটবর্তী হয়। চোখা পাথরের খোঁচায় ওর প্যান্ট ছিন্ন হয়, শেষ পর্যন্ত হাঁটু থেকে রক্ত ঝ'রে চলার পথটি চিহ্নিত হতে থাকে। কিন্তু এ-জ্বালা ক্ষুধার জ্বালায় চাপা পড়ে যায়। ভিজে শেওলার ওপর সর্পিল ভঙ্গিতে বুকে হাঁটে, জামাকাপড় ছিন্নভিন্ন, সারা দেহ হিম—কিন্তু খাদ্যসংগ্রহের উন্মাদনায় কিছুই অনুভব করেনা। একটার পর একটা পাহাড়ী মুরগী কেবলই ওর সামনে দিয়ে ডানা ঝাপটে আকাশে পাড়ি জমাচ্ছে। শেষ অবধি ওদের ক্যার, ক্যার, ক্যার ডাকটা ভেঙ্‌চি কাটার মত লাগে। পাখীগুলোকে গাল পেড়ে সরবে ওদেরই ডাকের অনুকরণ করে।

হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে এগোতে হঠাৎ একটা পাখির একেবারে ওপরে এসে পড়ে লোকটি। পাখিটা বোধ হয় ঘুমিয়ে ছিল। পাখিটাকে ও দেখতেও পায়নি। পাথরের খোঁদলে নিজের আশ্রয় ছেড়ে ঠিক ওর নাকের সামনে দিয়ে পাখিটা চম্পট দিল। মুরগীটার মতই চমকে গিয়ে লোকটি হাত বাড়িয়ে ওটাকে ধরতে চাইল, কিন্তু পাখিটার পরিবর্তে ওর লেজের তিনটে পালক কেবল বদ্ধ মুঠোর মধ্যে রয়ে গেল। পলাতক পাখীটার দিকে চেয়ে ওটার ওপর ঘৃণা জাগে, যেন দারুণ একটা গর্হিত কাজ করেছে। তারপর ফিরে এসে ফের বোঁচকাটা কাঁধে তুলে নেয়।

দিনের অনেকখানি পার হয়েছে। নানা উপত্যকা পেরিয়ে একটা ঝোপঝাড় ভরা অঞ্চলে এসে পৌছয় লোকটি। এখানে

শিকার মেলার সুযোগ আরো বেশী। বন্দুকের আওতার মধ্যে দিয়ে খুব লোভনীয় ভাবে বিশ ত্রিশটা বল্‌গা হরিণের একটা দল পেরিয়ে গেল। একটা বন্য আকাঙ্খা লোকটিকে পেয়ে বসে -ওগুলোর পিছু ধাওয়া করার ইচ্ছে। ছুটে গেলে ঠিক ওদের ধরে ফেলতে পারবে। একটা কালো শেয়াল এবার ওর দিকে এগিয়ে আসে, শেয়ালটার মুখে একটা পাহাড়ী মোরগ। লোকটি চেঁচিয়ে ওঠে। ভয় পাওয়ানো চিৎকার। চিৎকার শুনে শেয়ালটা ভয় পেয়ে পালায় ঠিকই, কিন্তু মুরগীটাকে ফেলে যায়না কোন মতেই।

পড়ন্ত বিকেলের দিকে চুন-গোলা দুধরঙা একটা নদী ধরে হাঁটতে শুরু করে লোকটি। নদীটা নলখাগড়ার ঝোপগুলোর মাঝ দিয়ে বইছে। নলখাগড়াগুলোকে শক্ত হাতে গোড়ার কাছে চেপে ধরে উপড়ে নেয় --দেখতে অনেকটা সদ্য গজানো পেঁয়াজের মতো। বস্তুটি নরম, চট করে দাঁত বসে যায়, তাই প্রথমে মনে হয় খেতে সুস্বাদুই হবে। আসলে আঁশগুলো কিন্তু শক্ত। উদ্ভিদটি জলসিক্ত কিছু রোঁয়ার সমষ্টি। ঠিক বেরীরই মতো, কোন পুষ্টি নেই। বোঁচ-কাটা ছুঁড়ে ফেলে লোকটি চার হাতে পায়ে ষাঁড়ের মত নলখাগড়ার ঝোপে ঢুকে কচমচ করে চেবাতে শুরু করে দেয় সেগুলোকে।

অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। কেবলই শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করছে। তবু ক্রমাগত এগিয়ে যেতে হয়। অবশ্য এর পেছনে 'কঞ্চির দেশ'-এ পৌছনোর প্রবল ইচ্ছে যতটা কাজ করছে তার চেয়ে বেশী করছে ক্ষুধার তাড়না। ছোট পুকুরগুলোয় ব্যাঙের সন্ধান করে, কীটের সন্ধানে নোখ দিয়ে মাটি খোঁড়ে অথচ এত উত্তরে ব্যাঙ ও কীটের যে কোন অস্তিত্ব নেই তা ও ভালভাবেই জানে।

মিথ্যেই প্রতিটি পুকুরের মধ্যে চেয়ে চেয়ে দেখা। অবশেষে গোধূলির প্রথম লগ্নে একটি পুকুরে সাক্ষাৎ মিলল 'মিনো' নামে ক্ষুদ্র আকারের একটি মাছের। কাঁধ অবধি পুরো হাতটা সোজা জলের মধ্যে চালিয়ে দিল, মাছটা কিন্তু ওকে ঠকিয়েছে। তবু উন্মাদের মত

জলের মধ্যে ও দু'হাত ঢুকিয়ে খুঁজে চলে, জলের তলাকার দুধরঙা কাদা গুলিয়ে ওঠে। উত্তেজনার মাথায় লোকটা শেষে জলে পড়ে যায়। কোমর অবধি ভিজে গেছে। জলটা এত গুলিয়ে গেছে যে মাছটাকে দেখতে পাবার আর কোন আশাই নেই। যতক্ষণ না কাদা থিতোচ্ছে ততক্ষণ অপেক্ষা করতেই হবে।

খানিকক্ষণ বাদে আবার খোঁজ শুরু হয়। আবার গুলিয়ে ওঠে কাদা। কিন্তু আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। ফিতে খুলে টিনের পাত্রটা বার করে জল ছাঁচতে শুরু করে লোকটি। প্রথমে উন্মত্তের মত ছাঁচতে শুরু করার ফলে নিজেও ভিজছিল আর জলটাকে তার বদলে পুকুরের এত কাছে ছুঁড়ছিল যে তা আবার পুকুরেই ফিরে আসছিল। আরো সতর্ক ভাবে কাজ করছে ও এখন। হৃদপিণ্ডটা যদিও বুকের ওপর ধক্ ধক্ করে আঘাত করছে, হাত কাঁপছে, তবুও মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে চেষ্টা করে। আধঘণ্টা পর জলের কুণ্ডটা প্রায় শুকিয়ে আসে, এক কাপের মতো জলও নেই। কিন্তু কোথায় মাছ! তার বদলে পুকুরের তলাকার পাথরের মধ্যে ছোট্ট একটা ফোকর দেখতে পায়। নিশ্চয়ই ওটা ফোকর গলে পাশের বড় পুকুরটায় সটকেছে। এ পুকুরটাকে সারাদিন সারারাত ধরে ছাঁচলেও জলশূন্য করতে পারবে না। ফোকর রয়েছে জানলে প্রথমেই ওটার মুখটা একটা পাথর দিয়ে বন্ধ করে দিতে পারত, মাছটা তাহলে হাতে এসে যেত।

কথাটা ভাবতে ভাবতে কুঁকড়ে গিয়ে ভিজে মাটির ওপরই লুটিয়ে পড়ে লোকটি। প্রথমে নিজের মনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। তারপর চারদিক থেকে ঘিরে ধরা অকরুণ নির্জনতাকে শুনিয়ে সরবে কাঁদতে শুরু করল। বহুক্ষণ ধরে শুকনো চাপা কান্নায় ওর দেহটা কেঁপে কেঁপে ওঠে।

এবার আগুন জ্বালিয়েছে লোকটি। খানিকটা গরম জল খেয়ে ঠাণ্ডা ও কাটিয়েছে। গত রাতের মতোই একটা চোখা পাথরের ওপর ওর আজকের আস্তানা। ঘুমোবার আগে দেশলাইয়ের কাঠিগুলোর শুষ্কতা পরখ করে ঘড়িতে দম দিয়ে নেয়। কম্বলটা ভিজে আর চটচটে।

গোড়ালিটাও যন্ত্রণায় দপদপ করছে। কিন্তু ও কেবল একটা কথাই বোঝে: আমি এখন ক্ষুধার্ত। ঘুমের মধ্যে ভোজ সভার স্বপ্ন দ্যাখে, দ্যাখে সম্ভাব্য সবরকম খাদ্য দ্রব্যের পরিপাটি পরিবেশন।

ঘুম ভেঙে লোকটি দেখল তার ঠাণ্ডা লেগে গেছে। অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করে। সূর্য বলে কিছু নেই। পৃথিবী ও আকাশের ধূসরতা আরো ঘনীভূত হয়েছে—আরো ভীতিপ্রদ। বাতাস হিম শীতল। তুষারকণাপূর্ণ দমকা হাওয়া পাহাড়ের চূড়োগুলোকে শুভ্রতায় ঢেকে দিয়েছে। আগুন জ্বেলে আরো খানিকটা জল গরম করার সময় বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। আধো বৃষ্টিপাতের মত তুষারপাত হতে শুরু করে। তুষারকণাগুলো আকারে বেশ বড়। অবিরাম তুষারপাত চলতে থাকে। জমি ঢাকা পড়ে যায়। মাটির সংস্পর্শে এসে তুষারকণাগুলো গলে যাচ্ছে তাই জ্বালানো শেওলা-গুলো ভিজে গিয়ে আগুনটা নিভে গেল।

আর বসে থাকার উপায় নেই। বোঁচকাটা কাঁধে এঁটে আবার এগিয়ে চলল লোকটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। কোথায় যে যাবে তা অবশ্য সে জানে না। ক্ষুদ্র কঞ্চির দেশ, কি বিল, কি ডিজে নদীর তীরে উপুড় করা নৌকো—কোনটার জন্যই ওর মাথা ব্যথা নেই। এখন কেবল একটি ধাতুপদ ওর ওপর প্রভুত্ব করছে: 'খাওয়া'। লোকটি ক্ষুধা-পাগল। কোন পথ ধরে এগোচ্ছে সেদিকেও খেয়াল নেই। কোনমতে এই শেওলাময় নিম্নভূমি পার হতে পারলেই খুশী। ভিজে তুষার আর জোলো মাসকেগবেরী এড়িয়ে নলখাগড়া উপড়োতে উপড়োতে আন্দাজে পা ফেলে এগোয় লোকটি। বস্তুটি স্বাদহীন, তৃপ্তি পায় না একেবারে। একটা আগাছার সন্ধান পেয়েছে এবার— ঝাল ঝাল খেতে। যখনই চোখে পড়ছে খাচ্ছে কিন্তু বেশী চোখে পড়ছে না। আগাছাগুলো লতা গাছের মতো তাই কয়েক ইঞ্চি তুষার জমলেই চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে।

রাত্রে আর আগুন জ্বালাতে পারা যায় না, গরম জলও জোটেনি একফোঁটা। কোন উপায় না দেখে ঘুমের আয়োজন করতে কম্বলের

তলায় ঢুকে পড়ে কোন রকমে। তুষারপাতের বদলে হিম শীতল বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে এখন। অনেকবার ঘুম ভেঙে টের পেয়েছে। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকার দরুণ মুখের ওপর বৃষ্টি এসে পড়ছে।

সকাল হল। ধূসর, সূর্যহীন প্রভাত। বৃষ্টি থেমে গেছে। ক্ষুধার তীব্রতাটাও নেই। খাদ্য সংক্রান্ত সমস্ত অনুভূতি নির্মূল ভাবে লোপ পেয়েছে। পেটের মধ্যে একটা ভোঁতা যন্ত্রণা আর ভারী ভারী ভাব, তবে এমন একটা কিছু বিরক্তিকর নয়। এখন ও আগের চেয়ে অনেক বেশী যুক্তি সঙ্গত ভাবে চিন্তা করছে, ফলত আগের মতোই 'কঞ্চির দেশ' আর ডিজে নদীর তীরে উপুড় করা নৌকোটাই বর্তমানে ওকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করছে।

একটা কম্বলের অবশিষ্টাংশটুকু পায়ে বেঁধে নেয় লোকটি। আঘাত লাগা গোড়ালিটাতে জড়ানো ফেট্টিটা আরেক বার ঠিক করে। আরেকদিনের পথ পরিক্রমার জন্য তৈরি হতে থাকে। বোঁচকাটার কাছে এসে বেশ খানিকক্ষণ ভাবে হরিণের চামড়ার পেট-মোটা থলিটাকে নিয়ে কি করবে। শেষ পর্যন্ত ওটাকে তুলেই নেয়।

বৃষ্টির দরুণ তুষার গলে গেছে, শুধু পর্বতশিখরগুলো এখনো সাদা দেখাচ্ছে। সূর্য উঠেছে বলে এখন এই দিক্-যন্ত্রের সাহায্যেই ও দিক নিরূপণে সক্ষম হচ্ছে। অবশ্য এ কথা তার অজানা নয় যে ইতিমধ্যেই সে পথ হারিয়েছে। হয়তো গত ক'দিনের যাত্রাকালে বেশী মাত্রায় বাঁ দিকে সরে এসেছে। তাই বিচ্যুতিটা শুধরে নিতে ডান দিক চেপে চলতে শুরু করে লোকটি।

খিদের চোটে পেটের মোচড় আগের মত অসহনীয় ঠেকছে না বটে কিন্তু বুঝতে পারে সে ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। ঘন ঘন বিশ্রাম নিতে বাধ্য হচ্ছে। এই সময়টুকুতে মাসকেগবেরী এবং নলখাগড়াদের আক্রমণ করার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে ওঠে। জিভটাকে বেশ শুকনো আর আকারে বড় ঠ্যাকে—জিভের ওপর যেন রোঁয়া গজিয়েছে। স্বাদটা কটু মনে হয়। হৃৎপিণ্ডটা ওকে বেশ কষ্ট দিচ্ছে। কয়েক মিনিট হাঁটতে না হাঁটতে বুকের ভেতরটা জোরে জোরে

আন্দোলিত হতে থাকে। হঠাৎ যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। মাথাটা ঘুরতে শুরু করে, জ্ঞান হারাবার উপক্রম হয়।

দুপুর নাগাদ একটা বড় পুকুরে দু'টো 'মিনো'র সাক্ষাৎ মিলল। এত জল ছেঁচে ফেলা অসম্ভব। মাথাটা এখন ওর বেশ ঠাণ্ডাই আছে। তাই চটপট টিনের পাত্রটার সাহায্যেই মাছ দুটোকে ধরে ফেলল। মাছ দুটো আঙুলের চেয়ে বড় হবে না, কিন্তু তাতে কি? ওর তো আর এখন তেমন ক্ষিধে নেই। পেটের মধ্যেকার ভোঁতা যন্ত্রণাটা আরো কম অনুভব করছে। খিদের সময় না খেতে পেয়ে পেটটা ঘুমিয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। তবু কাঁচা মাছটা চিবিয়ে চিবিয়ে খায়। খাওয়ার জন্যেই খাওয়া। বাঁচার প্রয়োজনেই খেতে হবে।

বিকেলে আরো তিনটে মিনো ধরতে পেরেছে। দুটো খেয়ে একটা রেখে দিয়েছে প্রাতরাশের জন্যে। ইতস্তত গজানো শেওলার চাপড়াগুলো সূর্যকিরণে শুকিয়ে গেছে। জল গরম করে খানিকটা ঠাণ্ডা দূর করার সুযোগ পায় ও। আজ দশ মাইলের বেশী হাঁটতে পারেনি। প্রতিকূল অবস্থাকে কাটিয়ে পরদিন সেটা পাঁচ মাইলে এসে ঠেকল। খিদের জন্যে আর বিন্দুমাত্র অস্বস্তি বোধ করছে না। পেটটা ঘুমিয়ে পড়েছে। এখন ও একটা অচেনা অঞ্চল পাড়ি দিচ্ছে। প্রচুর সংখ্যক নেকড়ে আর বলগা-হরিণের দেখা মেলে এখানে। নির্জন প্রান্তর পেরিয়ে ঘন ঘন তাদের ডাক কানে আসছে। আর একটি রাত পেরোল। হরিণের চামড়ার পেটমোটা থলিটা উল্টোতেই তার মুখ দিয়ে অপরিশুদ্ধ সোনা আর সোনার তাল হলুদ স্রোতের মতো বেরিয়ে আসে। সোনাটা মোটামুটি দুটো সমান ভাগে ভাগ করে এক ভাগ কম্বলের টুকরোয় মুড়ে বিচিত্র ধরণের একটা পাথরের চাঁইয়ের তলায় রেখে দেয় আর অন্য ভাগটিকে বোঁচকায় পুরে নেয়। তারপর শেষ কম্বলটি থেকে একটা ফালি ছিঁড়ে পায়ে জড়ায়। বন্দুকটা যে এখনো ত্যাগ করেনি তার কারণ ডিজে নদীর ধারে বোঁচকাটার মধ্যে টোটা আছে।

দিনটা কুয়াশাচ্ছন্ন। আজ আবার খিদেটা চাগিয়েছে। অত্যন্ত দুর্বল বোধ করে। মাথাটা এমন ভাবে ঘুরছে যে সময় সময় চোখে অন্ধকার দেখে। অবস্থা যা তাতে মাথা ঘুরে আছাড় খাওয়াও এমন কিছু অসম্ভব নয়। হঠাৎ মাথা ঘুরে একটা মুরগীর বাসার ওপর গিয়ে পড়ে লোকটি। দিন খানেক হবে ডিম ফুটে চারটে ছানা বেরিয়েছিল বোধ হয়। এক এক কণা স্পন্দিত জীবন। এক গ্রাসে সব কটাকে খেয়ে ফেলা যায়। খোলা শুদ্ধ ডিম চেবানোর মত জ্যান্ত বাচ্চাগুলোকে মুখে পুরে চেবাতে শুরু করে। মা-মুরগীটা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে ওর চারপাশে ঘুরে ঘুরে ডানা ঝাপটায়। বন্দুকটাকে গদার মত বাগিয়ে ধরে মা-মুরগীটাকে মারতে চায় কিন্তু পারে না। ঠিক পাশ কাটিয়ে সরে পড়ছে বার বার। বন্দুক দিয়ে মারতে না পেরে শেষ পর্যন্ত পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। হঠাৎ একটা নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে মুরগীটার একটা ডানা ভেঙে যায়। মুরগীটা ভাঙা ডানাটা টেনে টেনে ছুটতে শুরু করে আর লোকটি তার পিছু ধাওয়া করে।

মুরগীর ছানাগুলো সাময়িক ভাবে ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটিয়েছে। আহত গোড়ালিটার ওপর কোন রকমে ঠেক রেখে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোয় লোকটি। পাথর ছোঁড়ে আর কর্কশ কণ্ঠে চেঁচায়। আবার কখনো বা নিঃশব্দে এগিয়ে চলে। মাটিতে পড়ে গেলে ধীরে সুস্থে উঠে বিমর্ষ দৃষ্টিতে তাকায়। মাথা ঘোরার উপক্রম হলে তা কাটিয়ে ওঠার জন্যে চোখ রগড়ায়।

ডানা ভাঙা মুরগীটার পিছু ধাওয়া করতে করতে লোকটি উপত্যকার নিম্নবর্তী জলাভূমিতে এসে পৌছয়। ভিজে শেওলাগুলোর ওপর চোখ পড়তেই ভাখে কার যেন পায়ের ছাপ। এ পায়ের ছাপ কোন মতেই তার হতে পারে না। তাহলে বিলের নিশ্চয়। কিন্তু এখন থামা চলে না। আগে ছুটন্ত মুরগীটাকে ধরতে হবে। তারপর ফিরে এসে অনুসন্ধান।

এক নাগাড়ে ছুটিয়ে ছুটিয়ে মুরগীটাকে নির্জীব করে দিয়েছে।

কাত হয়ে শুয়ে ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে মুরগীটা। লোকটিরও দম ফুরিয়ে এসেছে। ঠিক মুরগীটার মত কাত হয়ে শুয়ে লোকটি হাঁস ফাঁস করতে লাগল। মুরগীটার সঙ্গে ওর ব্যবধান মাত্র কয়েক ফুটের। কিন্তু হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ওটাকে ধরবে যে, সে-শক্তিও ও হারিয়েছে। লোকটি যতক্ষণে দম ফিরে পেয়ে মুরগীটার দিকে এগোল ততক্ষণে মুরগীটাও দম ফিরে পেয়েছে। লোকটির হাত পৌঁছনোর আগেই মুরগীটা সরে পড়ল। আবার শুরু হল পেছনে ছোটা। দেখতে দেখতে রাত নেমে আসে। সুযোগ বুঝে মুরগীটা অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়। অত্যন্ত দুর্বল শরীর। হোঁচট খেয়ে টাল সামলাতে না পেরে লোকটি সোজা আছড়ে পড়ল মাটিতে। মুখে জোর আঘাত লাগে; চিবুকটা কেটে যায়। পিঠের ওপর বোঁচকাটা যেমন বাঁধা ছিল তেমনই আছে। বেশ খানিকক্ষণ লোকটি নড়াচড়া করে না। তারপর পাশ ফিরে শোয়। ঘড়িতে দম দিয়ে ওই ভাবেই শুয়ে কাটিয়ে দেয় সকাল পর্যন্ত।

দিনটা আজও কুয়াশাচ্ছন্ন। শেষ কম্বলের অর্ধেকটা চলে গেছে পায়ে ফেট্টি বাঁধার কাজে। অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না। খিদের প্রচণ্ড তাড়নাতেই ও এখন এগিয়ে চলেছে। আচ্ছন্ন ভাবে পথ চলতে চলতে ভাবে—বিলও কি পথ হারিয়েছে? দুপুর নাগাদ বোঁচকাটার বোঝা অসহ্য মনে হয়। যেটুকু সোনা ছিল ফের তা দু-ভাগে ভাগ করে। অর্ধেকটা এবার সোজাসুজি মাটিতে ছড়িয়ে দেয় তারপর একটু ভেবে বাকী অর্ধেকটাও ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সঙ্গে এখন কেবল আধখানা কম্বল, টিনের পাত্র আর বন্দুক।

একটা মায়াকল্পনা ওর অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবার। মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে যে এখনো একটা টোটা আছে—বন্দুকেই পোরা আছে! আগের বার দেখার সময় ঠিক চোখ এড়িয়ে গেছে। অথচ ও জানে, বন্দুকের ভেতর আদৌ কিছু নেই। তবু এই মায়া-কল্পনার হাত থেকে রেহাই মেলে না। এই অলীক কল্পনার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ লড়াই চালাবার পর বন্দুকটাকে ও মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে

দেয়। বন্দুকটা খুলে দ্যাখে যথারীতি ওটার মধ্যে কিছু নেই। হতাশার তিক্ততা এত তীব্র যে মনে হয় যেন সত্যিই টোটাটা ও দেখবে বলে আশা করেছিল।

আধ ঘণ্টা ধরে খুব কষ্টকর ভাবে চলার পর আবার মায়া কল্পনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে লোকটি। খুব চেষ্টা করে আজগুবি ভাবনার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার, কিন্তু রেহাই পায় না। শেষ পর্যন্ত কোন উপায় না দেখে এই আজগুবি ভাবনা আর সন্দেহের নিরসন ঘটাতে বন্দুকটাকে আবার খুলে ফেলে। নানা চিন্তায় ডুবে গিয়ে যন্ত্রচালিতের মত পথ হেঁটে চলেছে। আত্মপ্রতারণার এই উদ্ভট চিন্তা কীটের মত ওর মস্তিষ্ককে দংশাতে থাকে। কিন্তু বাস্তবকে উপেক্ষা ক'রে এই সুখ-ভ্রমণের স্থায়িত্ব খুব অল্পক্ষণের, কারণ খিদের তীব্র জ্বালা অনবরত ওকে পিছনের ভাবনায় ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সুখ-চিন্তায় আচ্ছন্নের মতো চলতে চলতেই হঠাৎ ওর সংবিৎ ফিরে আসে। চোখের সামনে যা দেখেছে আর একটু হলেই মূর্ছিত হয়ে পড়ত। দেহটা টলমল করে ওঠে, মাতালের মতো এধার সেধার এলোমেলো পা ফেলে পতনের হাত থেকে নিজেকে বাঁচায়। সামনেই একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে। ঘোড়া—একটা ঘোড়া! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না! ঘন কুয়াশায় চোখ দুটো ঢেকে গেছে, তার মধ্যে বিন্দু বিন্দু আলোক কণা। পাগলের মতো চোখ ঘষে দৃষ্টি পরিষ্কার করতে চায়। দ্যাখে, কোথায় ঘোড়া!— খয়েরি রঙা বিশাল এক ভাল্লুক। উৎসুক যোদ্ধার মতো ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে।

বন্দুকটাকে প্রায় কাঁধ বরাবর তোলার পর, ছোরাটার কথা খেয়াল হল। বন্দুকটা তক্ষুণি নামিয়ে রেখে পুঁতি বসানো খাপ থেকে টেনে বার করল ছোরাটাকে। সামনেই রয়েছে খাদ্য ও জীবন! বুড়ো আঙুলটা ছোরার কানার ওপর একবার বুলিয়ে নেয়। অত্যন্ত ধারালো। ভাবে এক নিমেষে ভাল্লুকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওটাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে। কিন্তু বুকের ভেতর থেকে সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়—দপ্, দপ্, দপ্। বুকের

ভেতরটা হাঁক পাঁক করছে, একটা লোহার সাঁড়াশি দিয়ে কে যেন কপালটা টিপে ধরেছে। ধীরে ধীরে মাথা ঘোরার ভাবটাও বেড়ে চলে।

কিছুক্ষণ আগের বেপরোয়া ভাবটা কোথায় উবে গেছে। একটা অজানা আতঙ্ক ওকে পেয়ে বসে। ওর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জন্তুটা ওকে যদি আক্রমণ করে তখন উপায়? যতখানি সম্ভব শরীরটাকে টান টান করে নির্ভীক ভাবে খাড়া হয়ে দাঁড়ায়। মুঠোর মধ্যে শক্ত করে চেপে ধরে ছোরাখানা। হিংস্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ভাল্লুকটার দিকে। ভাল্লুকটা থপ্ থপ্ করে দু চার পা এগিয়ে আসে, গুঁড়ি মেরে বসে একটা গর্জন ছাড়ে। যেন দেখতে চায় লোকটা যুঝতে পারবে কিনা। লোকটি যদি ছোটে তাহলে ভাল্লুকটাও ছুটবে। ভয় ভাবনা সব কিছুকে উপেক্ষা করে লোকটি মরিয়া হয়ে গর্জন করে উঠল। বুনো জন্তুর মতো, প্রচণ্ড রকম। যে ভীতি জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, প্রাণের গভীরতম বোধই যার উৎস, এ গর্জনে তারই অনুরণন।

ভাল্লুকটা গর গর করতে করতে এক পাশে সরে যায়। রহস্যময় অবিচল এই মানুষটিকে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভাল্লুকটাও বিস্মিত। লোকটি একটুও নড়েনি। যতক্ষণ না বিপদ অতিক্রান্ত হয় ততক্ষণ প্রস্তর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আতঙ্কগ্রস্ত মানুষটি সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভিজে শেওলার ওপর লুটিয়ে পড়ে।

এতক্ষণে লোকটি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভয় কাটিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করেছে। এবার আর এক নতুন ভীতি ওকে পেয়ে বসে। খাদ্যের অভাবে ধীর মৃত্যুর বিভীষিকা নয়। ভয়টা এই যে অনাহারে মৃত্যুর আগেই, বাঁচার এই লড়াইয়ে উদ্যমের যে শেষ স্ফুলিঙ্গটুকু ওকে এখনো অগ্রসর হবার তাগিদ জোগাচ্ছে, তা নির্বাপিত হবার আগেই, ওকে হয়তো কোন হিংস্র প্রাণীর শিকার হতে হবে। নেকড়েদের কথা কি ভোলা যায়! নির্জন প্রান্তরের

এধার ওধার থেকে ওদের গর্জন ভেসে আসছে। নিস্তব্ধতার ঠাস বুনুনীকে ফালা ফালা করে গর্জন ছড়িয়ে পড়ছে। প্রচণ্ড ঝড়ে ফুলে ওঠা তাঁবুর মতো ভয়ঙ্কর এই গর্জনকে ঠেকাবে বলেই যেন নিজের অজান্তেই লোকটি কখন দুহাত শূন্যে মেলে ধরে।

মাঝে মাঝে দুটো বা তিনটে করে এক একটা নেকড়ের দল ওর সামনে দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে পথ পার হচ্ছে। অবশ্য দলে খুব ভারী নয় বলে কাছে ঘেঁষতে সাহস পাচ্ছে না। তাছাড়া ওদের লক্ষ্য এখন বলগা হরিণদের দিকে। বলগা হরিণরা যখন বিনা প্রতিরোধে আত্মসমর্পণ করে তখন কি দরকার এই বিচিত্র দর্শন জীবটার কাছে ঘেঁষার। বলা তো যায়না, মাথা খাড়া করে যে-ভাবে হাঁটছে, তাতে আঁচড়ে কামড়ে দিলেও দিতে পারে।

বিকেল নাগাদ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু হাড়-গোড় চোখে পড়ল লোকটির। আধঘণ্টাখানেক আগে একটা বলগা হরিণের বাচ্চা নেকড়েদের শিকার হয়েছে। মাংসহীন চক্‌চকে হাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে লোকটি ভাবে, একটু আগেও হরিণ-শিশুটি কর্কশ চিৎকারে চারিদিক মাতিয়ে তুলেছিল নিশ্চয়। প্রাণবন্ত চপল হরিণ শিশুটি এখন কতকগুলো মাংসহীন হাড়ের সমষ্টি মাত্র। তবু ওর মনে হয় ওই হাড়ের ভিতরকার জীবকোষে এখনো যেন প্রাণের স্পন্দন রয়েছে, বেশ লালচে দেখাচ্ছে। এমনও তো হতে পারে. দিন ফুরোবার আগে ওর-ও এই একই দশা হবে! এই তো জীবন, তাই না? অসার, সদা অপস্রিয়মাণ। একমাত্র জীবনই যন্ত্রণাদায়ক, মৃত্যুর মধ্যে কোন যন্ত্রণা নেই। মরা মানেই ঘুমোনো। মানে বিরাম, অনন্ত বিশ্রাম। কিন্তু তাই যদি হবে তাহলে ও কেন মৃত্যু বরণের চিন্তায় খুশী হতে পারছে না?

বেশীক্ষণ এসব নীতি কথা নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভাল! ঘাসের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে মুখে একটা হাড় পোরে। প্রাণের ক্ষীণ অবশিষ্টাংশ থাকার দরুণ হাড়ের ভেতরটা এখনো লাল দেখাচ্ছে! মিষ্টি মাংসের স্বাদ এতে এত কম যে, সত্যি মাংস খাচ্ছে না কল্পনায়

তা উপলব্ধি করছে বোঝা দুষ্কর। তবে এটা ঠিক যে স্বাদটা ওকে পাগল করে দিয়েছে। হাড়ের ওপর দুপাটি দাঁত বসিয়ে কচমচ করে চেবাতে শুরু করে। কখনো হাড়টা ভাঙে কখনো ওর দাঁত। শেষ পর্যন্ত হাড়গুলোকে একটা পাথরের ওপর রেখে আর একটা পাথর দিয়ে আঘাত করে। আঘাত করতে করতে মজ্জা সমেত হাড়গুলো একটা তালে পরিণত হলে সেটাকে গিলে নেয়। তাড়াহুড়োয় আঙুলের ওপর বাড়ি পড়ে। অবাক হয়ে ছাখে, এত জোরে আঙুলের ওপর আঘাত পড়ার পরও ও তেমন যন্ত্রণা অনুভব করছে না।

ভয়াবহ বৃষ্টি আর তুষারপাত শুরু হয়েছে। এ কদিন কখন কোথায় যে আস্তানা গেড়েছে আর কখনই বা তা গুটিয়ে নিয়েছে, নিজেই তা জানেনা। দিনেও যত হেঁটেছে, রাত্তিরেও তত। চলতে চলতে যেখানে পড়ে গিয়েছে সেখানেই শুয়ে বিশ্রাম নিয়েছে। আর যে যে সময় মৃতপ্রায় প্রাণটা নিবন্ত আলোক শিখার মত দপ্ করে উঠে আরো ম্লান হয়ে গিয়েছে তখন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়েছে। মানুষ হিসেবে ও আর এখন যুঝছে না, যুঝছে ওর মধ্যেকার মরণে অনিচ্ছুক মৃতপ্রায় প্রাণটা। এই প্রাণটাই ওকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। কষ্ট তেমন বোধ হচ্ছে না। স্নায়ুতন্ত্র ভোঁতা ও অসাড় আর মানসপটে শুধু অলৌকিক দৃশ্য ও লোভনীয় স্বপ্নের সমাবেশ।

বল্গা হরিণের ছানাটার সামান্য যে অবশিষ্টটুকু পড়েছিল, তাই জড়ো করে সঙ্গে নিয়েছিল লোকটি। পথ চলতে চলতে চূর্ণ বিচূর্ণ হাড়গুলোকে ক্রমাগত চুষছে আর চিবচ্ছে। এর মধ্যে পথে আর কোন পাহাড় বা জল-বিভাজিকা পেরোতে হয়নি। প্রশস্ত ও অগভীর উপত্যকার মধ্যে দিয়ে একটা বড় নদী বয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ লোকটির খেয়াল হয় সে এখন ওই নদীটির তীর ধরেই এগোচ্ছে। কখন যে সে ওই নদীর তীর ধরে এগোতে শুরু করেছে, কখন যে উপত্যকাটা পেরিয়েছে, কিছুই তার স্মরণে

নেই। এতক্ষণ সে শুধু কল্পিত দৃশ্য ছাড়া কিছুই দেখতে পায়নি। দেহ ও প্রাণশক্তির বন্ধন সূত্রটি এতই ক্ষীণ যে যদিও এরা পাশাপাশি থেকে হাঁটছে বা হামাগুড়ি দিচ্ছে তবু এদের মধ্যে ব্যবধান মোটেই অল্প নয়।

ঘুম ভাঙার পর প্রথম খেয়াল হল সে একটা চোখা পাথরের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। সূর্যের উজ্জ্বল উষ্ণ আলো চারিদিক ভরিয়ে দিয়েছে। দূর থেকে বলগা হরিণের বাচ্চাগুলোর কুঁই কুঁই শব্দ কানে আসছে। প্রচণ্ড বৃষ্টি আর তুষারপাত কিংবা ঝোড়ো বাতাসের সম্মুখীন হবার আবছা কিছু কিছু কথা মানস পটে ভেসে উঠছে, কিন্তু প্রবল ঝড়ের দাপটে কাবু হয়ে দুদিন শুয়ে কাটিয়েছে, না দু-সপ্তাহ—তা সে জানেনা।

খানিকক্ষণ নিশ্চলভাবে শুয়ে থাকে লোকটি। অকৃপণ সূর্য রশ্মি ঝরে পড়ে ওর ওপর, তুষার ও ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ হিম শীতল শরীরটাকে উষ্ণতায় চাঙ্গা করে তোলে। মনে মনে ও চিন্তা করে দিনটি আজ ভারী সুন্দর, ভারী উজ্জ্বল। এখন সে ঠিক কোথায় আছে, আজই হয়তো তার হদিশ করতে পারবে। নীচ দিয়ে একটা প্রশস্ত ধীর-স্রোতা নদী বয়ে যাচ্ছে। অপরিচিত নদীটিকে দেখে ও অবাক হয়। চোখ মেলে জলধারাটিকে অনুসরণ করে। বড় বড় বাঁক নিয়ে বহু নীচু আর নেড়া নেড়া পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে ঘুরে ফিরে এগিয়ে গেছে নদীটি। এ পর্যন্ত যে-কটা পাহাড় ও দেখেছে এগুলো আকারে তার চেয়ে ছোট এবং আরো নেড়া। লোকটি এবার নদীর পথরেখা অনুসরণ করছে। উত্তেজনাহীন ধীর পদক্ষেপ—আগ্রহ যেটুকু প্রকাশ পায় তা অতি মামুলী ধরনের। উচ্ছল এক সাগরে গিয়ে পড়েছে নদীটি। এ দৃশ্যও কিন্তু লোকটিকে উত্তেজিত করতে পারে না। ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার, মনে মনে ভাবে। এটা কাল্পনিক দৃশ্য না মরীচিকা? খুব সম্ভবত কাল্পনিক দৃশ্য, বিশৃঙ্খল মনের একটা চাতুরী। ঝলমলে সমুদ্রের মাঝখানে একটা জাহাজকে নোঙর ফেলা অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে

সন্দেহ আরো দৃঢ় হয়। মুহূর্তের জন্যে চোখ বন্ধ করে, তারপর আবার খোলে—আশ্চর্য, এখনো দৃশ্যটা মেলায়নি। তবে আশ্চর্য হবারই বা কি আছে, এতো সবাই জানে যে বন্ধ্যা প্রান্তরের মাঝ মধ্যিখানে সমুদ্র বা জাহাজ থাকতে পারে না। যেমন জানতো—বন্দুকে টোটা নেই—

পিছনে একটা ঘড় ঘড় শব্দ শোনে—কতকটা হাঁপ ওঠার মতো। শারীরিক দুর্বলতার জন্যে খুব আস্তে আস্তে পাশ ফেরে। কাছাকাছির মধ্যে কিছুই নজরে পড়ে না। তবু ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করে যদি কিছু দেখতে পায়। আবার ঘড় ঘড় শব্দ কানে আসে। বোধ হয় কুড়ি ফুট দূরও হবে না, এবড়ো খেবড়ো দুটো পাথরের মধ্যে একটা নেকড়ের ধূসর মাথাখানা চোখে পড়ে। নেকড়েটার কানগুলো তেমন ছুঁচোলো নয়। তাছাড়া চোখ দুটো ঘষা-ঘষা রক্তবর্ণের। মাথাটা অসহায়ের মতো ঝুলে রয়েছে। জন্তুটা সূর্যালোকে ক্রমাগত চোখ পিট পিট করে তাকাচ্ছে। অসুস্থ বলেই মনে হয়। জন্তুটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই ফের ওটার হাঁপ ওঠে, কাশে। এখন ও যা দেখছে সেটা যে অলীক কিছু নয়, তা ও নিশ্চিতভাবে বুঝেছে। উল্টো দিকে চোখ ফিরিয়ে একবার বাস্তব জগতটাকে ভাল করে দেখে নেয়। এতক্ষণ এই বাস্তব জগতটাই কাল্পনিক দৃশ্যের আড়ালে ঢাকা পড়েছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য! দূরে সমুদ্রটা এখনো ঝকমক্ করছে, জাহাজটাও পরিষ্কার চোখে পড়ছে। তাহলে যা দেখছে তা সত্যি? চোখ বুজে বেশ খানিকক্ষণ চিন্তা করার পর ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম হয়। ডিজে. জল বিভাজিকা দূরে রেখে এতদিন ও উত্তর পূর্ব দিকে এগিয়েছে—অর্থাৎ কপার মাইন উপত্যকার দিকে। এই প্রশস্ত ধীরস্রোতা নদীটি তাহলে কপার মাইন নদী। আর ওই উজ্জ্বল সাগরটি তবে সুমেরু সাগর। জাহাজটা নিশ্চয় তিমি শিকারের, ম্যাকেঞ্জি নদীর মুখ থেকে পূর্ব দিকে, অনেকটা পূর্বদিকে সরে এসে করোনেশান ফাঁড়িতে নোঙর ফেলেছে। বহুদিন আগে দেখা হাডসন্স বে

কম্পানির চার্টের কথা মনে পড়ে, এ ব্যাপারে আর কোন দ্বিধা নেই। নিজের সিদ্ধান্তটা যুক্তিমাফিক বলেই মনে হয়।

উঠে বসে প্রয়োজনমাফিক জিনিসপত্র গোছানোর দিকে মনোনিবেশ করে। কম্বলের ফেট্টি দুটো ছিঁড়ে গেছে, পা দুটো আকারবিহীন কাঁচা মাংসের তালে পরিণত হয়েছে। শেষ কম্বলটাও গত। বন্দুক ও ছোরা, দুটোই হারিয়েছে। তাছাড়া টুপিটা পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দেশলাই কাঠিগুলোও লোপাট। তামাকের থলিতে তেলা কাগজ মোড়া দেশলাই কাঠিগুলো বুকের মধ্যে ঠিকই আছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ছাখে এগারোটা বেজেছে। ঘড়িটা এখনো চলছে। বোঝাই যাচ্ছে সময় মতো দম দিতে ভুল হয়নি।

লোকটি এখন শান্ত, সুস্থির। অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে ঠিকই, কিন্তু কোন যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি নেই। ক্ষুধার্তও নয়। খাদ্যের চিন্তা আগের মতো আর ওর মনকে প্রলুব্ধ করছে না। যুক্তিহীন এলোমেলো চিন্তা আর ওকে কাবু করতে পারছে না। প্যান্টের তলার দিকে দুটো হাঁটুর কাছ থেকে কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে পায়ে জড়িয়ে নেয়। যে করেই হোক টিনের পাত্রটা কাছছাড়া হয়নি। জাহাজ অভিমুখে যাত্রা শুরু করার আগে, খানিকটা গরম জল খেয়ে নেয় লোকটি, কারণ ও অনুমান করতে পারে এ যাত্রা হবে অত্যন্ত কষ্টকর এবং ভয়াবহ।

অত্যন্ত ধীরে মন্থর গতিতে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত কাঁপতে কাঁপতে এগোতে থাকে। মাঝখানে একবার শুক্‌নো শেওলা সংগ্রহ শুরু করার পর ছাখে যে আর উঠে দাঁড়ানোর শক্তি নেই। বার বার চেষ্টা করেও উঠে দাঁড়াতে পারে না। শেষ পর্যন্ত চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিয়েই এগোতে থাকে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে এগোতে এক সময় নেকড়েটার কাছে গিয়ে পড়ে। অনিচ্ছুকভাবে জন্তুটা ওর পথ থেকে সরে আসে। জিভ দিয়ে থাবাগুলো চাটতে শুরু করে। দেখে মনে হয় এমন শক্তিও নেই যে জিভটাকে মুড়বে। লোকটি

লক্ষ্য করে যে নেকড়ের জিভটা সুস্থ স্বাভাবিক লাল রঙা নয়, হলদে খয়েরির মিশ্রণ, রুক্ষ গোছের—আধ শুকনো শ্লেষ্মায় ঢাকা।

দু' পাঁইটের মতো গরম জল খাবার পর লোকটি দেখল ও দাঁড়াতে পারছে, হাঁটতেও পারছে, যদিও সেই চলার পায়ে পায়ে মৃত্যু পথযাত্রীর শিথিলতা। মিনিটে মিনিটে দাঁড়িয়ে পড়ে বিশ্রাম নিতে হয়। পিছু পিছু নেকড়েটাও আসছে। ওর মতো নেকড়েটারও প্রতিটি পদক্ষেপ দুর্বল এবং অনিশ্চিত। রাত্রি নামে, অন্ধকারে ডুবে যায় ঝল্‌মলে সমুদ্রটা। বুঝতে পারে সমুদ্রের দিকে চার মাইলের বেশী এগোতে পারেনি।

সারারাত ধরে কানে আসে অসুস্থ নেকড়েটার দম বন্ধ করা কাশির শব্দ আর বল্‌গা হরিণের ছানাদের কুঁই কুঁই ডাক। লোকটির চারধার ঘিরে জীবনের ছড়াছড়ি, তবে তা বড় কঠিন জীবন—অতি সজীব, অতি সুস্থ। আর এই জন্যেই ও অসুস্থ মানুষটার পিছু ছাড়ছেনা কিছুতে। কারণ নেকড়েটার অনুভূতি ওকে বলে দিচ্ছে মানুষটাই আগে মরবে—আর তখন ....

সকালে চোখ মেলতেই দ্যাখে নেকড়েটা সতৃষ্ণ ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে ওকে পর্যবেক্ষণ করছে। গুড়িশুড়ি মেরে দাঁড়িয়ে আছে। মরণাপন্ন ঘেয়ো কুকুরের মতো লেজটা দু'পায়ের মধ্যে ঢুকে আছে।

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় অসুস্থ নেকড়েটা কাঁপছে। লোকটি নেকড়েটাকে উদ্দেশ্য করে কি যেন বলে কিন্তু গলার কর্কশ স্বর ফিস্‌ফিসানির ওপরে ওঠে না। নেকড়েটা নিরুৎসাহী ভাবে দাঁত খিঁচোয়।

উজ্জ্বল সূর্যের দেখা মিলেছে এবার। সারা সকাল ধরে টল্‌মলে পায়ে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলে - লক্ষ্য তার তিমি ধরা জাহাজটি। এগোতে এগোতে বারবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে। পারষ্কার আবহাওয়া। এই উচ্চ অক্ষাংশ সুলভ ক্ষণস্থায়ী গ্রীষ্মকালের স্থায়িত্ব এক সপ্তাহ হতে পারে আবার কাল কিংবা তার পরের দিনও এর মেয়াদ ফুরতে পারে।

বিকেল নাগাদ লোকটি চলার পথে আরেকজন মানুষের পায়ের ছাপ দেখতে পেল। বোঝা যাচ্ছে লোকটি চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিয়েছে। বিলও হতে পারে বলে ওর মনে হয়। মনে হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু কোন উত্তেজনা প্রকাশ পায় না। কোন আগ্রহই নেই। বস্তুতঃ ওর আর এখন আবেগ অনুভূতি বলে কিছু নেই। শারীরিক যন্ত্রণা অবধি টের পাচ্ছে না। পেট এবং স্নায়ু সমূহের নিদ্রামগ্ন অবস্থা, তবু দেহের অন্তর্বর্তী জীবনটুকু ওকে এখনো চালিত করছে। মরণের সঙ্গে যুঝে চলেছে। মরতে ও কিছুতেই রাজী নয় বলেই এখনো বিস্বাদ মাসকেগ বেরী এবং 'মিনো' খাচ্ছে, গরম জলটুকু নিয়মিত পান করছে। সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখছে অসুস্থ নেকড়েটার ওপর, যদি আক্রমণ করে বসে!

চার হাত পায়ে আগুয়ান মানুষটির পদচিহ্ন অনুসরণ করে শীঘ্রই ও অপরিচিত যাত্রাপথের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছয়। কতকগুলো হাড় চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। মনে হয় অল্পক্ষণ আগেই ভোজন পর্বটি সমাধা করা হয়েছে। ভিজে শেওলার ওপর বহু নেকড়ের পায়ের থাবার দাগ। হঠাৎ ছাখে ওর হরিণের চামড়ার থলির জোড়াটা পথের মধ্যে পড়ে রয়েছে। তীক্ষ্ণ দাঁতের আক্রমণে ছিন্নভিন্ন। লোকটির দুর্বল আঙুলের ক্ষমতা অনুযায়ী চামড়ার থলিটার ওজন খুব বেশি হওয়া সত্ত্বেও ওটাকে তুলে ধরে। বিল এটাকে শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে রেখেছিল। হাঃ—হাঃ! বিলকে দেখিয়ে দেবে, ওস্তাদের মার শেষ রাতে। ও ঠিক বেঁচে যাবে আর এটাকেও ঠিক বয়ে নিয়ে যাবে ঝলমলে সমুদ্রের বুকে নোঙর ফেলা জাহাজটায়। দাঁড়কাকের ডাকের মতোই লোকটির আনন্দের বীভৎস, কর্কশ প্রকাশ। নেকড়েটাও ওর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বিষাদক্লিষ্ট ভাবে গর গর করে। আচমকা লোকটি থমকে দাঁড়ায়—এই লালচে-পানা চাঁচাছোলা সাদা হাড়গুলোকে যদি বিল বলতে হয় তাহলে কি করে ওকে মজাটা টের পাওয়াবে? ঘুরে দাঁড়ায় লোকটি। দুর্বল পায়ে এগোতে এগোতে ভাবে—বিল ওকে পরিত্যাগ

করেছিল বটে, কিন্তু বিলের সোনা ও নেবেনা, আর হাড়গুলো মুখে পুরে চুষবেও না। অবশ্য ওর জায়গায় বিল থাকলে এমন সুযোগ কিছুতেই ছাড়ত না।

এগোতে এগোতে একটা পুকুরের কাছে এসে পৌছয় লোকটি। 'মিনো'র খোঁজে ঝুঁকে দেখতে গিয়ে এক ঝটকায় মাথাটা সরিয়ে নেয়। জলে নিজের মুখের প্রতিফলন দেখে ভয়ে আঁতকে উঠেছে। ভয়ানক বীভৎস সে মুখ। সব কিছু অন্ধকার দ্যাখে। বেশ কিছু-ক্ষণ পরে অচৈতন্য ভাবটা কাটে। জল ছেঁচা সম্ভব নয়, কারণ পুকুরটা যথেষ্ট বড়। টিনের পাত্রটা নিয়ে কয়েকবার মাছ ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করে, তারপর আশা ছেড়ে দেয়। ভয় পায়, প্রচণ্ড দুর্বলতা বশতঃ হয়তো পড়ে যেতে পারে, ডুবে যাওয়াও অসম্ভব কিছু নয়। একই কারণে বালির চরে আটকে পড়া কোন কাঠের গুঁড়ি চ'ড়ে ও নদী পেরোতে সাহস পায়নি।

জাহাজ আর লোকটির মধ্যেকার ব্যবধান আজ তিন মাইল কমেছে। পরের দিন হয়তো দুই মাইল হবে- কারণ ও এখন বিলের মত হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে। এই ভাবেই পঞ্চম দিনটি পেরোল, এখনো জাহাজ থেকে ওর দূরত্ব সাত মাইল। দিনে এক মাইল পথও পেরোতে পারছে না। ক্ষণস্থায়ী গ্রীষ্ম এখনও বিদায় নেয়নি। আবার লোকটি হামাগুড়ি দিতে শুরু করে। মাঝে মাঝে জ্ঞান হারায়, জ্ঞান ফিরলে আবার হামাগুড়ি দেয়। অসুস্থ নেকড়েটা ওর পায়ে পায়ে যেন জড়িয়ে রয়েছে। কাশছে, হাঁপাচ্ছে আর অনুসরণ করছে। জামার পিছনের অংশ ছিঁড়ে নিয়ে হাঁটুর তলায় প্যাডের মত জড়িয়ে নেওয়া সত্ত্বেও পা দুটোর মতো হাঁটু দুটোও দগদগে কাঁচা মাংসে পরিণত হয়েছে। পথের শেওলা আর পাথরের ওপর রক্তের চিহ্ন আঁকতে আঁকতে লোকটি এগিয়ে চলে। হঠাৎ একবার পেছন ফিরতেই চোখে পড়ে ক্ষুধার্ত নেকড়েটা সেই রক্ত চিহ্নগুলো জিভ দিয়ে চেটে পরিষ্কার করে দিচ্ছে। বুঝতে আর ওর বাকী থাকে না, এখনই যদি ওটাকে খতম করতে না পারে তাহলে

অন্তিম পরিণতি কি হবে। এর পরই শুরু হয়ে যায় অস্তিত্বের লড়াইয়ের এক মর্মস্পর্শী নাটক। যার জুড়ি মেলা ভার। জীবন সংগ্রামে বিপর্যস্ত একটি অসুস্থ লোক হামাগুড়ি দিচ্ছে, হিংস্র আক্রোশে ফুঁসছে আর অন্যদিকে এক ক্ষুধার্ত অসুস্থ নেকড়ে খোঁড়া পায়ে গুটিগুটি এগোচ্ছে। শিকারের এক উন্মাদ নেশায় দু পক্ষই উদগ্রীব। নির্জন প্রান্তরের মাঝ দিয়ে দুটি প্রাণী নিজেদের মৃতপ্রায় দেহদুটোকে টেনে নিয়ে চলেছে।

নেকড়েটা সুস্থ হলে ওর এত মাথা ঘামানোর কিছু থাকত না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওকে দিয়ে এই মৃতপ্রায় ঘৃণ্য নেকড়েটা ওর ক্ষুধার্ত পেট ভরাবে, এ চিন্তা অত্যন্ত অপ্রীতিকর। মনটা খুঁত খুঁত করছে। আবার চিন্তাগুলো এলোমেলো হয়ে পড়ছে। কতগুলো মায়াদৃশ্য ওকে বিভ্রান্ত করে তোলে। এখন ও আর সুস্থ ভাবে কিছুই ভাবতে পারছে না। সুস্থ ভাবে চিন্তা করার অবকাশই পাচ্ছেনা।

একেবারে কানের কাছে একটা ফোঁসফোঁসানির শব্দে সংবিৎ ফিরে পায় লোকটি। নেকড়েটা লেঙচে পালাতে গিয়ে পায়ের জোর হারিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। খুবই হাস্যকর দৃশ্য। কিন্তু একটুও মজা পায় না লোকটি, অবশ্য ভয়ও পায়নি। ভীতি নামক পদার্থটিকে সে কবে হারিয়ে বসেছে। এই দৃশ্য ওকে সুস্থ ভাবে ভাবতে সুযোগ করে দেয়। শুয়ে শুয়ে তাই ভাবে, কি করা উচিৎ। এখান থেকে জাহাজটার দূরত্ব চার মাইলের বেশী নয়। চোখের জল মুছে তাকিয়ে এখান থেকেই জাহাজটাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে আর সেই সঙ্গে দেখছে সাদা পাল তোলা একটি নৌকো ঝলমলে সমুদ্রের বুক চিরে এগোচ্ছে। কিন্তু এই চার মাইল পথ ওর পক্ষে যে কোন ভাবেই হামাগুড়ি দিয়ে পার হওয়া সম্ভব নয় তা ও জানে এবং জেনেও ও ওর কর্তব্য কর্মে অবিচল। ভাল করেই বুঝতে পারছে আর আধ মাইল পথও পার হতে পারবে না—তবু ও বাঁচতে চায়। এতদিন ধরে এত সঙ্কটের মোকাবিলা করার পরও ওকে মরতে হবে একথা ও মানতে রাজী নয়। তাছাড়া এটা অযৌক্তিক।

মানুষটির ওপর দুর্ভাগ্যের দাবীর যেমন অন্ত নেই, তেমনি সেও কিছু কম যায় না। অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও সে মৃত্যুকে অস্বীকার করছে।

চোখ বুজে অতি সতর্ক ভাবে নিজের ওপর নিজের কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনে। তীরের ওপর আছড়ে পড়া উত্তাল ঢেউয়ের মতো ওর অস্তিত্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে শ্বাসরোধকারী অবসন্নতা ক্রমাগত ওকে আঘাত হানছে তার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে ও জয়ী হতে চায়। বাঁচার সংগ্রামে মরণকে অস্বীকার করতে চায়। এই মারাত্মক অবসন্নতার প্রকৃতি সমুদ্রের মতো, ধীরে ধীরে ফুলে ফেঁপে উঠে চৈতন্যকে গ্রাস করে। কখনো কখনো ও নিমজ্জিত হয়ে পড়ে অবসন্নতার সমুদ্রে, বিস্মৃতির অতলে তখন এলোমেলো ভাবে হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতরায়। আবার কখনো অজ্ঞাত অদ্ভুত প্রাণ-রসায়নের দৌলতে মনোবলের ভগ্নাবশেষ ফিরে পায় এবং আবার নতুন উদ্যমে রুখে দাঁড়ায়।

লোকটি একেবারে নিশ্চল হয়ে শুয়ে থাকে, অসুস্থ নেকড়েটা ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে, হাঁসফাঁস শব্দ থেকেই টের পেয়েছে। মনে হয় অনন্ত কাল ধরে ওটা ক্রমশ কাছেই এগিয়ে আসবে। লোকটি একটুও নড়ে না। কানের গোড়ায় এসে পৌঁছেছে নেকড়েটা। গালের ওপর জন্তুটার কর্কশ জিভের স্পর্শ শিরিষ কাগজ ঘষার মতো লাগে। ঝটিতে দুটো হাত প্রসারিত করে—ওর নখগুলো বাজপাখির ফলার মত তীক্ষ্ণ। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, মুঠোর মধ্যে শুধু খানিকটা বাতাস আটকা পড়ে।

সাংঘাতিক ধৈর্য নেকড়েটার। অবশ্য লোকটির ধৈর্যও কিছু কম নয়। দিনের অর্ধেকটা নিশ্চলভাবে শুয়েই কাটিয়ে দেয়। যাতে না বেহুঁশ হয়ে পড়ে তার জন্যে ক্রমাগত নিজের সঙ্গে লড়াই করে চলে। প্রতীক্ষা করে, কখন নেকড়েটা ওকে খেতে আসে এবং শেষ পর্যন্ত ওরই খাদ্য হয়। কখনো কখনো লোকটি অবসন্নতার অতলে তলিয়ে যায় এবং সুদীর্ঘ সব স্বপ্ন দেখে, কিন্তু এই নিদ্রা ও

জাগরণের মধ্যেও লোকটি সদা প্রতীক্ষারত। শুধু ভাবে এই বুঝি কানের কাছে নিশ্বাসের শব্দ শুনল, এই বুঝি কর্কশ জিভটার সোহাগ স্পর্শ ওকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলল।

নিশ্বাসের শব্দটা কিন্তু লোকটি শুনতে পায়নি, তখন ও স্বপ্ন দেখছিল। শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে তন্দ্রা কেটে যায়, বুঝতে পারে নেকড়েটা জিভ দিয়ে হাত চাটছে। লোকটি সুযোগের অপেক্ষা করে। থাবাগুলো আলতো ভাবে চাপ দিচ্ছে। চাপটা আরো বাড়ে। নেকড়েটা সুদীর্ঘ কাল যার জন্যে প্রতীক্ষা করেছে, সেই খাদ্যের ওপর দাঁত বসাবার চেষ্টায় সব শক্তিটুকুকে সযত্নে ব্যবহার করছে। লোকটিও দীর্ঘকাল ধরে অপেক্ষা করেছে। এবার ওর রক্তাক্ত দন্তবিদীর্ণ হাতখানা নেকড়েটার চোয়ালটাকে চেপে ধরে। নেকড়েটা দুর্বলভাবে যুঝছে—আর লোকটিও দুর্বলভাবে মুঠো পাকিয়ে রেখেছে। শেষ পর্যন্ত লোকটি ধীরে ধীরে অন্য হাতটা দিয়ে নেকড়েটাকে প্যাঁচে ফ্যালে। মিনিট পাঁচেক পেরোবার পর দেখা যায় লোকটির পুরো দেহের ওজনের তলায় নেকড়েটা পিষ্ট হচ্ছে। নেকড়েটাকে যে টুঁটি টিপে মারবে, ওর কব্জিতে সে জোর নেই। শেষ পর্যন্ত লোকটি দাঁত বসিয়ে দেয় নেকড়ের গলায়। মুখ ঢেকে গেছে বড় বড় লোমে। আধ ঘণ্টা খানেক পর লোকটি বুঝতে পারে গলা দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে উষ্ণ রক্ত নামছে। অনুভূতিটা সুখপ্রদ নয়। এ যেন গলিত সীসা গিলতে বাধ্য হওয়া। আর এই বাধ্য হবার পেছনে রয়েছে তার নিজেরই প্রতিজ্ঞা। খানিক পরেই লোকটি চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

তিমি শিকারের জাহাজ 'বেডফোর্ড'-এ ছিলেন ক'জন বিজ্ঞানী। ওঁদের দল বৈজ্ঞানিক পর্যটনে বেরিয়েছে। ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে ওঁরা তীরের কাছে অদ্ভুত একটা জন্তু লক্ষ্য করেন। জন্তুটি তীর বেয়ে সমুদ্রের দিকে এগোচ্ছে। এটি যে কি তা তাঁরা অনুমান করতে পারেন না। ওঁরা তখন জাহাজের সঙ্গে লাগোয়া একটি

নৌকোয় চড়ে বসেন। অনুসন্ধান করতে তীরের দিকে রওনা দেন। তীরের ওপর যাকে ওঁরা পড়ে থাকতে দেখলেন তার প্রাণ আছে বটে, কিন্তু তাকে মানুষ বলা খুব শক্ত। লোকটি অন্ধ, বেহুঁশ। কীটের মতো মাটির ওপর কিল্‌বিল্‌ করছে। এগোবার জন্যে এই দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা বহুলাংশেই বিফল হচ্ছে তবু লোকটি নাছোড়বান্দা। লোকটি ঘণ্টা পিছু কুড়ি ফুটও বোধহয় এগোতে পারছিল না।

তিন সপ্তাহ পরে লোকটি 'বেডফোর্ড'-এর একটি শয্যায় শুয়ে বলবার চেষ্টা করছিল, সে কে এবং কেন সে এখানে এসেছিল। ওর হাড় বার করা গাল বেয়ে অঝোরে ঝরছিল অশ্রু। ওর অসংলগ্ন অনর্গল কথা থেকে এটুকু বোঝা যাচ্ছিল যে লোকটি তার মায়ের কথা বলছে। বলছে সূর্য করোজ্জ্বল দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার কথা আর কমলালেবুর বাগান ঘেরা ছোট্ট একটা বাড়ির কথা।

এরপর খাবার টেবিলে বিজ্ঞানী ও জাহাজের অফিসারদের সঙ্গে যোগ দিতে ওর আর বেশীদিন সময় লাগে না। খাদ্য সম্ভারের বহর দেখে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে লোকটি। অন্যরা খাবার তুলে মুখে পোরার সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্বিগ্ন দেখায়। এক এক গ্রাস খাদ্য অদৃশ্য হয় আর অমনি ওর দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে এক গভীর অনুতাপ।

লোকটি এখন পুরোপুরি প্রকৃতিস্থ বটে কিন্তু খাবার সময় ও এদের কাউকে সহ্য করতে পারেনা। মজুত খাদ্য ফুরিয়ে যাবার আতঙ্ক ওকে যেন পেয়ে বসেছে। পাচক, কেবিন বয় আর ক্যাপ্টেন —ভাঁড়ারে কতটা কি আছে না আছে প্রত্যেকের কাছে খোঁজ নিয়েছে। বারবার আশ্বস্ত করা সত্ত্বেও ওদের কথা বিশ্বাস করতে পারেনা। নিজের চোখে দেখবে বলে চোরের মতো ভাঁড়ারের আশে পাশে ছুঁক ছুঁক করে বেড়ায় লোকটি।

লোকটি দিন দিন মোটা হতে শুরু করেছে। বিজ্ঞানীরা চিন্তিত ভাবে মাথা নেড়ে আলাপ আলোচনা করেছেন এবং ওর জন্যে বরাদ্দ খাদ্যের পরিমাণটা কমিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তবু ওর

পেটের বহর দিন দিন বাড়তেই থাকে—সার্টের তলায় বিস্ময়করভাবে ভুঁড়িটা ফুলে ওঠে। নাবিকরা মিটিমিটি হাসে। ওরা ব্যাপারটা জানে। শেষ পর্যন্ত কয়েকদিন চোখে চোখে রাখার পর বিজ্ঞানীরাও ব্যাপারটা জানলেন। ওঁরা দেখলেন, প্রাতরাশের পর লোকটি ভিক্ষুকের মতো ঝুঁকে পড়ে একজন নাবিকের সামনে হাত বাড়িয়ে ধরলো। নাবিকটি হেসে জাহাজী বিস্কুটের এক টুকরো ওকে দিল। লোভীর মতো ও মুঠো করে ধরে বিস্কুটটা আর এমনভাবে চেয়ে ভাখে যেন মনে হয় সে এক কৃপণ সোনার তালের সন্ধান পেয়েছে। তারপর সার্টের তলায় বিস্কুটটা লুকিয়ে ফ্যালে। অন্য নাবিকরাও হাসতে হাসতে ওকে বিস্কুট দেয়। বিজ্ঞানীরা কথাটা জানতে পেরেও চেপে গেলেন। লোকটিকে ওরা ঘাঁটালেন না কিন্তু গোপনে ওর শোবার বাঙ্কে তল্লাশী চালালেন। দেখা গেল জাহাজী বিস্কুটে বাঙ্ক ভর্তি,জাহাজী-বিস্কুটে গদি ঠাসা প্রতিটি আনাচে কানাচে গোঁজা রয়েছে জাহাজী বিস্কুট। অথচ লোকটি অপ্রকিতস্থ নয়। সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে মাত্র। বিজ্ঞানীরা বললেন, এটা সাময়িক। স্যান ফ্রান্সিসকো বে'তে 'বেডফোর্ড' নোঙর ফেলার আগেই বিজ্ঞানীদের কথা সত্যি প্রমাণিত হল।

এক টুকরো মাংস

পাঁউরুটির শেষ টুকরোটা দিয়ে প্লেট থেকে ময়দার তরকারির অবশিষ্টটুকু চেঁচেপুঁছে তুলে নিল টম কিঙ। টুকরোটাকে মুখে পুরে ধীরে সুস্থে চিন্তামগ্ন ভাবে চেবাতে শুরু করল। খাওয়া শেষ করে টেবিল থেকে ওঠার পরেও মনে হচ্ছে খিদেটা মেটেনি। তবু তো বাড়ির মধ্যে ও একাই আজ খেয়েছে। ছেলে ছুটোকে আগে ভাগে ঘুম পাড়িয়ে পাশের ঘরে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে ওরা খেতে পায়নি বলে চেঁচামেচি না করে। টমের স্ত্রী মুখে কিছু ঠেকায়নি। চেয়ারে বসে স্নেহভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। শ্রমিক ঘরের মেয়ে টমের বৌ। শুক্নো রোগা চেহারা কিন্তু তবু মুখ থেকে লাবণ্যটুকু এখনো পুরো মুছে যায়নি। তরকারির জন্মে ময়দাটা সে প্রতিবেশীর কাছ থেকে ধার করে এনেছিল। শেষ পুঁজি ছুটো আধ পেনি খরচ হয়েছে পাঁউরুটি কিনতে।

জানলার পাশে রাখা একটা অতি রুগ্ন চেয়ারের ওপর বসামাত্র চেয়ারটা টমের ভারের প্রতিবাদে ককিয়ে উঠল। মেশিনের মতো অভ্যাসবশতঃ পাইপটা মুখে গুঁজে কোটের পাশ পকেটে হাত পুরে দিল টম। পকেটে তামাক না পেয়ে তার হুঁশ ফিরল। নিজের ভুলো মনের কথা ভেবে ভুরু কুঁচকে পাইপটা মুখ থেকে সরিয়ে নিল। ওর নড়াচড়ার ব্যাপারটাই কেমন মন্থর। যেন নিজের পেশীর ভারে নিজেই কাবু। পাথরের চাঁইয়ের মতো বিশাল দেহের অধিকারী টম কিঙ। সস্তা কাপড়ের ঢলঢলে প্যান্ট শার্টগুলো বহুদিনের পুরোনো। জুতোর তলায় অনেক দিন আগেই সুকতলা মারা হয়েছে, ওপরের চামড়াও ছিঁড়বো ছিঁড়বো করছে। ছু শিলিঙ দামের সুতীর শার্টের কলারটা ফাটা। সারা জামাময় রঙের দাগ। কাচলেও উঠবে না।

কিন্তু এ সবই গৌণ। টম কিঙের সত্যিকার পরিচয় পেতে হলে ওর মুখের দিকে তাকাতে হবে। তাহলেই নিঃসন্দেহে বলা যাবে

ও একজন পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা। চারচৌকো দড়ি বাঁধা রিঙের মধ্যে জীবনের বেশ কিছু বছর সে পার করেছে আর তারই দৌলতে তার মুখখানা আজ যোদ্ধা পশুর মতোই চিহ্নিত। সত্যি, মুখখানা দেখলেই মেজাজ বিগড়ে যাবার কথা। তার ওপর আবার পরিষ্কার করে দাড়ি কামানোর জন্যে মুখের প্রতিটি রেখা যেন আরো কুৎসিত ভাবে আত্মপ্রচার করছে। মুখের মধ্যে একটা গভীর ক্ষতচিহ্নের মতো কদাকার ঠোঁট দুটো থেকে যেন মাত্রাতিরিক্ত রুক্ষতা ঝরে পড়ছে। ভারী ভারী চোয়ালদুটোয় পাশবিক একটা আক্রোশ জমে আছে। রোমশ ভুরুর তলায় অলস মন্থর ভাবাবেগহীন দুটো চোখ। নিছক পশু হিসেবে সনাক্ত করার পক্ষে সবচেয়ে সহায়ক ওর অনুভূতিশূন্য চোখ দুটো। নিদ্রাতুর চোখ দুটে যেন সিংহের মত—শিকারী জন্তুর যেমন হয়। কপালের দিকটা ঢালু হয়ে উঠে গেছে। কদমছাঁট চুলের তলায় এবড়ো খেবড়ো মাথাটা পাক্কা বদমাইশের মতো দেখায়। নাকটা দু'বার ভেঙেছে আর অসংখ্য আঘাতে যথেচ্ছ একটা আকার নিয়েছে। কানদুটো আকারে দ্বিগুণ হয়ে ঠিক ফুলকপির মতো ফুলে আছে। এত অলঙ্কারের পর আবার সদ্য-কামানো মুখে দাড়ির আভাস একটা নীলচে কালো ছোপ ফেলেছে।

মোটের ওপর অন্ধকার গলিতে বা নির্জন জায়গায় হঠাৎ ওর মুখোমুখি হলে যে কেউ ভয় পেতে পারে। কিন্তু তবু টম কিঙ অপরাধী নয়। আজ অবধি কোন অপরাধই সে করেনি। দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত মামুলী ঝগড়াঝাটির কথা বাদ দিলে কারুর কোন অনিষ্ট করেনি। গায়ে পড়ে ঝগড়া করাটা অবধি তার স্বভাবে নেই। ও পেশাদার বক্সার। কাজেই ওর চরিত্রের পাশবিক অংশটুকু পেশাদার লড়াইয়ের মঞ্চের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রিঙের বাইরে টম কিঙ সাদাসিধে মানুষ, কারুর সাতে পাঁচে নেই। অল্প বয়সে যখন প্রচুর রোজগার করেছে, নিজের ভালমন্দ বিচার না করেই পাঁচ জনের জন্যে অঢেল করেছে। কারুর ওপর ওর যেমন কোন বিদ্বেষ নেই, তেমনি ওরও কোন শত্রু নেই বললেই চলে। লড়াইটা ওর

কাছে একটা ব্যবসা। রিঙের মধ্যে ও আঘাত হানে যখন, ধ্বংস করবার জন্যেই হানে। বাকরুদ্ধ করবার জন্যেই হানে। কিন্তু তার মধ্যে কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ কাজ করে না। এটা সাদাসিধে লেন-দেনের ব্যাপার। লোকে যে পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে খেলা দেখতে হাজির হয় সে তো একজন আরেকজনকে গায়ের জোরে হারিয়ে দিচ্ছে দেখবার জন্যেই। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে টম লড়তে নেমেছিল উলুজুলু গজারের বিরুদ্ধে। তার মাত্র চার মাস আগে নিউ ক্যাসেলের লড়াইয়ে গজারের চোয়াল ভেঙেছিল। সব জেনেশুনেই টম ওর ভাঙা চোয়ালটাকেই তার আক্রমণের লক্ষ্য করে নবম রাউণ্ডে আবার গজারের চোয়াল ভেঙেছিল। তার মানে কিন্তু এই নয় যে গজারের ওপর তার বিশেষ কোন রাগ ছিল। লড়াইয়ে জেতবার এইটাই ছিল সহজ উপায়। না জিতলে টাকা আসবে কোত্থেকে। গজারও এর জন্যে টমের ওপর আদৌ বিরূপ হয়নি। এইটাই তো খেলা আর খেলতে যখন ওরা নামে তখন নিয়ম জেনেই নামে।

টম কিণ্ড কোনদিনই বেশী কথার মানুষ নয়। জানলার ধারে বসে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে নীরবে তাকিয়ে ছিল হাত দুটোর দিকে। হাতের উলটো পিঠে শিরাগুলো দড়ির মতো ফুলে আছে। আঙুলের গাঁটগুলো বারবার চোট খেয়ে থেঁতলে যে বিশ্রি আকার ধারণ করেছে তার থেকেই বোঝা যায় এগুলোকে কোন্ কাজে লাগানো হয়েছে। শিরা উপশিরার সঙ্গে জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রের কথা টম কিণ্ড জানেনা কিন্তু কেন ওগুলো অমন ফুলে উঠেছে সেটা জানে। ওর হৃৎপিণ্ড বারংবার উচ্চ চাপে এবং অত্যধিক মাত্রায় রক্ত সরবরাহ করেছে শিরাগুলোয়। দীর্ঘদিন এই ঘটনা ঘটতে থাকায় শিরাগুলো এখন আর কোন সময়েই সাধারণ আকার ধারণ করে না। শিরার স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে টমের সহ্য ক্ষমতাও হ্রাস পেয়েছে। এখন ও অল্পেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এখন ও আর আগের মতো কুড়ি রাউণ্ডের লড়াই চালাতে পারে না। এক রাউণ্ডের পর আর এক রাউণ্ড, ঢঙ ঢঙ ঘণ্টাধ্বনি, ক্ষিপ্র প্রচণ্ড

লড়াই, লড়াই আর লড়াই, মারের বদলা মার, দড়ির ওপর আছড়ে পড়া ও প্রতিপক্ষকে আছড়ে ফেলা, আর ওস্তাদের শেষ মার দিতে শেষ রাউণ্ডে দর্শকদের কানফাটা চিৎকারের মধ্যে বারবার ছুটে যাওয়া, বারবার ঘুষির বন্যা বওয়ানো, বারবার মাথা নুইয়ে আঘাত বাঁচানো। কিন্তু এর জন্য তখন তার বিশ্বস্ত হৃৎপিণ্ড সবল ধমনী দিয়ে প্রতি মুহূর্তে তাজা রক্তের বন্যা বওয়াতো। সেই মুহূর্তে স্ফীত হয়ে উঠতো প্রতিটি ধমনী। আবার প্রয়োজন ফুরোলে আগের আকার ধারণ করতো। পুরোপুরি আগের আকার ফিরে পেত বলা ভুল, কারণ যত সামান্যই হোক, দৃষ্টিতে ধরা না পড়ুক, শিরাগুলো কিন্তু প্রতিবারই একটু একটু করে আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিরফোলা থেঁতলানো হাতের দিক চেয়ে টমের মনে পড়ে যায় তার তরুণ বয়সের সাফল্যের কথা। ওয়েল্‌শের আতঙ্ক নামে পরিচিত বেনি জোন্‌সের মাথায় ঘুঁষি চালিয়ে সেই প্রথম ওর আঙুলের গাঁট থেঁতলে গেছল।

খিদেটা আবার মাথা চাগাড় দেয়।

'ব্লিমি এক টুকরো মাংসের ব্যবস্থা করা যায় না?' হাতের বিরাট মুঠোটা পাকিয়ে বিড়বিড় করে উঠল টম। তারপর চাপা গলায় একটা অশালীন মন্তব্য করল।

'বার্ক আর সলির ওখানে দু'জায়গাতেই চেষ্টা করছি।' প্রায় ক্ষমাপ্রার্থীর মতো বলল ব্লিমি।

'দিল না?'

'আধ পেনিও না। বার্ক বলল—'ব্লিমির কথা আটকে যায়।

'থামলে কেন, বলো কি বলেছে?' প্রায় হুমকি দেয় টম।

'বলছিল স্যাণ্ডেলের সঙ্গে আজ রাত্তিরে তোমার লড়াইয়ের কথা জানে কিন্তু··তাছাড়া ইতিমধ্যেই অনেক বাকী পড়ে গেছে।'

টমের মুখ থেকে একটা বিরক্তিসূচক ধ্বনি ছাড়া আর কোন কথা শোনা যায়না। মনে পড়ে যায়, পোষা বুলটেরিয়ার কুকুরটাকে একদিন ও নাগাড়ে মাংস খাইয়েছে। বার্কও তখন

নিশ্চয় যত চায় তত ধার দিতে বিন্দুমাত্র গররাজী হত না। কিন্তু জমানা বদলে গেছে। টম কিঙের এখন বয়স হয়েছে, দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্লাব আয়োজিত মুষ্টিযুদ্ধের আসরে নেমে কোন প্রৌঢ় মুষ্টিযোদ্ধা কখনো দোকানীর কাছ থেকে বেশী ধার আশা করতে পারে না।

সকালবেলা ঘুম ভেঙে ওঠা অবধি একটু মাংস খাবার জন্যে মনটা উতলা হয়ে রয়েছে। আজকের লড়াইয়ের জন্যে উপযুক্ত ট্রেনিঙের সুযোগ পায়নি টম। অনাবৃষ্টির দরুন এ-বছর অস্ট্রেলিয়ায় যে কোন ধরনের একটা সাময়িক কাজ জোগাড় করাও শক্ত হয়ে পড়েছে। প্র্যাকটিশ করার মতো সহকারী অবধি নেই টমের। ভাল খাবার তো দূরের কথা, সব সময় পেট ভরা খাবারও জোটেনি। যখন যেমন সুযোগ পেয়েছে দু একদিন করে মাটি কাটার কাজ করেছে আর প্রতিদিন ভোরবেলা নিয়ম করে দৌড়েছে যাতে পায়ের জোর না হারায়। তবু দুটো নাবালক সন্তান ও স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করার পর একা একা সঙ্গী বিনা প্র্যাকটিশ করা এক দুরূহ কাজ। স্যাণ্ডেলের সঙ্গে লড়াইয়ের কথা ঘোষণা হবার পরেও দোকানীদের কাছে কোন বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়নি। শুধু 'গেইটি' ক্লাবের সেক্রেটারি তাকে তিন পাউণ্ড দিয়েছিলেন। লড়াইয়ে হারলেও এই তিন পাউণ্ড তার পাবার কথা। সেইজন্যেই তিন পাউণ্ডের বেশী ধার হিসেবে দিতে সেক্রেটারি রাজী হননি। পুরোনো বন্ধুদের কাছ থেকে মাঝেসাঝে দু'চার শিলিঙ চেয়ে চিন্তে এনেছে, এ বছর খরা না হলে তারা নিশ্চয় আরো বেশী দিতে পারতো। স্বীকার না করে উপায় নেই যে সত্যিই ওর ঠিক মতো ট্রেনিঙ হয়নি। আরো ভাল খাওয়া-দাওয়ার প্রয়োজন ছিল, সব দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া উচিত ছিল। তাছাড়া চল্লিশ বছর বয়সে একজনকে লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হতে হলে যে কষ্ট পোয়াতে হয়, বিশ বছরের তরুণকে নিশ্চয় তা হয় না।

'কটা বাজল লিজি?' টম জিগ্যেস করল।

লিজি উঠে গিয়ে পাশের বাড়ির লোকের কাছ থেকে সময় জেনে এল। 'আটটা বাজতে পনেরো।'

'আর দু'চার মিনিটের মধ্যেই প্রথম খেলাটা শুরু হবে। তবে ওটা শুধু যাচাই করে দেখার জন্যে। এরপর হবে ডিলার ওয়েল্‌শ্‌ আর গ্রিডলি'র চার রাউণ্ডের খেলা। তারপর স্টারলাইট আর একটা নাবিকের মধ্যে দশ রাউণ্ড। কাজেই ঘণ্টাখানেকের আগে আমার ডাক পড়বে না।'

আরো মিনিট দশেক মুখ বুজিয়ে কাটিয়ে দিয়ে টম উঠে দাঁড়াল।

'আসলে কি জানো লিজি, আমি একেবারেই প্র্যাকটিশের সুযোগ পাইনি।'

টুপিটা হাতে তুলে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ায় টম। লিজিকে চুমু খাবার কোন ইচ্ছে প্রকাশ পায় না। এটা টমের চিরকালের স্বভাব। বেরোবার মুখে কোনদিন চুমু খায় না। আজ লিজি কিন্তু দু' হাতে টমের গলা জড়িয়ে ধরে প্রায় জোর করে ওর মাথা নুইয়ে চুমু খেল। বিশাল চেহারার টমের পাশে লিজিকে যেন পুতুলের মতো দেখায়।

'গুড্‌ লাক্‌ টম্‌। জিততে হবেই কিন্তু—' লিজি বলল।

'হ্যাঁ, জিততে হবেই।' ফের একই কথা বলে টম। 'এটাই এখন একমাত্র কাজ—জেতা—জিততে হবেই।'

টম হেসে ওঠে। খুশী হবার ভাব দেখাতে চায়। লিজি ওকে আরো জড়িয়ে ধরে। লিজির কাঁধের ওপর দিয়ে তাকায় টম। আসবাব হীন ফাঁকা একটা ঘর। টমের নিজের বলতে আছে এই ঘরখানা, লিজি আর তার দুই সন্তান। তাও বাড়িভাড়া বাকী পড়ে আছে। সঙ্গিনী আর ছানাদের খাদ্য সংস্থানের জন্যে এই আস্তানা ছেড়ে নিশুতি রাতে অভিযানে বেরোতে হচ্ছে টমকে। বর্তমান যুগের কলকারখানার মজুররাও যন্ত্রের মধ্যে নিজেদের পেষাই করে খাদ্য সংস্থানের জন্যে। কিন্তু টমের পদ্ধতিটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেই প্রাচীন

আদিম রাজকীয় ভঙ্গিতে বন্য পশুর মতো লড়াই করে সংগ্রহ করছে ও খাদ্য।

'হারাতেই হবে—হারাতেই হবে—' টম মরিয়া হয়ে উঠেছে বোঝা যায়। 'জিততে পারলেই তিরিশ ডলার। সব ধার শোধ হয়েও কিছু থেকে যাবে। হারলে একটি কানাকড়ি পাবনা। ট্রামে চড়ার পয়সা অবধি না। হেঁটে ফিরতে হবে। চলি তাহলে—জিততে যদি পারি সিধে ফিরে আসব বাড়িতে।'

'আমি জেগে থাকবো—' টমের পেছন থেকে গলা চড়িয়ে বলল লিজি।

পুরো দু'মাইল হেঁটে গেইটিতে পৌছতে হবে। টমের মনে পড়ে যায়, একদিন সে নিউ সাউথ ওয়েল্‌শের হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ন ছিল। তখন ট্যাক্সি ছাড়া লড়াইয়ের আসরে যাবার কথা ভাবাই যেত না। তাছাড়া টম জিতবে বলে যারা জব্বর বাজি ধরতো তাদের মধ্যে কেউ না কেউ সঙ্গেই থাকতো। টমি বার্নস ছিল—ইয়াঙ্কি জ্যাক জনসন ছিল—ওরা নিজেদের গাড়ি নিয়ে আসতো। টম হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলে। সবাই জানে বক্সিঙের আগে দু' মাইল পথ হাঁটা কোন কাজের কথা নয়। টমের বয়স হয়ে গেছে আর বয়স্ক লোকদের ওপর পৃথিবী বড়ই বিরূপ। এখন মাটি কাটার কাজ ছাড়া ওর আর কিছুই মানায় না, কিন্তু সেখানেও ওর এই ভাঙা নাক আর স্ফীতকায় কানদুটো প্রতিবন্ধক। টম ভাবে কী কুক্ষণেই না সে কোন হাতের কাজ শেখেনি। শিখতো যদি শেষ পর্যন্ত কাজেই লাগতো। কিন্তু সে কথা কেউ তাকে বলেনি। অবশ্য বললেও সে উপদেশ কানে নিত না টম। সেদিন পুরো ছবিটাই ছিল রঙীন। সহজ লভ্য অর্থ—তীব্র গৌরবময় লড়াই—দু'ই লড়াই-য়ের মাঝে অফুরন্ত অবসর—উন্মাদ সমর্থকদের ভিড়—পিঠ চাপড়ানি—করমর্দন—পাঁচ মিনিট কথা বলার জন্যে ড্রিঙ্কের আমন্ত্রণ—লড়াইয়ের আসরের হর্ষধ্বনি—লড়াইয়ের অন্তিমে ঝড়ের মতো আঘাত-

বর্ষণ আর রেফ্রির ঘোষণা—'কিঙের জিত!' পরের দিন সকালে খবরের কাগজের খেলার পাতায় নাম।

সে সব দিনের কথাই ছিল আলাদা! এখন কিন্তু টম ধীরে ধীরে উপলব্ধি করছে যে সে শুধু পুরোনোদেরই সেদিন বাতিল করে দিয়েছে। উঠতি যৌবনহিসেবে প্রবীণদের তলায় টেনে নামিয়ে দিয়েছে। কাজেই অবাক হবার কিছু নেই যে কাজ হাসিল করতে তাকে কোন বেগ পেতে হয়নি। তাদের সকলেরই ছিল স্ফীতকায় হাতের শিরা, থেঁতলানো আঙুলের গাঁট আর আঘাতে আঘাতে জর্জরিত দেহ—বৃদ্ধ যোদ্ধা। রাশে কাটার্স্ বে'র লড়াইয়ে অষ্টাদশ রাউণ্ডে প্রবীণ স্টাউশার বিল্কে হারাবার কথা মনে পড়ে যায় টমের। লড়াইয়ের পর ড্রেসিঙ রুমে বসে শিশুর মতো কান্নায় ভেঙে পড়েছিল বিল। হয়তো বিলেরও বাড়ি ভাড়া বাকী পড়েছিল। হয়তো তারও বাড়িতে ছিল বৌ আর ছেলেমেয়ে। হয়তো সেদিন লড়াইয়ের আগে বিলও এক টুকরো মাংস খাবার জন্যে আকুল হয়েছিল। বিল সেদিন লড়াইয়ের আসরে নিদারুণ প্রহার খেয়েছিল। আজ টম বুঝতে পারছে যে কুড়ি বছর আগে সেই দিনটিতে বিল তার চেয়ে অনেক বেশী ঝুঁকি মাথায় নিয়ে লড়াইয়ের আসরে নেমেছিল। টমের মতো সে শুধু খ্যাতি আর সহজ লভ্য অর্থ কুড়োতে আসেনি। তাই হেরে যাবার পর বিলের কান্নাটাও খুবই স্বাভাবিক।

একটা মানুষের লড়াইয়ের ক্ষমতা সীমিত। এর কোন ব্যতিক্রম হবার উপায় নাই। কেউ একশোটা লড়াইয়ের পর ফুরিয়ে যায় আবার কেউ মাত্র কুড়িটার পরই শেষ। সবটাই নির্ভর করে মানুষটার দৈহিক গঠনের ওপর, তার পেশীর তন্ত্রীগুলোর উৎকর্ষের ওপর। নির্ধারিত সংখ্যক লড়াইয়ের পর তাই কারুর পক্ষেই আর কিছু করা সম্ভব নয়। বড় কঠোর এই প্রাকৃতিক বিধান। আর পাঁচ জনের চেয়ে টমের ক্ষমতা বেশীই ছিল বলতে হবে। সেই ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে লড়াইয়ের পর লড়াইয়ে। জান-প্রাণ উজাড় করে লড়াই—হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুস ফাটিয়ে—ধমনীকে স্ফীত

ক'রে। এইজন্যেই যৌবনের নমনীয় মাংসপেশীগুলো দড়ির মত গাঁট পাকিয়ে গেছে। স্নায়বিক দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। সহ্যশক্তি কমে এসেছে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ঝিমিয়ে পড়েছে দেহ মন। হ্যাঁ, আর পাঁচজনের তুলনায় টম অনেক বেশী সাফল্য অর্জন করেছে। তার পুরোনো মুষ্টিযোদ্ধা বন্ধুদের কেউই আর টিকে নেই। এক এক করে সবাই বিদায় নিয়েছে আর তাদের সেই বিদায়ের আয়োজনে টমও অনেক সময় বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে।

প্রবীণদের বিরুদ্ধে তাকে লড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল আর টমও এক এক করে সবাইকে অপসারিত করে গেছে। স্টাউশার বিলের মতো কেউ যখন ড্রেসিং রুমে বসে কান্নায় ভেঙে পড়েছে ও তখন হেসেছে। এখন টম নিজে প্রবীণদের দলভুক্ত। তার বিরুদ্ধে তাই লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে নবীনদের। আজকের এই স্যাণ্ডেল ছোকরাটা এসেছে নিউজিল্যাণ্ড থেকে। সেখানে নাকি নামও কিনেছে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় কেউ তার সম্বন্ধে কিছু জানে না বলেই টমের সঙ্গে এই বক্সিঙের আয়োজন। স্যাণ্ডেল যদি আজ তাগদ দেখাতে পারে তাহলে আরো নামকরা যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়ার, আরো বেশী অর্থ উপার্জন করার সুযোগ পাবে। কাজেই স্যাণ্ডেল আজ জেতবার জন্যে চেষ্টার কসুর করবে না। অর্থ, খ্যাতি ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ হাতছানি দিচ্ছে স্যাণ্ডেলকে। সৌভাগ্য আর স্যাণ্ডেলের মাঝে বাধা বলতে এখন শুধু আছে পুরোনো ঘাঘু টম কিঙ। যে টমের পাওনা খুব বেশী হলে তিরিশটা মাত্র ডলার। বাড়িওলা আর দোকানীর ধার শোধ করতেই যা খরচ হয়ে যাবে। ভাবতে ভাবতেই এক সময় টমের চোখের সামনে তারুণ্য যেন রক্ত মাংসের রূপ ধারণ করে। তারুণ্য —মহান তারুণ্য—অজেয় আর উৎফুল্ল—উজ্জীবিত পেশী ও গায়ের রেশম কোমল চামড়া—অক্লান্ত অবিদীর্ণ হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুস। যে তারুণ্য শক্তি ও সামর্থ্যের অভাব দেখলেই ফেটে পড়ে হাসিতে। তারুণ্যই বিধ্বংসের দেবতা। পুরোনোকে সে ধ্বংস করে আর তারসঙ্গেই নিজেকেও তিল তিল করে খুইয়ে ফ্যালে। ক্রমশ তারও

ধমনী আকারে বৃদ্ধি পায়, আঙুলের গাঁটগুলো যায় থেঁতলে এবং একদিন সেও পড়ে যায় পুরোনো বাতিলদের দলে। কারণ তরুণ যা তা চির তরুণই থাকে, শুধু যুগটাই যা পাল্টে যায়।

ক্যাসেলরিগ স্ট্রীটে পা দিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিল টম। তিনটি বাড়ির পরেই গেইটি। এক দঙ্গল ছোকরা প্রবেশ পথের মুখেই ভিড় জমিয়ে ছিল। ওকে দেখে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল। টম শুনতে পেল ওরা বলাবলি করছে, টম কিঙ! এই তো টম কিঙ!

ড্রেসিংরুমে ঢোকবার আগেই ক্লাবের সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা। যুবকটির চোখে মুখে ধূর্ততার ছাপ। করমর্দন করে বলল, 'কেমন লাগছে বলুন?'

'চমৎকার! পুরোপুরি ফিট্।' টম জেনেশুনে ডাহা মিথ্যে কথাটা বলল। পয়সা থাকলে এখুনি ও একটু মাংস খাবার ব্যবস্থা করত।

ড্রেসিংরুম ছেড়ে বারান্দা পেরিয়ে হলঘরের মাঝে চৌকো রিঙের কাছে এসে দাঁড়াতেই অপেক্ষারত জনতা হর্ষধ্বনি করে আপ্যায়ন জানাল। একবার ডান দিকে আর একবার বাঁ দিকে ফিরে টমও অভিবাদনে সাড়া দিল। বলতে গেলে সবই অচেনা মুখ। বেশীর ভাগই কিশোর। টম যখন প্রথম নাম করেছে তখন এদের অনেকেই বোধহয় জন্মায়ওনি। উঁচু মঞ্চটার ওপর এক লাফে উঠে এল টম। ঘাড় নুইয়ে দড়ির তলা দিয়ে ঢুকে এক কোণে নিজের জায়গায় চলে এল। ফোল্ডিং টুলের ওপর বসল। রেফ্রি জ্যাক বল্ এগিয়ে এসে করমর্দন করল। বল্‌ও এককালের পেশাদার বক্সার। অবশ্য দশ বছর আগেই সে লড়াই ছেড়ে দিয়েছে। বল্‌কে রেফ্রি দেখে কিঙ খুশি হয়। পুরোনো দিনের লোক বল্। স্যাণ্ডেলকে একটু বেআইনি ভাবে মারধোর করলেও বল্ সেদিকে নজর দেবে না।

এক এক করে ভাবী হেভিওয়েট বক্সাররা রিঙে উঠছে আর রেফ্রি তাদের পরিচয় পেশ করছে। তাছাড়া তারা প্রত্যেকেই বাজি ধরছে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে।

বল্ ঘোষণা করল, 'নর্থ সিড্‌নির বক্সার প্রণ্টো আজকের লড়াইয়ের বিজয়ীকে পঞ্চাশ পাউণ্ড বাজি ধরে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।'

স্যাণ্ডেল রিঙের মধ্যে লাফিয়ে উঠতেই দর্শকরা বারবার হাত-তালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল। নিজের জায়গায় গিয়ে বসল স্যাণ্ডেল। রিঙের বিপরীত কোণ থেকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল টম। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা দু'জনে নির্দয় সংগ্রামে জড়িয়ে পড়বে। বিপক্ষকে আঘাতে আঘাতে অচৈতন্য আর ধরাশায়ী করার জন্যে তারা প্রত্যেকেই তাদের দেহের শেষ বিন্দু শক্তিকেও উজাড় করে দেবে। কিন্তু স্যাণ্ডেলও টমের মতো রিঙ কস্টিউমের ওপর শোয়েটার আর ট্রাউজার চড়িয়ে রেখেছে তাই দেখে বিশেষ কিছু বোঝবার উপায় নেই। সুদর্শন মুখশ্রী—মাথা ভর্তি কোঁকড়া ঘন হলদে রঙা চুল। সুপুষ্ট পেশীবহুল ঘাড়টাই তার শক্তিমত্তার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

তরুণ প্রণ্টো রিঙের দু' প্রান্তে গিয়ে স্যাণ্ডেল আর টমের সঙ্গে করমর্দন সেরে নেমে গেল। একের পর এক তরুণ মুষ্টিযোদ্ধারা উঠে আসছে আর তাদের লড়াইয়ের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। এই মুখগুলো সবারই অপরিচিত কিন্তু যৌবনের অতৃপ্ত আকাঙ্খায় তারা সরব—দুনিয়ার মানুষের সামনে তাদের বলিষ্ঠ উচ্চারণ—শক্তি আর নিপুণতার জোরে তারা আজকের বিজয়ী যোদ্ধাকে আগামী দিনে পরাস্ত করবেই করবে। আগে হলে টম কিঙ মজা পেত, হয়তো বিরক্তিও বোধ করত। লড়াইয়ের আগে এইসব অনুষ্ঠান দেখে এখন কিন্তু আগ্রহই বোধ করছে সে। অজেয় যৌবনকে প্রত্যক্ষ করছে। যৌবন চিরকালই ঠিক এইভাবে দড়ি গলে লাফিয়ে উঠেছে রিঙের ভেতর, উপেক্ষাভরে ছুঁড়ে দিয়েছে উদ্ধত চ্যালেঞ্জ আর বার্ধক্যও চিরকাল নত মস্তকে স্বীকার করে নিয়েছে হার। বৃদ্ধ যোদ্ধাদের মাড়িয়ে সাফল্যের পথে এগিয়ে যায় তরুণরা। অতৃপ্ত অপ্রতিরোধ্য তরুণের স্রোত বৃদ্ধদের দেয় ভাসিয়ে। তারপর একদিনের তরুণরাও বৃদ্ধ হয়, তারাও আবার সেই একই পতনের পথের পথিক হয়। চিরজয়ী শাশ্বত তারুণ্য।

প্রেসবক্সের দিকে তাকিয়ে টম কিঙ 'স্পোর্টসম্যান্' কাগজের মরগ্যান, আর 'রেফ্রি' কাগজের কর্বেটকে দেখতে পেয়ে ঘাড় নাড়ল। টম এবার দু' হাত উঁচু করে ধরতেই তার সহকারী সিড সুলিভান ও চার্লি বেট্‌স্ গ্লাভস পরিয়ে দিয়ে শক্ত করে ফিতে বেঁধে দিল। স্যাণ্ডেলের একজন সহকারী কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পরখ করছিল টমের আঙুলের গাঁটের ওপরকার ছোট ছোট ব্যাণ্ডেজগুলো। ওদিকে টমের একজন সহকারী স্যাণ্ডেলের কাছে দাঁড়িয়ে একইভাবে নজর রাখছে। স্যাণ্ডেলের প্যাণ্টটা টেনে খুলে নিতেই সে উঠে দাঁড়াল। এবার শোয়েটারটা টেনে তুলে নেওয়া হল মাথা গলিয়ে। টম ছাখে তারুণ্য মানুষের রূপ ধরে তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সুস্থ সবল দেহের গায়ের চামড়ার নীচে মাংসপেশীগুলো জীবন্ত প্রাণীর মতো খেলা করছে। সারা শরীর জুড়ে শুধু চঞ্চল প্রাণের স্বাক্ষর। টম জানে ওর এই সতেজ প্রাণের নির্যাসের একবিন্দুও এখনো অসংখ্য আঘাত জনিত ক্ষত মুখ দিয়ে ঝরে পড়েনি। লড়াইয়ের পর লড়াইয়ে তার তারুণ্য এখনো খেসারত দিতে শুরু করেনি।

ওরা দু'জন এবার এগিয়ে আসে মঞ্চের মাঝখানে। ঘণ্টা পড়তেই সহকারীরা ভাঁজ করা চেয়ার দুটো তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। স্যাণ্ডেল আর টম করমর্দন সারা-মাত্র ওদের দেহদুটো যোদ্ধার ভঙ্গি গ্রহণ করল। সূক্ষ্ম কেশের বাঁধন ছিঁড়ে ইস্পাত আর স্প্রিঙে গড়া যন্ত্রের মতো ছটফট করে উঠল স্যাণ্ডেল। একবার এগিয়ে, একবার পিছিয়ে বাঁ হাতের ঘুষি মারল চোখে, ডান হাতের ঘুষি পাঁজরে, তারপর প্রত্যাঘাত এড়িয়ে লঘু পায়ে নেচে পিছিয়ে এসেও ফের এগিয়ে এল হিংস্র হয়ে। স্যাণ্ডেল অত্যন্ত তৎপর আর চতুর। চোখ ধাঁধানো প্রদর্শনী। দর্শকরা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। টমের কিন্তু ঠাণ্ডা মাথা। অভিজ্ঞ যোদ্ধা টম এমন ছেলে ছোকরাদের সঙ্গে কতবার যে লড়েছে তার ইয়ত্তা নেই। স্যাণ্ডেলের ঘুষিগুলোর সঠিক মূল্য তার জানা। এই ত্বরিত আক্রমণ মারাত্মক নয়। জানা

কথা স্যাণ্ডেল প্রথম থেকেই ছুটো পাটি করবে। এটা যৌবনের ধর্ম। বিদ্রোহে উন্মাদ। অফুরন্ত ক্ষমতা আর আকাঙ্খা নিয়ে সে যৌবনের দর্পে ফেটে পড়ে। ক্রুদ্ধ আক্রমণে বিপর্যস্ত করে দেয় প্রতিপক্ষকে।

স্যাণ্ডেল একবার এগোচ্ছে একবার পেছোচ্ছে। একবার এখানে একবার ওখানে। উদ্দীপনা যেন চঞ্চল পায়ে চষে ফেলছে সারা মঞ্চটা। সাদা চামড়া আর মাংসপেশীর আশ্চর্য মহিমা! দেহটা যেন মাকুর মতো উঠছে লাফাচ্ছে পিছলে বেরিয়ে আসছে আর রচনা করছে আক্রমণের এক চোখ ধাঁধানো জাল। আক্রমণের পর আক্রমণ—হাজারো আক্রমণ, কিন্তু লক্ষ্য একটাই। টম কিঙকে ধ্বংস করা। টম কিঙ যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্যাণ্ডেল আর তার সাফল্যের মাঝখানে। টম অত্যন্ত সহিষ্ণুভাবে সহ্য করে যায় আঘাতগুলো। সে তার করণীয় সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। টম যৌবন পার করে এসেছে তাই যৌবনকে চিনতে আর তার বাকী নেই। যতক্ষণ না স্যাণ্ডেলের খানিকটা দম বেরোচ্ছে কিছু করবার নেই। টম ইচ্ছে করে মাথা নুইয়ে একটা ঘুষি খেল মাথায়। দাঁতে দাঁত টিপে হাসে টম। শয়তানি করেছে ঠিকই কিন্তু খেলার নিয়ম ভেঙে করেনি। নিজের হাতের আঙুলের গাঁট বাঁচাবার দায়িত্ব প্রত্যেকের নিজের। তারপরেও কেউ যদি কারুর মাথার ওপর ঘুষি কষাতে চায়, নিজের ক্ষতি করে—কেউ বাধা দেবে না। টম ইচ্ছে করলে মাথাটা আরেকটু নীচু করতে পারতো, তাহলেই ঘুষিটা ফস্কে যেত। টম তা করেনি কারণ তার মনে পড়ে গেছল প্রথম জীবনের লড়াইয়ের কথা। মনে পড়ে গেছল 'ওয়েল্‌শের আতঙ্ক'-এর মাথায় সেই প্রথম আঙুলের গাঁট থেঁতলে যাবার কথা। মাথাটা পুরোপুরি নীচু না করার জন্যে স্যাণ্ডেলেরও আঙুলের একটা গাঁট খতম হয়ে গেছে। অবশ্য এই নিয়ে স্যাণ্ডেল এখন মাথাও ঘামাবে না। কোন ভ্রুক্ষেপ না করেই সে এমনি বীরদর্পে আঘাতের পর আঘাত হেনে যাবে লড়াইয়ের শেষ মুহূর্ত অবধি। কিন্তু একদিন আসবেই যখন একের পর এক লড়াইয়ে নামার ফল ফলতে

শুরু করবে। থেঁতলানো গাঁটগুলোর দিকে তাকিয়ে তখন অনুশোচনা হবে। মনে পড়ে যাবে টম কিঙের মাথায় ঘুষি মেরে প্রথম আঘাত পাবার কথা।

প্রথম রাউণ্ডের পুরো সাফল্যটুকু একা কেড়ে নেয় স্যাণ্ডেল। ঘূর্ণিঝড়ের মতো তার ক্ষিপ্র আক্রমণ উল্লসিত করে প্রতিটি দর্শককে। ঘুষির বন্যায় টমকে দিশাহারা করে দেয়। টম কিছুই করছে না। একবারো পাল্টা ঘুষি চালায়নি। শুধু আঘাত বাঁচাতে নিজেকে আড়াল করেছে, বাধা দিয়েছে, মাথা নামিয়ে নিয়েছে। সরাসরি আঘাত পেয়ে কখনো আবার ভাণ করেছে যেন মাথা ঘুরে গেছে। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে শ্লথ ভঙ্গিতে সরে এসেছে। একবারো লাফায়নি বা ঝাঁপিয়ে পড়েনি। শরীরের এক বিন্দু শক্তিও অপচয় করেনি। স্যাণ্ডেলের ফেনিল যৌবন সম্পূর্ণভাবে উপচে না পড়া পর্যন্ত বিচক্ষণ প্রবীণ প্রতিশোধ নিতে সাহস পাবে না। টমের প্রতিটি গতিবিধি মন্থর হলেও সুসংবদ্ধ সুশৃঙ্খল। ওর ক্লান্ত অলস চোখের দৃষ্টি ভ্রম সৃষ্টি করে—মনে হয় ও বুঝি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। আসলে কিন্তু কিছুই ওর দৃষ্টি এড়াচ্ছে না। কুড়ি বছরেরও বেশী দড়ি ঘেরা মঞ্চের ভেতর কাটানোর সুবাদে তার চোখের নজর তৈরি হয়ে গেছে। আসন্ন আঘাতের আশঙ্কায় চোখের পাতা কাঁপেনা বা পড়েনা। শীতল চোখ দুটো শুধু চেয়ে থাকে আর দূরত্বের মাপ নেয়।

প্রথম রাউণ্ডের পর রিঙের কোণে বসে নির্ধারিত এক মিনিটকাল বিশ্রাম উপভোগ করছিল টম। পা দুটো ছড়িয়ে দিয়েছে—হাত-দুটোর ভর রেখেছে পিছনের দড়ির ওপর। সহকারীরা তোয়ালে নেড়ে বাতাস করছে আর বুক ভরে শ্বাস নিচ্ছে টম। পেট আর বুক ঘনঘন ওঠানামা করছে। চোখ বন্ধ করে রেখেছে টম। কানে আসছে দর্শকদের নানা প্রশ্ন, 'লড়ছো না যে টম?'—'তুমি কি ওকে ভয় পাচ্ছ নাকি?'

'সব পেশী আড়ষ্ট হয়ে গেছে।' সামনের সিট্ থেকে একজনকে

মন্তব্য করতে শুনল। 'এরচেয়ে তাড়াতাড়ি নড়তে পারে না। স্যাণ্ডেলের ওপর নগদ বাজি ধরছি—টু টু ওয়ান।'

ঘণ্টা পড়তেই দু'জনে নিজেদের জায়গা ছেড়ে সামনে এগিয়ে এল। টম যত না এগোয় স্যাণ্ডেল তার তিনগুণ। স্বভাবতই স্যাণ্ডেল ব্যগ্র। টম কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট। এটা তার হিসেবী মনোবৃত্তির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। টমের ট্রেনিঙ জোটেনি, ভাল করে খাওয়াও হয়নি, কাজেই প্রতিটি পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া পাক্কা দু' মাইল হেঁটে এসেছে। ঠিক প্রথম রাউণ্ডের পুনরাবৃত্তি ঘটছে এবারেও। ঘূর্ণিঝড়ের মতো স্যাণ্ডেলের আক্রমণ আর নিষ্ক্রিয় টম কিঙ। ক্ষুব্ধ দর্শকরা বারবার জানতে চাইছে টম কেন লড়ছে না। টম শুধুই ভাণ করছে। যাও বা দু' একটা ঘুষি মেরেছে তার পিছনে না ছিল গতি না কোন শক্তি। নিজেকে আড়াল করা আর সরিয়ে নেওয়া ছাড়া কিছুই করেনি। স্যাণ্ডেল চাইছে লড়াইয়ের মধ্যে ক্ষিপ্রতা আনতে, কিন্তু অভিজ্ঞতার জোরে টম তাকে সে সুযোগ দিচ্ছে না একেবারে। ব্যথাভরা অদ্ভুত এক ধরনের চাপা হাসির আভাস ফুটে উঠেছে টমের আঘাত জর্জরিত ভাঙাচোরা মুখটায়। এমন ব্যাকুলভাবে নিজের ক্ষমতাকে কয়েদ করে রাখার সামর্থ্য শুধু বয়সের সঙ্গেই আসে। স্যাণ্ডেল মানেই যৌবন আর যৌবন নিজের শক্তি সামর্থ্যকে এমনি অবহেলা ভরেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়। রিঙের অধিনায়ক কিন্তু টম। একের পর এক তিক্ত সুদীর্ঘ যুদ্ধে অংশ-গ্রহণের সুবাদে সে অর্জন করেছে তার বিচক্ষণতা। স্থির দৃষ্টিতে ঠাণ্ডা মাথায় নজর রাখছে টম। মন্থর পদক্ষেপ। স্যাণ্ডেলের সফেন যৌবন উপছে না পড়া পর্যন্ত সে অপেক্ষাই করবে। অধিকাংশ দর্শকই ভাবে যে স্যাণ্ডেলের সঙ্গে টমের কোন তুলনাই চলতে পারে না। বাজির হার বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় তিনে এক। এরই মধ্যে কিন্তু কিছু বিজ্ঞ লোকও আছে। এরা আগে টমের লড়াই দেখেছে। তারা টমের ওপরেই বাজি ধরে নিশ্চিন্ত মনে।

যথারীতি তৃতীয় রাউণ্ডের শুরু থেকেই স্যাণ্ডেলের একতরফা

আক্রমণ শুরু হয়। তিরিশ সেকেণ্ড পেরোবার পর স্যাণ্ডেলেরই অসাবধানতায় একটা সুযোগ পেয়ে যায় টম। তার চোখ ঝলসে ওঠে আর তারই সঙ্গে তড়িৎ-গতিতে এগিয়ে আসে ডান হাত। এই তার প্রথম মার্—পেঁচানো ডান বাহুর কঠিনতা আর আধ ঘুরন্ত দেহের পুরো ভার সমেত হুক্ করেছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন একটা সিংহ যেন আচমকা বাজ পড়ার মতো থাবা বসিয়ে দিয়েছে। আঘাতটা চোয়ালের ধারে লাগা মাত্র গলা কাটা গরুর মতো লুটিয়ে পড়ল স্যাণ্ডেল। দর্শকরা রুদ্ধশ্বাসে সভয়ে বাহবা জানাল। লোকটা তাহলে একেবারে অচল নয়, ঘুষিটা যা ঝেড়েছে কামার-শালের হাতুড়ির মতো।

স্যাণ্ডেল হতভম্ব হয়ে গেছে। মেঝের ওপর এক পাক গড়িয়ে উঠে বসতে যায় কিন্তু তার সহকারীরা চিৎকার করে বারণ করে দেয় উঠতে। রেফরির সময় গণনা শেষ না হওয়া অবধি বিশ্রাম নেবার জন্যে উপদেশ দেয়। একটা হাঁটু মুড়ে তার ওপর দেহের ভার রেখে বসে স্যাণ্ডেল, যাতে যে কোন মুহূর্তে উঠে দাঁড়াতে পারে। রেফরি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে এক দুই তিন করে জোরে জোরে গুনে চলে প্রতিটি সেকেণ্ড। নয় গোনা হতেই যোদ্ধার ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল স্যাণ্ডেল। টমের আপসোসের অন্ত নেই। ঘুষিটা যদি আর এক ইঞ্চি ওপাশে চোয়ালের ঠিক ভাঁজটায় পড়তো, পুরো নক্-আউট হয়ে যেত স্যাণ্ডেল। তিরিশটা ডলার পকেটে পুরে সোজা বাড়ি ফিরে যেতে পারতো। বৌ আর বাচ্চারা ওরই পথ চেয়ে বসে আছে।

পুরো তিন মিনিট পার করে রাউণ্ড শেষ হবে। স্যাণ্ডেল এবার তার প্রতিপক্ষকে সমীহের চোখে দেখতে শুরু করেছে। টমের কিন্তু সেই আগের মতোই মন্থর গতি, ঘুম-জড়ানো দৃষ্টি। রিঙের পিছনে সহকারীদের অপেক্ষা করতে দেখেই টম বুঝতে পারে রাউণ্ড শেষ হবার সময় হয়ে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে যায় সে। লড়াই-টাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে শুরু করে যাতে ক্রমশ সে তার

নিজের দিকের কোণটার কাছে এগিয়ে আসতে পারে। ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই টম তার টুলটার ওপর বসে পড়ে। স্যাণ্ডেলকে কিন্তু কোনাকুনি ভাবে হেঁটে পুরো মঞ্চটা পার হয়ে নিজের জায়গায় পৌঁছতে হয়। ব্যাপারটা সামান্য কিন্তু এই রকম অনেকগুলো সামান্য ব্যাপার যখন একসঙ্গে দানা বাঁধে তখন আর তা সামান্য থাকে না। ওই ক'পা বেশী হাঁটতে বাধ্য হয়েছে স্যাণ্ডেল, ওইটুকু শক্তি বেশী খরচ করেছে, বিশ্রামের অত্যন্ত মহার্ঘ এক মিনিট সময়ের থেকেও কয়েক সেকেণ্ড খোয়া গেছে। প্রতি রাউণ্ডের সূচনায় টম অত্যন্ত মন্থর ভাবে অগ্রসর হয়েছে আর স্যাণ্ডেলকে বেশী করে হাঁটিয়েছে। আবার প্রতিটি রাউণ্ডের সমাপ্তির সময় দেখা গেছে চতুর টম ঠিক স্বস্থানে ফিরে এসেছে। ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়েছে নিজের টুলে।

আরো দু রাউণ্ড খেলা হয়ে গেছে। টম তার শক্তি ব্যয়ে যতটা কৃপণ, স্যাণ্ডেল ঠিক ততটাই বেহিসেবী। স্যাণ্ডেল খেলার গতি বাড়াবার জন্যে সচেষ্ট হলে টম অস্বস্তিতে পড়ে। স্যাণ্ডেলের অসংখ্য আঘাতের মধ্যে বেশ কিছু লক্ষ্যভেদ করেছে। তবু টম তার শ্লথভঙ্গি ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক। মাথাগরম ছোকরারা ওদিকে চেঁচিয়ে আসর মাত্ করছে—টমকে লড়তে বলছে। ষষ্ঠ রাউণ্ডে স্যাণ্ডেল আবার অসতর্ক হতেই টমের ডান হাতের ভয়াবহ ঘুষি এসে পড়ে তার চোয়ালে। আবার রেফরি নয় গোনা অবধি পড়ে থাকে সে। সপ্তম রাউণ্ডেই স্যাণ্ডেলের অতি উৎসাহ ঝিমিয়ে আসে। বুঝতে পারে এটা তার জীবনের কঠিনতম লড়াই। টম কিণ্ড বুড়ো হতে পারে কিন্তু এ অবধি সে টমের মতে যোদ্ধার সম্মুখীন হয়নি। বুড়ো টম কক্ষনো মাথা গরম করেনা, তার আত্মরক্ষার কৌশল নিখুঁত, তার ঘুষির আঘাত যেন মুগুরের ঘা। তাছাড়া তার ডান্ বাঁ দু' হাতেই নক্-আউট। তা হলেও টম কিন্তু বারবার আঘাত হানতে সাহস পায় না। আঙুলের ভাঙা গাঁটগুলোর কথা সে ভোলেনি। শেষ পর্যন্ত লড়তে হলে খুব বুঝে সুঝে প্রতিটি আঘাত হানা প্রয়োজন। টুলে

বসে ওপ্রান্তে স্যাণ্ডেলের দিকে তাকিয়ে টমের মনে হল ওর অভিজ্ঞতার সঙ্গে স্যাণ্ডেলের যৌবনকে যদি যুক্ত করা যেত, সেটা নিশ্চিত ভাবে বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ানের জন্ম দিত। কিন্তু মুস্কিল এই যে স্যাণ্ডেল কোনদিনই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হবে না। তার সে বিচক্ষণতা নেই। একমাত্র তার যৌবনকে বিকিয়েই সে তার অভিপ্রায় পূর্ণ করতে পারে। তারপর একদিন সে বিচক্ষণতা অর্জন করবে ঠিকই, কিন্তু ততদিনে তার যৌবন ফুরিয়ে যাবে।

যতরকম ভাবে সম্ভব টম সুযোগ নিতে কসুর করে না। সুবিধে পেলেই সে আঁকড়ে ধরছে বিপক্ষকে। আর আঁকড়ে ধরার মুহূর্তে বলতে গেলে প্রতিবারই তার কাঁধটা স্যাণ্ডেলের পাঁজরে আঘাত করছে। মুষ্টিযুদ্ধের হিসেবে ঘুষির মতোই কার্যকর কাঁধটা। তাছাড়া এতে শক্তির অপচয়ও হয় অপেক্ষাকৃত কম। একবার পাকড়ে ধরতে পারলে টম তার পুরো দেহের ওজনটা ছেড়ে দেয় বিপক্ষের ওপর। দু'জনকে ছাড়িয়ে দেবার জন্যে তখন রেফরীর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। টম যখনই কাঁধ দিয়ে স্যাণ্ডেলের পাঁজরে গোঁত্তা মেরে ওকে জাপটে ধরে, ওর মাথাটা থাকে স্যাণ্ডেলের বাঁ হাতের তলায়। স্যাণ্ডেল এই রকম সময় তার পিঠের দিক দিয়ে ডান হাত চালিয়ে টমের মুখে আঘাত করে। স্যাণ্ডেলের এই মারের চাতুর্য দর্শকদের সহর্ষ তারিফ পায় কিন্তু তেমন কোন ক্ষতি করতে পারে না। শক্তির অহেতুক অপচয়। স্যাণ্ডেলের কিন্তু ক্লান্তি নেই, কোন বিকার নেই। টম মুচকি মুচকি হাসে আর সহ্য করে যায় মারগুলো।

স্যাণ্ডেল এবার ডান হাতে পরপর ক'বার জোরাল ঘুষি চালায়। দেখে মনে হয় টম দারুণ মার খাচ্ছে। প্রাচীন মুষ্টিযোদ্ধারা কিন্তু তারিফ দেয় টমকেই। স্যাণ্ডেল যেই ঘুষি চালাতে যাচ্ছে টমের বাঁ হাতের গ্লাভ্‌স্‌টা নিপুণ ভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে স্যাণ্ডেলের ডান হাতের গুলি। ঘুষিগুলো টমের গায়ে এসে লাগছে ঠিকই কিন্তু তার শক্তি হরণ করে নিচ্ছে টমের ওই সামান্য স্পর্শটুকু। নবম রাউণ্ডের শুরুতে এক

মিনিটের মধ্যে টমের ধনুকাকার ডানহাতের আঘাতে পরপর তিনবার স্যাণ্ডেলের অত ভারী দেহখানা লুটিয়ে পড়ল। প্রতিবারই নয় গোনা অবধি পুরো সময়টার সদ্ব্যবহার করে তারপর স্যাণ্ডেল উঠে দাঁড়িয়েছে। আঘাতে আঘাতে বিহ্বল দ্বিধাগ্রস্ত। কিন্তু ক্ষমতা হারায়নি। স্যাণ্ডেলের আর সেই ক্ষিপ্রতা নেই, আগের মতো আর বেহিসেবী শক্তিক্ষয়ও করছেনা। দাঁতে দাঁত টিপে লড়ে যাচ্ছে। তার প্রধান সম্পদ যৌবনের ভাঁড়ার থেকে যথেচ্ছ ঋণ গ্রহণ করে চলেছে। টমের প্রধান সম্পদ কিন্তু অভিজ্ঞতা। তেজ আর প্রাণশক্তিতে ভাঁটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুদীর্ঘ যোদ্ধা জীবনের অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে ঘাটতিটুকু পূরণ করে নিয়েছে চাতুর্য। নিজের দৈহিক শক্তির অপব্যয় রোধ করার জন্য একটিও বাড়তি অঙ্গসঞ্চালন তো নয়ই উপরন্তু প্রতিপক্ষকে সেই একই ভুল করতে বাধ্য করার কৌশল জানে টম। হাত পা আর দেহের ছলনাময় ভঙ্গিতে বারবার সে প্রলুব্ধ করছে স্যাণ্ডেলকে। অহেতুক স্যাণ্ডেল লাফিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে, ঘাড় নোয়াচ্ছে বা আক্রান্ত হবার ভয়ে প্রতিরোধমূলক ভঙ্গি গ্রহণ করছে। টম ঠিক সুযোগ করে অবসর নিচ্ছে লড়াইয়ের ফাঁকে ফাঁকে, কিন্তু স্যাণ্ডেলকে এক মুহূর্ত নিশ্চেষ্ট থাকতে দিচ্ছেনা। এটা পরিণত বয়সের নীতি।

দশম রাউণ্ডের শুরুতেই টম বিপক্ষের আক্রমণ রোধ করতে সোজা স্যাণ্ডেলের মুখের উপর বাঁ হাতের ঘুষি ঝেড়ে গেল পরপর কবার। স্যাণ্ডেল শেষপর্যন্ত পাল্টা কৌশল হিসেবে টমের বাঁ হাতের ঘুষিগুলো মাথা নুইয়ে এড়িয়ে গিয়ে ডান হাতের হুক্ ঝাড়তে শুরু করল টমের মাথায়। আঘাতগুলো ঠিক জায়গা মতো না লাগায় কার্যকর হয়নি। কিন্তু প্রথম আঘাতটা লাগার পর অচেতনতার সেই সুপরিচিত কালো পর্দাটা নেমে এসেছিল টমের দু'চোখে, সেই মুহূর্তটিতে বা সেই মুহূর্তের এক ভগ্নাংশখানেক সময় টম হারিয়ে গেছল। আঘাত পাবার আগের মুহূর্তেও দেখেছিল স্যাণ্ডেল তার মার এড়াতে দৃষ্টিপথ থেকে সরে যাচ্ছে—দেখেছিল অগণিত দর্শকের মুখগুলো

ফেকাসে হয়ে যাচ্ছে। তারপরই অন্ধকার। আবার দৃষ্টি ফিরে পেতেই সেই দর্শকদের মুখ আর স্যাণ্ডেলকে দেখতে পেল টম। এতক্ষণ ঘুমোবার পর এই যেন চোখ খুলল। তবে সংজ্ঞাহীন মুহূর্তটি তিলমাত্র স্থায়ী হয়েছিল বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়বারও সময় পায়নি টম। দর্শকরা দ্যাখে টম টলমল করছে, হাঁটুর জোর হারিয়ে ফেলেছে। পরক্ষণেই অবশ্য বাঁ কাঁধের আশ্রয়ে থুতনি গুঁজে নিজেকে সামলে নেয় টম।

পর পর ক'বার একই পদ্ধতিতে আক্রমণ চালিয়ে যায় স্যাণ্ডেল। টম শেষ পর্যন্ত বিহ্বলতা কাটিয়ে আত্মরক্ষার এবং পাল্টা আক্রমণের উপায় বার করে। বাঁ হাতে ঘুষি মারবার ভণিতা করে আধ পা পিছনে সরে এসে সম্পূর্ণ শরীরের ওজনটুকু কাজে লাগায় ডান হাতের আপারকাট্ মারে। সময়ের নির্ভুল বিচারে আঘাতটা সোজা গিয়ে পড়ে স্যাণ্ডেলের মুখের ওপর। আঘাতের প্রচণ্ডতা স্যাণ্ডেলকে শূন্যে তুলে আছড়ে ফ্যালে। তার মাথা আর কাঁধে চোট্ লাগে। পরপর দু'বার স্যাণ্ডেলকে একই ভাবে ধরাশায়ী করে তারপর দড়ির ওপর ফেলে ঘুষির বন্যা বওয়ায়। স্যাণ্ডেলকে এক মুহূর্ত অবসর দেয় না সামলে ওঠার—মুহুর্মুহু আঘাতে জর্জরিত করে দেয়। উত্তেজনায় সীট ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রতিটি দর্শক। অবিরাম হর্ষধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ চঞ্চল। কিন্তু অসামান্য শক্তি আর সহ্যক্ষমতা স্যাণ্ডেলের। এখনো পায়ের ওপর ভর রেখে দাঁড়িয়ে আছে। স্যাণ্ডেলের নক-আউট হওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে এই বীভৎস অত্যাচারের হাত থেকে তাকে বাঁচাতে পুলিশের এক ক্যাপ্টেন রিঙের ধারে উঠে আসে লড়াই থামিয়ে দেবার জন্যে। ঠিক এমনি সময় ঘণ্টাধ্বনি রাউণ্ডের সমাপ্তি ঘোষণা করে। টলমল করে নিজের জায়গায় ফিরে আসে স্যাণ্ডেল। পুলিশের ক্যাপ্টেনের কাছে প্রতিবাদ জানায় লড়াই বন্ধ করার চেষ্টা করছে বলে। লড়বার শক্তি আর সামর্থ্য দুটোই তার অটুট আছে। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে সে দু'বার লাফিয়ে উঠে সরে আসে পিছনে। পুলিশের ক্যাপ্টেন আর হস্তক্ষেপ না করে ফিরে যায়।

পিঠে ঠেস দিয়ে টুলের ওপর হতাশ ভাবে বসে আছে দমছুট টম। লড়াইটা বন্ধ হয়ে গেলে রেফ্রি বাধ্য হত টমকে জয়ী ঘোষণা করতে—করকরে ডলারগুলো চলে আসত পকেটে। টম তো আর স্যাণ্ডেলের মতো যশ এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যে লড়ছে না, ওর লড়াই শুধু তিরিশটা ডলারের জন্যে। আবার এক মিনিট অবসর পেয়ে গেল স্যাণ্ডেল, এরমধ্যেই খানিকটা সামলে উঠবে নিশ্চয়।

তরুণের জয় সুনিশ্চিত—কে যেন টমের কানেব কাছে গুনগুন করে উঠল। টমের মনে পড়ে গেল স্টাউশার বিল্‌কে হারাবার পর সে রাতে ও কার মুখে যেন এই একই কথা শুনেছিল। টমের এক অনুরাগী সমর্থক সেদিন ওকে ড্রিঙ্কের আহ্বান জানিয়েছিল। সেই বলেছিল কথাগুলো। সে রাতে টমই ছিল তরুণ আর আজ তারুণ্যের প্রতিমূর্তি বসে আছে তার বিপরীত দিকে। আধঘণ্টা হয়ে গেল লড়ছে টম এবং টমের বয়সটা কম নয়। স্যাণ্ডেলের মতো লড়লে পনের মিনিটের বেশী সে টিকতে পারত না। আসল কথা দুই রাউণ্ডের মধ্যবর্তী ওই সামান্য অবসরে ওর স্ফীত শিরা আর আহত ক্লান্ত হৃৎপিণ্ড হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে সমর্থ হচ্ছেনা। তাছাড়া দুর্বল শরীর নিয়েই সে শুরু করেছে লড়াই। পা দু'টো ভারী ঠেকছে, শিরে টান ধরতে শুরু করেছে। দু'মাইল পথ হেঁটে আসা ঠিক হয়নি একেবারে। তাছাড়া সেই সকাল থেকে তার মাংস খাবার দুর্নিবার বাসনাটাও মেটেনি। কসাইরা ওকে ধার দিতে রাজী হয়নি মনে পড়তেই একরাশ ঘৃণা উথলে ওঠে। একজন বয়স্ক মানুষের পক্ষে এমন আধপেটা খেয়ে লড়াইয়ে নামা সত্যিই অসুবিধাজনক। এক টুকরো মাংস আর এমন কি ব্যাপার—কয়েক পেনি তো দাম। কিন্তু সেটুকু জুটলেও আজ হয়ত তিরিশটা ডলার উপার্জন করতে পারত টম।

একাদশ রাউণ্ডের ঘণ্টা পড়তেই স্যাণ্ডেল তেড়ে এল। হাবভাবে যতই চাঙ্গা দেখাতে চাক না কেন আসলে কিন্তু তা নয়। টম জানে পুরোটাই ধাপ্পা। মুষ্টিযুদ্ধে মান্ধাতার আমল থেকেই এই ধাপ্পা চালু। স্যাণ্ডেলের আক্রমণের প্রথম দমকাটার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে

টম ওকে প্রথমে আঁকড়ে ধরেছিল। তারপর বাঁধন আলগা করে মুক্ত করে দিল স্যাণ্ডেলকে। টম যা চেয়েছিল তাই ঘটল। বাঁ হাতের ঘুষি মারার ভড়কি দিতেই স্যাণ্ডেল এক পাশে কাত হয়ে হাত ঝাঁকিয়ে ঘুষি চালাল। সঙ্গে সঙ্গে আধপা পেছনে সরে মোক্ষম একটি ডান হাতের আপার-কাটে স্যাণ্ডেলকে ধরাশায়ী করে ফেলল টম। তারপর এক মুহূর্তের অবসর নয়—মারের পর মার, হুক্ ও ড্রাইভ, হরেক রকমের মারে চুরচুর করে দেয় স্যাণ্ডেলকে। দড়ির ওপর আছড়ে ফেলেছে এবার স্যাণ্ডেলকে। নিজেও আঘাত পাচ্ছে কিন্তু তার বহুগুণ বেশী আঘাত দিচ্ছে। স্যাণ্ডেল জড়িয়ে ধরলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছে, জড়িয়ে ধরার প্রয়াস পেলেই আঘাত হানছে, মাটিতে লুটিয়ে পড়ার উপক্রম হলে নিজেই একহাতে তাকে টেনে দাঁড় করিয়ে রেখে অন্য হাতের ঘুষির আঘাতে দড়ির গায়ে ঠেলে দিচ্ছে। দড়ির উপর ফেলে দিতে পারলে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে পারবে না—আরো আঘাত করার সুযোগ মিলবে।

ইতিমধ্যে প্রেক্ষাগৃহ উন্মত্ত। প্রতিটি দর্শক টমের হয়ে চেঁচাচ্ছে: 'শেষ করে দাও! শেষ করে দাও! ওকে শেষ করে ফ্যালো টম্!' লড়াইয়ের অন্তিম পরিণতি আসবে ঘূর্ণিঝড়ের দাপট নিয়ে, এই তো চায় বক্সিঙের আসরের দর্শক।

আধ ঘণ্টা ধরে শক্তি সঞ্চয় করে রেখেছে টম এই মুহূর্তটির অপেক্ষায়। অকৃপণ ভাবেই সেই শক্তিকে এখন সে কাজে লাগাচ্ছে। এই তার একমাত্র সুযোগ—পারে তো এখনই পারবে। খুব দ্রুত ফুরিয়ে আসছে টমের শক্তির সঞ্চয়। পুরোপুরি ক্ষমতা হারাবার আগেই স্যাণ্ডেলকে একেবারে ধরাশায়ী করতে পারবে বলে আশা রাখে টম। টম আঘাত হেনে চলে। প্রতিটি আঘাত ঠাণ্ডা মাথায় হিসেব করা। কতটা শক্তি ব্যয় হচ্ছে আর কতটা ক্ষতি করতে পারছে তারই চুলচেরা বিচার। স্যাণ্ডেলের মতো একজনকে নক্আউট্ করা যে কী কঠিন তা সে উপলব্ধি করছে এখন। অসামান্য সহ্যশক্তি তার। এ হিম্মত শুধু তাজা যৌবনেরই থাকে। স্যাণ্ডেল মুষ্টিযোদ্ধা

হিসেবে নাম করবেই। এই রকম কঠিন পেশীতন্তু দিয়েই তৈরি হয় সার্থক যোদ্ধাদের দেহ।

স্যাণ্ডেল টলমল করে কিন্তু টমেরও পায়ে খিঁচ ধরছে, হাতের গাঁটগুলো বিদ্রোহ করছে। তবু নিজেকে শক্ত করে টম। ভয়ঙ্কর ভাবে ঘুষি চালায়। প্রতিবার আঘাত হানার সঙ্গে সঙ্গে তার জীর্ণ আহত হাতদুটো অশেষ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছে। নিজে কোন আঘাত পাচ্ছে না তবু স্যাণ্ডেলের মতোই প্রতি মুহূর্তে দুর্বল হয়ে পড়ছে সে। ঘুষিগুলো ঠিক জায়গাতেই পড়ছে কিন্তু ঘুষিতে আর সেই জোর নেই। ঐকান্তিক ইচ্ছাশক্তির ফসল মাত্র। টম এখন পা ঘষড়ে ঘষড়ে নড়াচড়া করছে। দুর্বলতার লক্ষণটা চোখে পড়া মাত্র স্যাণ্ডেলের সমর্থকরা চিৎকার করে উৎসাহিত করতে চায় তাকে।

আবার প্রচণ্ড রূপ ধরে টম। পরপর দুটো ঘুষি চালায়—বাঁ হাতের মারটা লাগে একটু উঁচুতে, সোলার প্লেক্সাসে। ডান হাতেরটা এসে পড়ে চোয়ালের ওপর। মারে তেমন জোর ছিল না কিন্তু স্যাণ্ডেল এত দুর্বল, এতই বিহ্বল যে সঙ্গে সঙ্গে সে কাটা ছাগলের মতো লুটিয়ে পড়ে ছটফট করতে শুরু করল। রেফরি তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে সময় গণনা শুরু করে দিল। দশ সেকেণ্ড হাঁকার মধ্যে উঠে দাঁড়াতে না পারলেই হার। পুরো প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে উদগ্রীব নীরবতা। কম্পিত পায়ে দাঁড়িয়ে আছে টম। মৃত্যুকালীন আচ্ছন্নতা যেন তাকে ঘিরে ধরেছে। সমবেত দর্শকদের মুখগুলো সমুদ্রের মতো দোল খাচ্ছে, কাছে আসছে, দূরে সরে যাচ্ছে, আর বহুদূর থেকে যেন কানে ভেসে আসছে রেফরির সময় গণনা—এক—দুই—

এরপরেও যৌবনই একমাত্র মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। স্যাণ্ডেলও উঠে দাঁড়াল। চার গোনা হতেই সে গড়িয়ে গিয়ে উপুড় হয়ে শুল। অন্ধের মতো দড়িটা ধরার জন্যে ছটফট করতে লাগল। সপ্তম সেকেণ্ডে কোনক্রমে ঘষড়ে ঘষড়ে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঠে বসল। মাতালের মতো কাঁধের ওপর মাথাটা এলোমেলো দুলছে। রেফরি 'নয়'

হাঁকা মাত্র সিধে উঠে দাঁড়াল স্যাণ্ডেল। আত্মরক্ষার সঠিক ভঙ্গিতে বাঁ হাতে মুখ ঢেকে রেখেছে, ডান হাতে ঢেকেছে পেট। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গটি সুরক্ষিত করে বেতালা পা ফেলে টমের দিকে এগিয়ে এল স্যাণ্ডেল। আশা করছে টমকে জাপটে ধরে আরো খানিকটা সময় কাটিয়ে দিতে পারবে।

স্যাণ্ডেল উঠে দাঁড়ান মাত্র দু'বার ঘুষি চালায় টম। দু'বারই কিন্তু তার আঘাত গিয়ে পড়ে স্যাণ্ডেলের ভাঁজ করা হাতের বর্মের ওপর। পর মুহূর্তেই স্যাণ্ডেল মরিয়া হয়ে পাকড়ে ধরে টমকে। দু'জনকে ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টায় হাত লাগায় রেফরি। টমও চেষ্টা করে মুক্তি পাবার। টম জানে যুবকরা কত তাড়াতাড়ি সামলে ওঠে। স্যাণ্ডেল যদি সামলে ওঠার সময় না পায় টমের জয় সুনিশ্চিত। একটা সোজা আঘাতই যথেষ্ট। স্যাণ্ডেলকে সে যে-প্যাঁচে ফেলেছে জয় তার অবধারিত। মুষ্টিযুদ্ধের রীতি নীতি ও কৌশল—সব দিক দিয়েই সে পরাস্ত করেছে স্যাণ্ডেলকে। জট খুলে যাওয়ায় স্যাণ্ডেল এবার দূরে সরে গেছে। টিকে থাকা না-থাকার এক সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে দোদুল্যমান স্যাণ্ডেল। একটি উত্তম মার্ এখুনি ওকে লুটিয়ে ফেলে খেলার নিষ্পত্তি করে দিতে পারে। মাংস খেতে না-পাবার কথাটা আবার খেয়াল হতেই তিক্ততায় ভরে ওঠে সমস্ত মনটা। মাংসটুকু পেলে হয়তো এই মুহূর্তে তার ঘুষিটা ঠিক প্রয়োজন মতো জোরালো হতে পারতো। সমস্ত স্নায়ুর শক্তি একত্রিত করে টম ঘুষি মারল কিন্তু তাতে না আছে জোর, না আছে গতি। স্যাণ্ডেল টলে গেল কিন্তু পড়ল না। কোন রকমে সরে এসে দড়ি ধরে দাঁড়াল। টমও বেসামাল পায়ে ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে হতাশাগ্রস্ত মানুষের শেষ চেষ্টা হিসেবে আবার ঘুষি চালাল। কিন্তু ওর দেহের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। আছে শুধু লড়াকু মনোভাব—তাও ম্লান ঝাপসা হয়ে এসেছে ক্লান্তিতে। যে আঘাতটা চোয়ালের ওপর পড়ার কথা সেটা কাঁধের ওপর এল। আরো উঁচুতে ঘুষিটা চালাতে চেয়েছিল টম কিন্তু ক্লান্ত মাংসপেশী তার

সেই আদেশ পালন করতে পারেনি। উল্টে আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় সে নিজেই টলমল করে ওঠে, আরেকটু হলেই পড়ে যেত। আবার চেষ্টা করে টম। এবার পুরোপুরি লক্ষ্যভ্রষ্ট। অপরিসীম ক্লান্তিতে স্যাণ্ডেলের গায়ের ওপর আছড়ে পড়ে। স্যাণ্ডেলকে দু' হাতে আঁকড়ে ধরে নিজের পতন রোধ করে।

টম নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেনা। আর তার করার কিছু নেই। টম ফুরিয়ে গেছে। জয়লাভ করেছে যৌবন। আলিঙ্গনে আবদ্ধ থাকার সময়েই টম অনুভব করে স্যাণ্ডেল শক্তি ফিরে পাচ্ছে। রেফরি ওদের ছাড়িয়ে দেবার পর টম ছাখে সাক্ষাত যৌবন কেমন বলীয়ান হয়ে উঠছে প্রতি মুহূর্তে। প্রথম দিকে স্যাণ্ডেলের ঘুষিতে কোন জোর ছিল না, আদৌ কার্যকর হয়নি। কিন্তু ক্রমেই জোরালো আর নির্ভুল হয়ে উঠছে তার মার্গুলো। ঝাপসা চোখে টম ছাখে গ্লাভ্স্ পরা একটা হাত তার চোয়াল লক্ষ্য করে ছুটে আসছে। আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে হাত তুলে আঘাত বাঁচাতে চায় টম। কিন্তু মন চাইলেও দেহ পারে না। হাত তো নয় যেন কয়েক মণ সীসে। এমনিতে উঠতে চায় না হাতটা, তাই ইচ্ছাশক্তি দিয়ে তাকে ঠেলে তুলতে চায় টম। গ্লাভস্ পরা হাতটা এসে পড়ল টমের চোয়ালে। বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হবার মতো একটা শুধু ঝলক্—সঙ্গে সঙ্গে আঁধারের ওড়না এসে ঢেকে দিল টমকে।

টম চোখ খুলে দেখল সে রিঙের ধারে নিজের জায়গায় বসে আছে। বণ্ডির সমুদ্র উপকূলে ঢেউয়ের গর্জনের মতো ভেসে আসছে দর্শকদের চিৎকার। স্পঞ্জে করে তার ঘাড়ে জল দেওয়া হচ্ছে। মুখ আর বুকের ওপর ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে সিড স্নলিভান তাকে চাঙ্গা করতে চাইছে। হাতের গ্লাভ্স্ দুটো আগেই খুলে নেওয়া হয়েছে। স্যাণ্ডেল ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে করমর্দন করছে। টমকে আজ হারিয়ে দিয়েছে স্যাণ্ডেল কিন্তু তার জন্যে ওর প্রতি একটুও বিরূপ বোধ করে না টম। উৎফুল্ল ভাবেই করমর্দন করে। আঙুলের চাপে ভাঙা

গাঁটগুলো অত্যন্ত পীড়া দেয়। স্যাণ্ডেল এবার মঞ্চের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। তরুণ যোদ্ধা প্রন্টোর চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে আর বাজির পরিমাণ বাড়িয়ে একশো ডলার করে দেয়। ম্রিয়মাণ ভাবে তাকিয়ে থাকে টম। সহকারীরা ওর মুখ থেকে জল মুছে মঞ্চ পরিত্যাগের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। হঠাৎ ক্ষুধার্ত বোধ করে টম। খিদের জ্বালা নয়—একটা অবশ ভাব, জঠরের অভ্যন্তরে একটা দপদপানি যেটা সারা শরীর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। টমের মনে পড়ে যায় লড়াইয়ের সেই বিশেষ মুহূর্ত-টার কথা। স্যাণ্ডেলের তখন পুরোপুরি বিপর্যস্ত বেসমাল অবস্থা। পরাজয়ের গহ্বরে তাকে তলিয়ে দিতে পারতো টম অতি সহজেই। মাংসটুকু যদি খেতে পেত—ওই বাড়তি ক্ষমতাটুকু নিশ্চয় থাকতো তার। শেষ আঘাতের পেছনে সামান্য একটু ক্ষমতার অভাবই টমের পরাজয় ডেকে এনেছে। শুধু মাংসটুকু খেতে না পাবার জন্যেই হেরে গেল টম।

দড়ির ফাঁক গলে বেরোবার সময় টমকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল সহকারীরা। তাদের সরিয়ে দিয়ে টম নিজেই মাথা নীচু করে দড়ি পেরিয়ে ভারী পায়ে মঞ্চ থেকে লাফিয়ে নামল। সহকর্মীরা ভিড় সরাতে লাগল আর টম তাদের পিছু পিছু চলল। ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে হলঘরটা পেরিয়ে রাস্তায় পা দিতে যাবে, পেছন থেকে কয়েক জন ছোকরা বলে উঠল, 'অমন সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিলে কেন?'

'বেশ করেছি!' এক কথায় উত্তর সেরে সিঁড়ি কটা টপকে রাস্তায় এসে নামল টম।

মোড়ের মাথায় পাবলিক হাউসের সুইঙ-ডোরটা খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। টম দেখল ভেতরে ঝলমল করছে আলো, হাসিমুখে মহিলারা ড্রিংক পরিবেশনে ব্যস্ত, আজকের লড়াই নিয়ে আলোচনা চলছে, বারের ওপর প্রচুর মুদ্রার ঝনঝনানি। কে যেন চেঁচিয়ে ড্রিঙ্কের আমন্ত্রণ জানাল। একটু থমকে দাঁড়িয়েছিল টম তারপর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে এগিয়ে চলল।

পকেটে একটা আধলা নেই। দু'মাইল হেঁটে ফেরা সোজা কথা নয়। সত্যিই বয়স হয়ে যাচ্ছে টমের। ডোমেন্ পেরিয়ে হঠাৎ রাস্তার ধারে একটা বেঞ্চির ওপর বসে পড়ল টম। ভাবতেই মনটা দুমড়ে যাচ্ছে যে লড়াইয়ের ফলাফল জানবার জন্যে ওরই পথ চেয়ে ওর বৌ হাঁ করে বসে আছে বাড়িতে। লড়াইয়ে নক্‌আউট হওয়ার চেয়েও ঢের ভয়াবহ এখন ওর সম্মুখীন হওয়া। কী করে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে ভেবে পায়না টম।

অত্যন্ত দুর্বল লাগে। সারা শরীর যেন জ্বলছে। হাতের ভাঙা গাঁটগুলো স্মরণ করিয়ে দেয় মাটি কাটার কাজ পেলেও এক সপ্তাহের আগে কোদাল বা বেলচা চালাতে পারবে না। খিদেটা যেন আগুন হয়ে জ্বলছে পেটের মধ্যে। অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করছে। নিজের অসহায় অবসন্ন অবস্থা দেখে ভেঙে পড়ে টম। অবাঞ্ছিত ভাবে ভিজে ওঠে দু'চোখ। দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় বহুদিন আগে স্টাউশার বিলকে হারাবার রাতটার কথা। বেচারা স্টাউশার! এতদিনে টম বুঝতে পারছে স্টাউশার কেন সেদিন ড্রেসিঙরুমে বসে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল।

ডেব্‌সের স্বপ্ন

পাক্কা একটি ঘণ্টা আগে ঘুম ভেঙে গেছে আমার। নির্ধারিত সময়ের আগে ঘুম ভাঙাটাই তো একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। চোখ খুলে শুয়ে এই নিয়েই চিন্তা করছি। একটা কোন গণ্ডগোল নিশ্চয় হয়েছে, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না সেটা কী। একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেছে বা ঘটতে চলেছে এই দুশ্চিন্তা আমায় একেবারে পেয়ে বসেছে। কিন্তু ব্যাপারটা কী, ভাল করে ভেবে দ্যাখা দরকার। মনে পড়ে যাচ্ছে সেই ১৯০৬ সালের সর্বনাশা ভূমিকম্পের প্রথম ধাক্কাটা আসার ঠিক কয়েক মুহূর্ত আগে অনেকের ঘুম ভেঙে গেছল শুনেছিলাম। ভূমিকম্প শুরু হবার আগের সেই ক'টা মুহূর্ত তাদের নাকি দারুণ আতঙ্কিত করে তুলেছিল। স্যান্ ফ্রান্সিসকো কি তাহলে আবার ভূমিকম্পের প্রকোপে পড়বে?

পুরো এক মিনিট দুরু দুরু বুকে শুয়ে আছি, কিন্তু কই, দেওয়াল মেঝে কাঁপল না তো, ঘরদোর ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ল না তো! সব শান্ত নিস্তব্ধ। এবার বুঝেছি—এই অস্বাভাবিক নীরবতাই আমাকে আজ বিচলিত করেছে। এই বিশাল কর্মব্যস্ত শহর আজ গুঞ্জরিত হয়ে ওঠেনি। কী বিস্ময়কর ব্যাপার! বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে গড়ে প্রতি তিন মিনিট অন্তর একটি করে ট্রাম যায়। অথচ আজ দশ মিনিট হয়ে গেল একটাও ট্রামের শব্দ শুনিনি। ট্রাম স্ট্রাইক হতে পারে অবশ্য, কিংবা কোন দুর্ঘটনার জন্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু নাঃ—শুধু এই একটা কারণের জন্যে এমন সর্বগ্রাসী নীরবতা সৃষ্টি হতে পারে না। ঘোড়ার গাড়ির চাকার ঘড়ঘড় ক্যাঁচকোঁচ নেই, খোয়া বাঁধানো খাড়াই রাস্তা থেকে লোহার নাল পরা ঘোড়ার পায়ের খট খট শব্দও কানে আসছে না।

খাটের পাশে কলিঙ বেলের সুইচটা টিপে কান খাড়া করে

শুনতে চেষ্টা করলাম বেল্ বাজল কিনা। অবশ্য তিন তলায় বসে এক তলায় বেল বাজলো কিনা শুনতে চেষ্টা করাটাও আহাম্মুকি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই থালা আর খবরের কাগজ হাতে ব্রাউন এসে ঘরে ঢুকল। বেলটা তাহলে বেজেছে। যথারীতি ব্রাউনের হাবভাব শান্ত হলেও বিস্ময় আর আশঙ্কার ছায়া পড়েছে দেখছি ওর ছ'চোখে। তা'ছাড়া ট্রে-র ওপর দুধও নেই।

'দুধ দিয়ে যায়নি আজ।' ব্রাউন বলল। 'বেকারি থেকেও কোনো খাবার আসেনি।'

আবার ট্রে-র দিকে তাকালাম। টাটকা ফ্রেঞ্চ রোলও নেই—আছে কেবল গতকালের বাসী পাঁউরুটির ফালি। সবচেয়ে অখাদ্য এই গ্রাহাম পাঁউরুটি।

'আজ সকালে কিচ্ছু আসেনি স্যার।' ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গিতে বোঝাতে শুরু করছিল ব্রাউন। আমি মাঝখান থেকে বাধা দিলাম।

'খবরের কাগজ?'

'হ্যাঁ স্যার, খবরের কাগজটা দিয়েছে। ওইটাই যা এসেছে। কিন্তু আজই শেষ। কাল থেকে আর কাগজ পাওয়া যাবে না বলে লিখেই দিয়েছে। কাউকে কি স্যার বাইরে পাঠাব—আপনার জন্যে কন্‌ডেন্সড্ মিল্ক নিয়ে আসবে?'

ঘাড় নেড়ে ওকে বারণ করে দিলাম। ব্ল্যাক কফির কাপটা হাতে তুলে নিয়ে খবরের কাগজটা খুলে বসলাম। হেড্ লাইনগুলোর ওপর চোখ বুলোতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। শুধু পরিষ্কার নয়, পরিষ্কারের মাত্রাটা বোধ হয় প্রয়োজনের চেয়েও বেশী। অত্যন্ত হাস্যকর ভঙ্গিতে অকারণে নিরাশার সুর সেধেছে সংবাদপত্রটি। বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি করেছে। সারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে নাকি হরতাল ডাকা হয়েছে। বড় বড় শহরগুলির খাদ্য ইত্যাদির ভবিষ্যত সংস্থানের প্রশ্নে সাংবাদিকদের দুশ্চিন্তা কল্পনার পাখা মেলে পাড়ি দিয়েছে।

দ্রুত চোখ বুলিয়ে যাচ্ছি কাগজের পাতায়। সব পড়ার কোন

দরকার নেই। শ্রমিক বিক্ষোভের কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে। এটা কোন নতুন ঘটনা নয়, বেশ কিছুদিন ধরেই এই চলছে। সংগঠিত শ্রমিকরা গত এক পুরুষ ধরে একটা সর্বাত্মক ধর্মঘট ডাকার স্বপ্ন দেখছে। প্রথম এই স্বপ্ন দেখেছিল ডেব্‌স্‌। তিরিশ বছর আগে প্রধান নেতাদের মধ্যে ডেব্‌স্‌ ছিল অন্যতম। মনে পড়ছে কলেজে পড়ার সময় আমি একটা পত্রিকার জন্যে এই বিষয়ে একটা প্রবন্ধ অবধি লিখেছিলাম। প্রবন্ধের নামটাও মনে পড়ছে—'ডেব্‌সের স্বপ্ন'। স্বীকার করতেই হবে যে পুরো পরিকল্পনাটাকে আমি শুধু একটা স্বপ্ন হিসেবেই পণ্ডিতী ঢঙে খুঁটিয়ে দেখেছিলাম। সময় পেরিয়ে গেছে—পৃথিবী বদলে চলেছে—গম্‌পার্‌স্‌ নেই—আমেরিকান ফেডারেশান অফ লেবার নেই, উদ্ভট সব বিপ্লবী চিন্তা মাথায় ডেব্‌স্‌ও আর নেই। স্বপ্নটা কিন্তু রয়েই গেছল। এতদিনে সেটা বাস্তবে রূপান্তরিত হল। তবু খবরের কাগজের ছত্রে ছত্রে বিষণ্ণতা দেখে পড়তে পড়তেই হাসি পায়। এদের চেয়ে আমি অনেক বেশী খবর রাখি। সংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যেও বিবাদ-বিসংবাদ লেগেই আছে। এইটাই তাদের চিরকালের দুর্বলতা। কয়েক দিনের মধ্যেই সব মীমাংসা হয়ে যাবে। এটা একটা জাতীয় ধর্মঘট—সরকারের পক্ষে এই ধর্মঘট চূর্ণ করা আদৌ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার নয়।

কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে উঠে পড়লাম। জামা কাপড় পরে নিই। এখন স্যান্‌ ফ্রান্সিসকোর রাস্তায় বেরোতে ভারী মজা লাগবে। একটিও কলের চাকা ঘুরছে না—পুরো শহর বাধ্য হয়ে ছুটি উদযাপন করছে।

'মাপ্‌ করবেন হুজুর।' ব্রাউন আমার হাতে সিগার কেস্‌টা তুলে দিয়ে বলল, 'হার্মেড বলছিল বেরোবার আগে আপনার সঙ্গেও একবার দেখা করতে চায়।'

'এক্ষুণি পাঠিয়ে দাও।'

হার্মেড আমার বাট্‌লার। ঘরে ঢুকতেই দেখলাম উত্তেজনা

চেপে রাখার চেষ্টায় ও ঘনঘন শ্বাস ফেলছে। সোজা কাজের কথা পাড়ল হার্মেড।

'কি করে কী হবে হুজুর? খাবার দাবার তো চাই! ডেলিভারি ভ্যানের ড্রাইভাররা স্ট্রাইক করেছে। ইলেকট্রিকও তো বন্ধ। ওরাও নিশ্চয় স্ট্রাইক করেছে।'

'দোকানপাট খোলা আছে?' জানতে চাইলাম।'

'শুধু ছোটগুলো হুজুর! বড় বড় দোকানে কোন কর্মচারী আসেনি তাই সব বন্ধ। ছোট ছোট দোকানগুলো মালিক বা তার পরিবারের লোকেরাই চালাচ্ছে।'

'তাহলে তুমি গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে যাও।' আমি বললাম। 'যা-যা দরকার দেখেশুনে কিনে নাও। বেশী বেশী করে কিনো—যা দরকার তা তো নেবেই, যা দরকার পড়তে পারে তাও কিনে রেখো। এক বাক্স মোমবাতি নিও—না, না, ছ' বাক্স নিয়ে নিও। কাজ হয়ে গেলে হ্যারিসনকে বলো গাড়িটা নিয়ে ক্লাবে চলে যেতে। আমি ওখানেই থাকবো। এগারোটার মধ্যে আসবে কিন্তু।'

হার্মেড গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়তে লাগল। 'হ্যারিসনও ড্রাইভারদের ইউনিয়ানে যোগ দিয়েছে। আমি তো গাড়ি চালাতে জানি না।'

'ওঃ হো—ও-ও তাহলে যোগ দিয়েছে, অ্যাঁ? যাক্ গে, এর পরে হ্যারিসন যেদিন আসবে বলে দিও অন্য কোথাও কাজ খুঁজে নিতে।'

'যে আজ্ঞে।'

'তুমি আবার বাট্লারদের ইউনিয়নে যোগ দাওনি তো হার্মেড?'

'না হুজুর। আর যোগ দিলেও এমন দুর্দিনে নিশ্চয় আমার মনিবকে ফেলে চলে যেতাম না। না হুজুর আমি তাহলে—'

'বেশ, বেশ! তুমি তাহলে তৈরি হয়ে নাও, আমার সঙ্গেই যাবে। আমি নিজেই গাড়ি চালাব। বেশ কিছু জিনিস মজুত করে রাখা দরকার। কতদিন এমন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হবে বলা যায় না।'

আজ পয়লা মে। মে মাসের দিনগুলো এমনিতেই সুন্দর আর আজকের তো কথাই নেই। একটুও মেঘ নেই আকাশে, বাতাস বন্ধ, উষ্ণ হাওয়া—বেশ গরম পড়েছে। রাস্তায় বেশ কিছু গাড়ি বেরিয়েছে কিন্তু মালিকরা নিজেরাই চালাচ্ছে। রাস্তায় ভিড় থাকলেও হট্টগোল নেই। শ্রমিকরা তাদের রাববারের জন্যে তুলে রাখা পোশাক গায়ে চড়িয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। হরতালের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করছে। সমস্ত ব্যাপারটা যেমন অস্বাভাবিক তেমনই শান্তিপূর্ণ—বেশ উপভোগ করছি। মৃদু উত্তেজনার শিহরণ লাগছে। একটা শঙ্কাহীন অভিযানে বেরোবার মতো। মিস চিকারিঙকে পেরিয়ে গেলাম। নিজেই উনি ছোট্ট গাড়িখানার হাল ধরে বসেছেন আজ। দিক পরিবর্তন করে আমার পিছু নিয়ে মোড়ের মাথায় এসে আমাকে পাকড়াও করলেন তিনি।

'মিস্টার সার্ফ!' উত্তেজিত কণ্ঠে ডাকলেন। 'কোথায় মোমবাতি কেনা যায় বলতে পারেন? ডজন খানেক দোকান ঘুরেছি। সবার স্টক শেষ। কী সাংঘাতিক ব্যাপার বলুন তো?'

মিস্ চিকারিঙের উজ্জ্বল চোখদুটোই কিন্তু জানিয়ে দিচ্ছে যে তিনি মিথ্যে কথা বলছেন। আমাদের মতো তিনিও খুবই উপভোগ করছেন এই অদ্ভুত পরিস্থিতি। কটা মোমবাতি যোগাড় করতেও এখন অভিযান চালাতে হচ্ছে। শহর ছাড়িয়ে মার্কেট স্ট্রীটের দক্ষিণে শ্রমিক বসতিতে পৌঁছে তবে কটা দোকান খোলা পাওয়া গেল। ছোট ছোট মুদীর দোকানগুলোতে এখনো মালপত্র আছে। মিস্ চিকারিঙ এক বাক্স মোমবাতি কিনছিলেন, বুঝিয়ে সুঝিয়ে চার বাক্স কিনিয়ে দিয়েছি। নিজেও এক ডজন বাক্স কিনে ফেলেছি। আমার গাড়িটা বেশ বড়—রাখার জায়গার অভাব হবে না। স্ট্রাইকের মীমাংসা হতে কত দেরী হবে কেউ বলতে পারে না। ময়দার বস্তা, বেকিঙ পাউডার, টিনের খাবার আর দৈনন্দিনের টুকি-টাকী যা-যা লাগে, যেমন ফরমাশ করেছে হার্মাড—সব কিনে গাড়ি

একেবারে ঠেসে ফেলা হয়েছে। ব্যস্তসমস্ত হার্মাড মুরগীর মতো ঠুকরে বেড়াচ্ছিল দোকানের মজুত খাদ্যসম্ভার।

সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় হচ্ছে যে আজ স্ট্রাইকের এই প্রথম দিন একটি লোকও কিন্তু ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মাথা ঘামাচ্ছেনা। সকালের খবরের কাগজে সংগঠিত শ্রমিকরা বিবৃতি দিয়েছে যে, প্রয়োজনে এক মাস, দু'মাস কি তিন মাস তারা লাগাতার হরতাল চালিয়ে যাবে। লোকে কিন্তু ঠাট্টার ছলে উড়িয়ে দিয়েছে তাদের শাসানি। কিন্তু একটু চোখ খোলা রাখলেই সবাই দেখতে পেত যে শ্রমিক শ্রেণী কিন্তু জিনিসপত্র কেনাকাটি নিয়ে আর সবার মতো ক্ষেপে ওঠেনি। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস সুচতুর ভাবে, গোপনে, প্রতিটি শ্রমিক পরিবার তাদের ভাঁড়ার ভর্তি করেছে। সেইজন্যেই আজ আমরা শ্রমিক অধ্যুষিত এই অঞ্চলে ছোটখাট মুদীর দোকান থেকে কেনা-কাটার সুযোগ পেয়েছি।

বিকেল বেলা ক্লাবে পৌঁছবার পর প্রথম বিপদের আভাস পেলাম। চারধারেই বিশৃঙ্খলা। ককটেলের জন্যে অলিভ নেই, বেয়ারারাও ঠিকমতো হুকুম পালন করছে না। বেশীর ভাগ লোকই ক্রুদ্ধ আর সবাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ঘরে পা দিতেই কলকণ্ঠে অনেকে আমায় অভ্যর্থনা জানাল। ধূমপান কক্ষে জানলার ধারে চেয়ারের ওপর তাঁর বিপুল পশ্চাদ্দেশটির ভার রেখে বসে আছে জেনারেল ফল্‌সম। জনা ছয়েক ভদ্রলোক উত্তেজিত ভাবে তাকে কিছু একটা করার জন্য পেড়াপীড়ি করছে।

'যা করবার তো করেছি—আর কী করব?' জেনারেল আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করছে। 'ওয়াশিংটন থেকে কোন নির্দেশ পাইনি। আপনারা যদি ওয়াশিংটন থেকে একটা নির্দেশ আনিয়ে দিতে পারেন তাহলে আমার যা করণীয় ঠিকই করব। কিন্তু আদৌ কিছু করা যাবে কিনা সে বিষয়েও আমার যথেষ্ট সন্দেহ। আজ সকালে স্ট্রাইকের কথা শোনা মাত্র প্রেসিডিও থেকে আমি সৈন্য তলব করে আনিয়েছিলাম—অল্পস্বল্প নয়, একেবারে পুরো তিন হাজার। ব্যাঙ্ক

টাঁকশাল, পোস্ট অফিস ও সরকারী অফিস আদালত পাহারা দিচ্ছে। কোথাও কোন হাঙ্গামা হচ্ছে না। ধর্মঘটীরা সম্পূর্ণভাবেই শান্তি বজায় রেখেছে। বৌ ছেলেমেয়েকে নিয়ে সব সেজেগুজে রাস্তা দিয়ে যদি হাঁটে তখন নিশ্চয় তাদের ওপর আমায় গুলি চালাতে বলবেন না।'

'ওয়াল স্ট্রীটে কী ঘটছে জানতে ইচ্ছে করছে।' পাশ দিয়ে যাবার সময় জিমি উম্‌বোল্ডকে বলতে শুনলাম। ওর দুশ্চিন্তার কারণটা আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় না। পশ্চিমী দুনিয়ার সংঘবদ্ধ বাণিজ্য-চুক্তির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে উম্‌বোল্ডের স্বার্থ।

'এই যে সার্ফ!' 'অ্যাটকিন্‌সন্ ব্যস্ত সমস্ত হয়ে আমার কাছ ঘেঁষে আসে। তোমার গাড়িটা চালু আছে?'

'হ্যাঁ।' উত্তর দিলাম। 'কিন্তু কেন বলতো? তোমার গাড়ির কি হল?'

'খারাপ। সারাব কী, সব গ্যারেজ বন্ধ। ওদিকে আমার স্ত্রী ট্রাকির কাছেই কোথাও নিশ্চয় পথে আটকা পড়েছে। হাজার পয়সা ছড়াও, মিষ্টি কথা বলো, কিন্তু টেলিগ্রাফ পাঠাবার কোন উপায় নেই। আজ সন্ধ্যায় ওর ফিরে আসা উচিত ছিল। হয়তো খেতেও পাচ্ছে না, কে বলতে পারে। তোমার গাড়ীটা একটু দিতে পারবে?'

'খাঁড়ি পার করতে পারবেনা কিন্তু।' হলস্টেড বলে উঠল। 'ফেরি চলাচল করছে না। তবে আমার মনে হয় একটা ব্যবস্থা তুমি করতে পারো। এই তো রলিন্‌সন-রলিন্‌সন, শোনো এদিকে এক মিনিট। অ্যাটকিন্‌সন একটা গাড়ি পার করতে চায় খাঁড়ির ওদিকে। ওভারল্যাণ্ডে ওর বৌ আটকা পড়েছে। টিবুরন থেকে 'লুর্‌লেট'-টাকে নিয়ে আসতে পারো না গাড়িটা পার করার জন্যে?'

'লুর্‌লেট' একটা দু'শো টনের সমুদ্রগামী স্কুনার-ইয়ট।

রলিনসন ঘাড় নাড়ে। 'কোনো মাল্লা পাওয়া যাবে না—লুরলেটের ওপর গাড়ি চড়ানো অসম্ভব। তাছাড়া 'লুরলেট'কে

আনবোই বা কী করে ? 'লুরলেট' এর সমস্ত নাবিকরাই কোস্ট সীমেন্ ইউনিয়নের সদস্য, ওরাও তো স্ট্রাইকে যোগ দিয়েছে।'

'কিন্তু আমার বৌয়ের কী হবে ? খেতে পাচ্ছে কিনা তারও তো ঠিক নেই।' আমি অন্যদিকে পা বাড়াতেই অ্যাটকিনসনের আক্ষেপ শুনতে পেলাম।

ধূমপান কক্ষের অন্য প্রান্তে উত্তেজিত ক্রুদ্ধ এক দল লোক বার্টি মেস্নারকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বার্টি তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে শীতল অবিশ্বাস ছড়িয়ে তাদের ক্ষিপ্ত ও চঞ্চল্ করে তুলছে। হরতাল নিয়ে বার্টির মাথাব্যথা নেই। কোন ব্যাপার নিয়েই সে বড় একটা মাথা ঘামায় না। এ জীবনের যা কিছু সুন্দর সবই তার আছে, তাই জীবনের নোঙরা দিকগুলো তাকে কোন ভাবেই আকৃষ্ট করে না। দু'শো লক্ষ ডলারের অধিকারী বার্টি। পুরো অর্থটাই নিরাপদ ভাবে ব্যবসায় খাটছে। উৎপাদনমূলক কোন কাজে জীবনে সে হাত ঠেকায়নি, যা পেয়েছে উত্তরাধিকারী সূত্রে বাবা আর দুই কাকার কাছ থেকে লাভ করেছে। কোন জায়গায় যেতে তার বাকী নেই, কিছু দেখতে তার বাকী নেই, আর বিয়েটা বাদ দিলে হেন কাজ নেই যা করতে বাকী রেখেছে। কয়েক শো ভাবী পাত্রীর দৃঢ়সংকল্প মাতৃকুলের অবিরাম আক্রমণও তাকে কাবু করতে পারেনি। বেশ কয়েক বছর ধরে ওকে পাকড়াবার জন্যে সবাই বৃথা চেষ্টা করে যাচ্ছে। এমন একটি আকাঙ্খিত অথচ দুর্বিনীত পাত্র পাওয়া দুষ্কর। শুধু অর্থই নয়, বয়সটাও তার কম, দেখতেও সুন্দর। তাছাড়া আগেই তো বলেছি, তার গায়ে কোন নোঙরামির দাগ লাগেনি। এই নাম করা খেলোয়াড়টি একটি দেবতা বিশেষ যার অসাধ্য বলে কিছু নেই। বিবাহ নামক কাজটির কথা বাদ দিলে আর সবকিছুই সে অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন করে। কোন কিছুকেই বার্টি পাত্তা দেয় না, কোন উচ্চাকাঙ্খা নেই তার, কোন আবেগ নেই। আর পাঁচ-জনের তুলনায় সে অনেক কাজই অনেক ভালভাবে করতে পারে, তবু কোন কাজটাই করার তার ইচ্ছে নেই

'দেশদ্রোহী!' ভিড়ের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে উঠল। আর একজন বলে উঠল—বিদ্রোহ, বিপ্লব। আরেকজনের মতে আবার পুরো ব্যাপারটাই অরাজকতা।

'সে রকম তো কিছু দেখলাম না।' বার্টি বলল। 'সারা সকালটাই তো রাস্তায় রাস্তায় কাটালাম। শান্তি শৃঙ্খলা পুরোপুরি বজায় আছে। এত সুশৃঙ্খল জনতা আমি আগে কখনো দেখিনি। যা-তা বলে লাভ নেই। ব্যাপারটা তা নয়। ওরাই ঠিক বলেছে—এটা স্রেফ সাধারণ একটা হরতাল। এবার আপনারা বুঝুন কী করবেন।'

'যা করার ঠিকই করবো।' গারফিল্ড হেঁকে উঠল। পরিবহণ ব্যবসায়ে গারফিল্ড লাখোপতি। 'হারামীদের মজা টের পাইয়ে দেবো! শয়তানের দল! দাঁড়াও না, গভর্নমেণ্ট একবার হাত লাগাক্!'

'কিন্তু গভর্নমেণ্ট কোথায়?' বার্টি মাঝখান থেকে বলে উঠল। 'গভর্নমেণ্টের আশায় থেকে কোনো লাভ নেই। ওয়াশিংটনে কি ঘটছে তা তুমি জানো না। আদৌ কোনো গভর্নমেণ্ট আছে কিনা তাও জানো না।'

'এই নিয়ে তোমার চিন্তা করার কিছু নেই।' গারফিল্ড বলে উঠল।

'কে বলেছে আমি চিন্তা করছি!' বার্টি হাসল। 'কিন্তু আমি না করলেও তোমরা তাই-ই করছো। আয়নায় একবার নিজের মুখটা গ্যাখো হে গারফিল্ড।'

গারফিল্ড অবশ্য তা দেখেনি। দেখলে এমন একজন উত্তেজিত ভদ্রলোককে দেখতে পেত যার ধূসর চুলগুলো উস্কোখুস্কো, আরক্তিম মুখ, রুষ্ট ঠোঁটদুটোয় প্রতিহিংসার প্রকাশ আর চোখ দুটো বুনো জন্তুর মতো জ্বলছে।

'এটা কিন্তু ঠিক নয়।' ছোটখাট মানুষ হ্যানোভার বলল। গলায়

স্বর থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে এই একই কথা ও অনেকবার বলেছে।

'এটা কিন্তু তোমার বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে হ্যানোভার।' বার্টি বলল। 'তোমাদের কথা শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তোমরা কিন্তু নিজেদের জালেই নিজেরা জড়িয়ে পড়েছ। এতদিন ধরে তো তোমরা আমার কানের পর্দা ফাটিয়ে শুধু চেঁচিয়ে এসেছ—শ্রমের মর্যাদা শ্রমের মর্যাদা করে। বছরের পর বছর এই নিয়ে তোমরা বক্তৃতা ঝেড়েছ। সাধারণ হরতাল ডেকে শ্রমিক শ্রেণী কোন অন্যায় করেনি। মানুষ বা দেবতার কোন আইনই তারা ভঙ্গ করেনি। কাজেই আর কথা বলো না হ্যানোভার। ঈশ্বরদত্ত কাজের অধিকার বা কাজ না-করার অধিকার, এই নিয়ে তোমরা অনেক বুক্‌নি ঝেড়েছ। অবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্য করে তুলেছ। কাজেই নিজেরাই যা করেছ তার পরিণতি ঠেকাবে কি করে! তোমাদের পুরো ব্যাপারটাই জঘন্য। এতদিন ধরে তোমরা শ্রমিকদের পায়ে টিপে ধরে তাদের চোখ উপড়ে নিয়েছো, এবার শ্রমিকরা তোমাদের পায়ে পিষছে, চোখ উপড়োচ্ছে। তোমরাও শুয়োরের মতো কেঁউ কেঁউ করছো।'

সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল—না না, একথা ঠিক নয়—শ্রমিকদের তারা মোটেই নির্যাতন করেনি—

'না স্যার্ না!' গারফিল্ড গলা ফাটায়। 'শ্রমিকদের জন্যে আমরা করতে কিছু বাকী রাখিনি। চোখ ওপড়ানো তো দূরের কথা, আমাদের জন্যেই ওরা প্রাণে বেঁচে আছে। আমরাই তো ওদের কাজ যুগিয়েছি। আমরা না থাকলে ওরা থাকতো কোথায়!'

'ভারী মঙ্গল করেছ! একেবারে উদ্ধার করে দিয়েছ।' বার্টির কণ্ঠে বিদ্রূপ। 'সুযোগ পেলে শ্রমিকদের পিষে মারতে কোনদিন কোন কসুর করনি। তাছাড়া সুযোগ তৈরি করে নেবার জন্যেও হেন কাজ নেই যা তোমরা করোনি।'

'না—কক্ষনো না।' সম্মিলিত কণ্ঠ প্রতিবাদে সোচ্চার।

'এই স্যান্ ফ্রান্সিস্‌কোর ড্রাইভারদের স্ট্রাইকের কথাটাই ধরো।' কারুর কথাই কানে নেয় না বার্টি। 'এমপ্লয়ার অ্যাসোসিয়েশান প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে ধর্মঘটীদের প্রথমটায় শান্ত করিয়েছিল। একথা তোমরা সবাই জানো। আমিও জানি, কারণ আমিও এই ঘরটাতেই বসেছি মালিকদের সঙ্গে। তাই সব গোপন পরিকল্পনা আর লড়াইয়ের খবর জানতে আমার কিছু বাকী নেই। প্রথমে তোমরা মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছ, তারপর ডেকে এনেছ মেয়র আর পুলিসের বড় কর্তাকে পিটিয়ে স্ট্রাইক ভাঙতে। ভারী সুন্দর দৃশ্য—তোমাদের মতো মানবহিতৈষীরা ড্রাইভারদের ধরে পেঁদাচ্ছে!'

'দাঁড়াও দাঁড়াও—এখনো আমার কথা শেষ হয়নি। গত বছরেই কলোরাডো থেকে একজন গভর্নর নির্বাচিত হয়েছিল শ্রমিকদের পক্ষ থেকে। তাকে কোনদিনই কার্যভার গ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। কেন দেওয়া হয়নি তোমরা জানো। তোমরা জানো কিভাবে তোমাদের মানবহিতৈষী জ্ঞাতি ভাইয়েরা আর কলোরাডোর পুঁজিপতিরা এই কাণ্ড করেছে। শ্রমিকদের ওপর অত্যাচারের এটা অন্যতম নমুনা। খনি-শ্রমিকদের 'সাউথ ওয়েস্টার্ন অ্যামালগ্যামেটেড অ্যাসোসিয়েশান'-এর সভাপতিকে তোমরা তিন বছর জেলে পুরে রেখেছিলে তার বিরুদ্ধে একটা মিথ্যে হত্যার অভিযোগ এনে। এইভাবে ওই ভদ্রলোককে সরিয়ে দিয়ে এরপর তোমরা ওদের সংগঠনটা চুরমার করে দিয়েছিলে। এটাকে নির্যাতন বলেই স্বীকার করবে নিশ্চয়! আয়করের প্রশ্নে বারবার তিন বার ব্যাপারটিকে সংবিধান বিরোধী ঘোষণা করেও তোমরা নির্যাতন চালিয়েছ। কাজের সময় আট ঘণ্টা করার জন্যে বিল পেশ করলে সেটাকে গত কংগ্রেসে নাকোচ করেও তোমরা অত্যাচার চালিয়েছ।

'তবে তোমাদের সব অত্যাচারের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে দোকান বন্‌ধ্ করার ব্যাপারটা বেআইনী বলে ঘোষণা করায়। 'আমেরিকান ফেডারেশান অফ লেবার'-এর শেষ সভাপতি ফারবুর্গকে তোমরা খরিদ করেছিলে। ফারবুর্গ ছিল তোমাদের অর্থাৎ মালিকশ্রেণীর

অ্যাসোসিয়েশান বা ব্যবসায়ী সংঘের হাতের পুতুল। গত বার স্ট্রাইকের সময় সব দোকান বন্ধ রাখার ডাক দেওয়া হয়েছিল। সেই হরতাল তোমরা ভেঙে দিতে পেরেছিলে ফারবুর্গ বেইমানি করেছিল বলেই। তোমরাই জিতে গেছলে আর এতদিনের পুরোনো 'আমেরিকান ফেডারেশান অফ লেবার' খান্ খান্ হয়ে শেষ হয়ে গেছল। তোমরাই এটি ধ্বংস করেছ এবং সেই সূত্রেই নিজেদের সর্বনাশও ডেকে এনেছ। 'ফেডারেশান অফ লেবার'-এর ধ্বংসস্তূপের ওপরেই গড়ে উঠেছে 'আই এল্ ডব্লু'-এর* সংগঠন। আমেরিকায় আজ অবধি কেউ এত বিশাল আর এরকম সুসংবদ্ধ শ্রমিক সংগঠন ত্যাখেনি। এর সৃষ্টির পিছনেও যেমন তোমাদের হাত আছে ঠিক তেমনি আছে আজকের এই সর্বাত্মক হরতালের পিছনে। তোমরাই এক এক করে সব পুরোনো সংগঠনগুলো ভেঙে তামাম শ্রমিকদের ঠেলে দিয়েছ 'আই, এল্, ডব্লু'-এর মধ্যে, আর এই 'আই, এল্, ডব্লু'ই আজ হরতাল ডেকেছে। তোমাদের লজ্জা করা উচিত যে এর পরেও তোমরা আমার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে বড়াই করছ—শ্রমিকদের তো আমরা কই অত্যাচার করিনি! চমৎকার!'

এবার আর অস্বীকার করার উপায় থাকে না। গারফিল্ড আত্মরক্ষায় এগিয়ে আসে, 'যা করেছি, বাধ্য হয়েই করতে হয়েছে। তা না হলে আর জেতা যায় না।'

'সে কথা তো আমি কিছুই বলছি না। আমার অভিযোগ শুধু এইটাই যে তোমরা আজ হাউমাউ লাগিয়ে দিয়েছো কেন! যে দাওয়াইয়ের স্বাদ আজ তোমরা পাচ্ছো, সে তো তোমাদেরই সৃষ্টি। শ্রমিকদের শুধু খেতে না দিয়ে বিপাকে ফেলে কত হরতালে জয়লাভ করেছ, মনে আছে? শ্রমিকরাও এবার একটা পরিকল্পনা নিয়েছে যাতে তোমাদের খাওয়া বন্ধ করে নতি স্বীকার করাতে পারে।

* ইনটারন্যাশানাল লীগ্ অফ ওয়ার্কার্স

তোমাদের অনাহারে রাখতে পারলে যদি কাজ হাসিল হয়, অনাহারেই থাকতে হবে তোমাদের।'

'কিন্তু ভাই—এত যে সব শ্রমিক নির্যাতনের কথা বললে, তুমিও তো তার থেকে মুনাফা লুঠতে কিছু কসুর করনি!' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ব্রেন্টউড্। কর্পোরেশনের আইনবিদদের মধ্যে সবচেয়ে ধুরন্ধর এই ব্রেন্টউড। 'চোর যেমন বদ্, তেমনি বদ চুরির মাল যে নেয়।' বিদ্রূপ ঝরে ব্রেন্টউডের কথায়। 'শ্রমিক নির্যাতনে তোমার কোন হাত ছিল না কিন্তু নির্যাতনের সুফলগুলো ভোগ করার বেলায় তো কোন দ্বিধা করোনি!'

'প্রশ্নটা কিন্তু তা নয়, ব্রেন্টউড।' বার্টি ধীরে ধীরে বলে। 'তোমারও দেখছি হ্যানোভারের দশা—নীতি নিয়ে টানাটানি করছ। কোনো ভালমন্দের কথা একেবারও তুলিনি কিন্তু। জানি, পুরো ব্যাপারটা একটা জঘন্য খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার বক্তব্য একটাই—আজ মজুররা এক হাত নিয়েছে বলে তোমাদের এত মড়াকান্নার কারণ কী! ওদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে যে মুনাফা পাওয়া গেছে তার থেকে আমিও লাভবান হয়েছি বইকি!' শুধু তাই নয়—নোঙরা কাজগুলো কক্ষনো আমাকে নিজে হাতে করতে হয়নি। আমার হয়ে তোমরাই তা করে দিয়েছ। তা বলে ভেবো না যেন আমি তোমাদের চেয়ে বেশী পুণ্যবান! আসলে আমার বাপ কাকারা অঢেল সম্পত্তি রেখে গেছে বলেই শুধু অর্থের জোরেই এই কাজগুলো আমি করিয়ে নিতে পেরেছি।'

'তুমি যদি আমাদের বিদ্রূপ করতে চাও—' ব্রেন্টউড্ গরম হতে শুরু করে।

'দাঁড়াও—দাঁড়াও—সব গুলিয়ে ফেলো না!' বার্টি বাধা দিল। 'এই চোরেদের আড্ডায় ভণিতা করার কোনো প্রয়োজন নেই। মহান আদর্শ আর বড় বড় কথা—এসব ওই খবরের কাগজ, ছেলেদের আসর আর ইস্কুলেই চলে। কিন্তু দোহাই তোমার, নিজেদের মধ্যে আর এ চাল চেলো না। গত বছর শরৎকালে

রাজমিস্ত্রী ও যোগাড়ে ইত্যাদির হরতালের সময় কী কারবার হয়েছিল, কে অর্থ যুগিয়েছিল, কে কাজ সেরেছিল এবং কে তার থেকে মুনাফা লুটেছিল, একথা তুমি জানো। তুমি এও জানো যে আমিও সব জানি।' (ব্রেণ্টউডের মুখটা আরক্তিম হয়ে ওঠে) 'একই বুরুশ দিয়ে আমরা আলকাতরার পোঁচড়া টেনেছি, কাজেই ন্যায়-অন্যায়ের ব্যাপারগুলোকে নিয়ে মাথা না ঘামানোই সবচেয়ে ভাল। আবার বলছি, খেলতে নেমেছই যখন একটা এস্‌পার ওস্‌পার করে তবে ছেড়ো—কিন্তু তাবলে গায়ে আঁচড় লাগলেই কেঁদে কেটে অস্থির হয়ো না।'

ওদের ওখান থেকে সরে আসার সময়েই শুনলাম বার্টি আবার তার আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে। বর্তমান অবস্থায় গুরুতর দিকগুলোকে চোখে যেন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চায় বার্টি। এখনই তো খাবার-দাবার মেলা ভার হয়ে উঠেছে, এর পর কে কি করবে ভাবছে জানতে চাইছে বার্টি।

কিছুক্ষণ পরে ক্লোকরুমে বার্টির সঙ্গে দেখা হল। বাড়ি ফেরার জন্যে তৈরি হচ্ছে দেখে বললাম, আমার গাড়িতেই চলো, নামিয়ে দিয়ে যাবো।

রাস্তার জনারণ্যের মধ্যে দিয়ে পথ করে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। বার্টি বলে, 'বড় প্যাঁচে ফেলে দিয়েছে এই সাধারণ ধর্মঘটটা। একেবারে কুপোকাত করে দিয়েছে আমাদের। যেই দেখেছে আমরা অসতর্ক অমনি শরীরের একেবারে দুর্বলতম অংশ, পেটটার ওপরেই আক্রমণ চালিয়েছে। বুঝলে সাফ´, আমি স্যান ফ্রান্সিসকো ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আমার পরামর্শ নাও যদি, তুমিও কেটে পড়ো। গ্রামের দিকে চলে যাও—যে কোন জায়গায়। অনেক বেশী সুযোগ পাবে। বেশ কিছু জিনিসপত্র কিনে একটা কুঁড়ে বা চালাঘরের মধ্যে সেঁধিয়ে বসে থাকো। এই শহরে থাকলে আর কয়েক-দিনের মধ্যেই আমাদের মতো লোকের ভাগ্যে অনাহার ছাড়া আর কিছুই জুটবে না।'

ভাবতেই পারছিনা বার্টি মেসনারের কথা ফলতে পারে। আসলে লোককে ভয় দেখানোটা ওর স্বভাব। আমি এখন এখানেই থেকে মজা দেখতে চাই। বার্টিকে নামিয়ে দিয়ে সোজা বাড়ি ফিরলাম না। আরো কিছু খাবার দাবার কিনব ভাবলাম। আশ্চর্য—আজই সকালে যে ছোট ছোট মুদীখানাগুলো থেকে কেনাকাটা করেছি সব বন্ধ হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত ওট্রেরোতে অনুসন্ধান করতে এসে সুফল মিলল। আর এক বাক্স মোমবাতি, দু'বস্তা আটা, দশ পাউণ্ড গ্রাহাম আটা (চাকরদের জন্যে), আর দু'বাক্স টিনের কৌটোয় ভরা টমেটো কিনে নিয়েছি। কোন সন্দেহ নেই যে সাময়িক ভাবে খাদ্যবস্তুর আক্রা দেখা দেবে। এত খাবার মজুত করে ফেলেছি ভাবতেই মনটা খুশী হয়ে ওঠে।

পরের দিন সকালে খাটে বসেই যথারীতি কফি খেলাম। দুধের চাইতেও বেশী অভাব বোধ করছি খবরের কাগজের। পৃথিবীতে কোথায় কি ঘটেছে জানতে না পারাটাই সবচেয়ে বড় কষ্ট আমার কাছে। ক্লাবে গিয়েও তেমন কোন খবরাখবর পেলাম না। ওকল্যাণ্ড থেকে লঞ্চে করে ওপারে গিয়ে পৌঁছেছে রাইডার। হলস্টেড গাড়ি করে স্যান্ জোসে ঘুরে ফিরে এসেছে। ওরা বলছে সব জায়গার অবস্থাই স্যান্ ফ্রান্সিসকোর মতো। হরতালের জন্যে সব কাজ বন্ধ, উচ্চবিত্ত শ্রেণীরা সব কাঁচা বাজার কিনে ফেলেছে। সর্বত্রই প্রকৃত শান্তি বহাল আছে। কিন্তু দেশের অন্যান্য অঞ্চলে কি ঘটছে? শিকাগোয়, নিউইয়র্কে বা ওয়াশিংটনে? খুব সম্ভবত আমাদের এখানে যা ঘটছে ওখানেও তাই ঘটছে। কিন্তু ঘটছে বলে ধরে নিলেই তো হল না, নিশ্চিত ভাবে জানতে না পারলে শান্তি থাকে না।

জেনারেল ফলসমের কাছে একটা খবর পাওয়া গেল। সৈন্য-বাহিনীর লোক বসিয়ে টেলিগ্রাফ অফিস চালু করা হয়েছিল কিন্তু দেখা গেছে সব জায়গায় তার কাটা। এ পর্যন্ত শ্রমিকরা এই একটাই বেআইনী কাজ করেছে বলে জানা গেছে। ব্যাপারটা

যে সুপরিকল্পিত ভাবে ঘটানো হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই জেনারেল ফলসমের। বেনেসিয়ার সৈন্য ঘাঁটি থেকে জেনারেল বেতারেও সংযোগ স্থাপন করেছিলেন। স্যাক্রামেন্টো পর্যন্ত পুরো টেলিগ্রাফ লাইনটা জুড়ে সৈন্যরা তখনো টহল দিচ্ছিল। একবার ক্ষণেকের জন্যে স্যাক্রামেন্টোর সঙ্গে যোগাযোগও হয়েছিল কিন্তু তার পরেই শ্রমিকরা আবার কোথায় তার কেটে দিয়েছিল। ফলসমের যুক্তি হচ্ছে সারা দেশেই এখন টেলিগ্রাফ যোগাযোগ পুনর্স্থাপন করার জন্য চেষ্টা চলছে, তবে তা কতটা সাফল্যমণ্ডিত হবে সে সম্বন্ধে তিনি কিছু মন্তব্য করতে চাননি। ওনাকে সবচেয়ে চিন্তিত করেছে তার কাটার ব্যাপারটা। তিনি সুনিশ্চিত যে শ্রমিকদের গভীর ষড়যন্ত্রের মধ্যে এটি একটি। সরকার এতদিন সময় পেয়েও দেশময় টেলিগ্রাফ স্টেশান বসাবার পরিকল্পনা কার্যকর করতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করলেন জেনারেল।

একের পর এক দিন চলে যায়। একঘেয়ে কাটছে সময়গুলো। কিছুই ঘটছে না। উত্তেজনার ধার ভোঁতা হয়ে গেছে। রাস্তাগুলোয় আর আগের মতো ভিড় নেই। শ্রমিকরা আর শহর অবধি পায়ে হেঁটে এসে আমাদের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিচ্ছেনা। রাস্তায় আগের মতো গাড়ি চলাচল করছে না। সব গ্যারেজ বন্ধ, মেরামতের কোন উপায় নেই। যে কোন গাড়ি একবার খারাপ হলেই অকেজো হয়ে পড়ে থাকছে। আমারও গাড়ির ক্লাচ্‌টা জ্বলে গেছে—পয়সা বা ভালবাসা কোনটা দিয়েই মেরামত করিয়ে নেবার উপায় নেই। আর পাঁচজনের মতো আমিও এখন হেঁটে বেড়াচ্ছি। শবদেহের মতো শুয়ে আছে স্যান ফ্রান্সিসকো। দেশের অন্যান্য অংশে কি ঘটছে জানবার কোনো উপায় নেই আমাদের। তবে জানতে পারছি না বলেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছি যে দেশের অন্যান্য অংশের অবস্থাও এই মৃত স্যান্ ফ্রান্সিসকোরই মতো। মাঝে মধ্যে শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার পড়ে। শ্রমিক সংগঠনের বিবৃতি। বেশ কয়েকমাস আগেই এগুলো ছাপানো হয়েছে। এর থেকেই

বোঝা যায় 'আই এল্ ডব্লিউ' কী নিখুঁত ভাবে হরতালের প্রস্তুতি নিয়েছে। খুঁটিনাটি সব বিষয় নিয়েই আগে থেকে পরিকল্পনা ভাঁজা হয়েছে! এ পর্যন্ত কোন হিংসাত্মক ঘটনা স্থানলাভ করেনি। কয়েক জন শুধু তার কাটার সময় যা সৈন্যদের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। বস্তির লোকেরা কিন্তু অনাহারে আছে এবং বিপজ্জনক ভাবে অস্থির হয়ে উঠছে।

ব্যবসায়ী, কোটিপতি, আর বিভিন্ন পেশার লোকেরা মিটিঙ ডাকছে, বিবৃতি দিচ্ছে, কিন্তু জনসাধারণের কাছে বিবৃতিগুলো পৌঁছে দেবার কোনো উপায় নেই। ছাপবে যে সে পথও বন্ধ। তবে মিটিঙের একটা ফল অবশ্য হয়েছে। জেনারেল ফলসম সমস্ত পাইকারী দোকান আর ধান, চাল, গম ও খাদ্যের সমস্ত গুদাম ঘরগুলি সামরিক বাহিনীর দখলে নিয়ে এসেছেন। সময়োচিত কাজ হয়েছে, কারণ ধনীর গৃহেও খাদ্যসমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে। রেশান ব্যবস্থা চালু করা খুবই প্রয়োজন। আমি জানি আমারও বাড়িতে চাকর-বাকররা মুখ ভার করে ঘুরছে। যত দেখছি তাজ্জব হচ্ছি—ব্যাটারা কত খায়! দিন দিন শুধু ওদের পেট ভরাতেই আমার ভাঁড়ার ফাঁক্ হয়ে যাচ্ছে। আসলে যে যার নিজের জন্যে আলাদা করে খাদ্য মজুত করবে বলে প্রত্যেকটা চাকরই চুরি করতে আরম্ভ করেছে।

এদিকে আবার রেশান ব্যবস্থা চালু করার সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঝামেলা পাকিয়েছে। স্যান ফ্রান্সিসকোর মজুত খাদ্যের পরিমাণ যা তাতে বেশীদিন চলবে না। শ্রমিক সংগঠন তাদের নিজেদের খাদ্য মজুত করে রাখলেও পুরো শ্রমিক শ্রেণী প্রতিদিন রেশনের লাইনে এসে ভিড় জমাচ্ছে। ফলে জেনারেল ফলসমের সংগৃহীত খাদ্য দিন দিন বিপজ্জনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। কে যে ছাপোষা মধ্যবিত্ত, কে 'আই এল ডাব্লিউ'-এর সদস্য আর কেই বা বস্তিবাসী— সৈন্যরা পার্থক্য করবে কি করে? মধ্যবিত্ত আর বস্তিবাসীদের খাওয়াতে হবে, কিন্তু 'আই এল ডব্লিউ'য়ের লোকেদের সঙ্গে ওদের তফাত করবে কি করে? সৈন্যরা তো 'আই এল ডব্লিউ'-এর সবার

মুখ চেনে না, তাদের ছেলে মেয়ে বৌদের তো নয়ই। মালিকদের সহযোগিতায় ইউনিয়ানের কয়েকজন পাণ্ডাকে রেশনের লাইন থেকে তাড়ানো হয়েছে কিন্তু তাতে আর কি হবে! অবস্থা আরো ঘোরালো হয়ে উঠেছে মারে দ্বীপে খাদ্যভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায়। এতদিন সরকারী স্টীমারে করে দ্বীপের সামরিক গুদাম থেকে অ্যাঞ্জেল দ্বীপে তবু খাদ্য সরবরাহ হচ্ছিল। দখল করা খাদ্য থেকে সৈন্যরা এখন তাদের রেশান পাচ্ছে। সবার আগে ওদের দাবি মেটাতে হচ্ছে।

অন্তিম পরিণতি কি হবে সেটা এখন সাদা চোখেও ধরা পড়ছে। হিংসাত্মক ঘটনাবলীর ভয়ঙ্কর মুখটা উঁকিঝুঁকি মারতে আরম্ভ করেছে। আইন ও শৃঙ্খলা ক্রমশই ভেঙে পড়ছে। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, বস্তিবাসী আর উঁচুতলার মানুষই তার জন্যে দায়ী। সংগঠিত শ্রমিকরা এখনো শান্তি-শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভাবেই বজায় রেখেছে। আর রাখবে নাই বা কেন, তাদের পেটে তো আর টান্ ধরেনি। সেদিন সন্ধ্যেবেলা ক্লাবে ঢুকে দেখি হল্স্টেড আর ব্রেন্টউড এক কোণে বসে ফিসফিস করছে। আমাকেও ওরা দলে টেনে নিল। ব্রেন্টউডের গাড়িটা এখনো সচল আছে। ঠিক হল আমরা গরু চুরি করে আনবো। হলস্টেডের কাছে একটা লম্বা ছুরি আর কাটারি আছে। শহরতলীর দিকে চলে এলাম আমরা। এধারে ওধারে অনেক গরু চরছে কিন্তু পাহারাদারদের ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা শহরের কিনারা বরাবর আরো পূর্ব দিকে এগিয়ে চলি। হান্টার্স পয়েন্ট-এর নিকটবর্তী পাহাড়গুলোর কাছে পৌঁছে আমাদের অনুসন্ধান সফল হল। একটি বাচ্চা মেয়ে গরু চরাচ্ছে। গরুটার সঙ্গে একটা বাছুরও রয়েছে। কোনো ভূমিকার পিছনে সময় খরচ না করে আমরা সরাসরি কাজে হাত লাগাই। মেয়েটি ভয়ের চোটে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট্ লাগায়। আমরা গরুটাকে কেটে ফেলি। বিশদ বিবরণের মধ্যে আর যাচ্ছি না কারণ ব্যাপারটা অত্যন্ত নোংরা আর এরকম কাজে আমরা একেবারেই আনাড়ী।

ভয়ের চোটে তাড়াহুড়ো করে মাংস কেটে টুকরো করছি, এমন সময় পিছন থেকে একটা হল্লা কানে এল। মাথা ফেরাতেই দেখি একদল লোক ছুটে আসছে। মাংস কাটা মাথায় উঠল। আমরা প্রাণপণ দৌড় লাগালাম। একটু বাদেই অবাক হয়ে দেখলাম কেউ আমাদের পিছু ধাওয়া করেনি। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি লোকগুলো গরুটাকে কাটতে ব্যস্ত। ওদেরও আমাদেরই মতো একই ধান্দা। নিজেদের মধ্যে কথা বলে বুঝলাম, যা মাংস আছে তা সবাই মিলে ভাগ করে নিলেও প্রত্যেকেই প্রচুর পাবে। আবার ছুটে ফিরে গেলাম। এমন হাতাহাতি মারামারি লেগে গেল এবার, সে আর কহতব্য নয়। ব্রেনটন একটা আস্ত পশু—আঁচড়ে কামড়ে খিমচে চেঁচিয়ে মাত করে দিচ্ছে। ভাগের মাল না দিলে খুন করবে বলে শাসাচ্ছে।

আমরা হয়তো বরাদ্দ মাফিক বেশ কিছু মাংস পেয়ে যেতাম কিন্তু অকুস্থলে আবার দৃশ্য পরিবর্তন ঘটল। 'আই এল ডব্লিউ'য়ের শান্তি বাহিনীর কড়া মেজাজের অফিসাররা এসে হাজির হয়েছে। ছোট মেয়েটাই ওদের ডেকে এনেছে। প্রত্যেকের হাতে চাবুক আর মুগুর, সংখ্যায়ও ওরা কম নয়। বাচ্চা মেয়েটা অঝোরে কাঁদছে আর প্রচণ্ড রাগে তিড়িঙ বিড়িঙ করে নাচতে নাচতে চেঁচাচ্ছে—'মারো না! মারো! ওই যে চশমা-পরাটা—ওইটাই তো সবচে' পাজী! মুখটা থেঁতলে দাও! মেরে থেঁতলে দাও!' চশমা পরা লোকটা আর কেউ নয় আমি। মার খেলাম ঠিকই তবে বুদ্ধি করে শেষ মুহূর্তে চশমাটা খুলে নিয়েছিলাম। বাপরে কী মার্! মার খেতে খেতেই সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আমরা তিনজনে ছুট লাগালাম গাড়ির দিকে। ব্রেন্টউডের নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে আর হলস্টেডের গাল কালো সাপের চাবুকের ঘায়ে কেটে লাল হয়ে গেছে।

তাড়া খেয়ে গাড়ির কাছে পৌঁছে আবার অবাক হবার পালা। ভীত বাছুরটা কখন পালিয়ে এসে গাড়ির পিছনে লুকিয়ে বসে

আছে। ব্রেন্টউড আমাদের সতর্ক হবার জন্য ইঙ্গিত করেই নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল বাছুরটার ওপর। ছুরিটা ফেলে এসেছি আমরা, কিন্তু ব্রেন্টউড তবু হার মানার পাত্র নয়। দু' হাতে বাছুরটাকে জাপটে তার টুঁটি টিপে মাটির ওপর লুটোপুটি খেতে লাগল। দম বন্ধ করে বাছুরটাকে মেরে গাড়ির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ওটার ওপর একটা কাপড় চাপা দিয়ে আমরা শহরের দিকে রওনা হলাম। কিন্তু নিশ্চিন্ত হওয়া আমাদের কপালে নেই। একটা টায়ার ফেটেছে। সারাবার কোন উপায় নেই, ওদিকে অন্ধকারও ঘনিয়ে আসছে। গাড়ির মায়া পরিত্যাগ করতে হল। ব্রেন্টউড কাপড় মোড়া বাছুরটাকে কাঁধের ওপর ফেলে টলমল করে হাঁপাতে হাঁপাতে এগোচ্ছে, আমরা তার পিছু পিছু। কিছুক্ষণ অন্তর বাছুরটাকে আমরা পালা করে কাঁধ বদল করছি। প্রাণঘাতী পরিশ্রম। এরমধ্যে আমরা আবার পথও হারিয়েছি। বেশ কয়েক ঘণ্টা এধার ওধার বেফায়দা ঘোরার পর হঠাৎ একদল গুণ্ডার মুখোমুখি পড়ে গেলাম। এরা 'আই এল ডব্লুউ'-এর লোক নয়, মনে হয় এরাও আমাদেরই মতো ক্ষুধার্ত। সে যাইহোক বাছুরটা ওরাই পেল আর আমাদের জুটল পিটুনি। বাড়ি ফেরা ইস্তক ব্রেন্টউড সারা রাস্তাটা পাগলের মতো গজরেছে। ওকে দেখাচ্ছেও পাগলেরই মতো—ছেঁড়াখোঁড়া জামা, নাক ফুলে গেছে, চোখের কোণে কালশিরে।

এরপর আর গরুচুরির ঘটনা ঘটেনি। জেনারেল ফলসম তাঁর সৈন্য পাঠিয়ে সব গরু অধিগ্রহণ করে নিয়েছেন। যা মাংস পাওয়া গেছল তাঁর বাহিনীর লোকেরাই প্রায় পুরো সাবাড় করে দিয়েছে। জেনারেল ফলসমকে দোষ দেওয়া যায় না। আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখাই তাঁর কাজ আর সেই কাজ তাঁকে সৈন্যদের সাহায্য নিয়েই পালন করতে হয়। কাজেই সবার আগে সৈন্যদের খাবার ব্যবস্থা করতে তিনি বাধ্য।

ঠিক এই সময় নাগাদ সাংঘাতিক ভয় গ্রাস করল উচ্চবিত্ত শ্রেণীকে। তারা দলে দলে শহর ছেড়ে পালাতে শুরু করেছে।

সংক্রামক ব্যাধির মতো বস্তিবাসীরাও একই ভয়ের শিকার হয়েছে, তারাও এবার পালাচ্ছে। জেনারেল ফলসম খুব খুশী। অনুমান করা হচ্ছে প্রায় দু' লক্ষ লোক স্যান ফ্রান্সিসকো ত্যাগ করেছে। কাজেই জেনারেলের খাদ্য সমস্যাও অনেকটা কমেছে। আজকের কথা আমি কোনদিন ভুলব না। সকালে উঠে এক টুকরো যা পাঁউরুটি চিবিয়েছিলাম। সারাটা বিকেলই কেটেছে রেশনের লাইনে। সন্ধ্যে হতে তবে বাড়ি ফিরছি। ক্লান্ত বিরক্ত অসহায় অবস্থা—এক কোয়ার্ট চাল আর এক টুকরো বেকন জুটেছে। বাড়িতে ঢুকতেই দরজার মুখে ব্রাউনের সঙ্গে দেখা। ওর চোখমুখ বসে গেছে, মুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। জানতে পারলাম সব কটা চাকর বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। একা ওই যা আছে। ওর বিশ্বস্ততা আমায় বিচলিত করে। সারাদিন কিচ্ছু খাওয়া হয়নি শুনে আমার খাবারটা ওর সঙ্গে সমান ভাবে ভাগ করে নিলাম। ভাত আর বেকনের অর্ধেকটা শুধু আজকের জন্যে রান্না হয়েছে। বাকীটা রেখে দেওয়া হয়েছে কাল সকালের জন্যে! খিদে পেটে নিয়েই শুতে গেলাম—সারারাত অস্থির ভাবে ছটফট করে কাটল। সকালে উঠে দেখি ব্রাউন আমাকে পরিত্যাগ করেছে, শুধু তাই নয়, চাল আর বেকনের অবশিষ্টটুকুও সে হাতসাফাই করেছে।

মাত্র দু' চার জন বিষণ্ণ মুখে ক্লাবে এসেছে দেখছি আজ সকালবেলা। একটাও বেয়ারা নেই। ফাইফরমাশ খাটার কোনো লোক নেই। লক্ষ্য করলাম রূপোর সব জিনিসপত্রগুলো লোপাট হয়ে গেছে। কোথায় গেছে তাও জানতে পারলাম। না, বেয়ারারা সরায়নি। ক্লাবের সদস্যদেরই কীর্তি। জিনিসগুলোর সদ্‌গতি করতেও কোনো বেগ পেতে হয়নি। মার্কেট স্ট্রীটের দক্ষিণ প্রান্তে 'আই এল ডব্লিউ-'দের ঘরনীরা পেটভরে দু' মুঠো খেতে দিয়েই হাত করে নিয়েছে জিনিসগুলো। ব্যাপার দেখে তখুনি বাড়ি ফিরে এলাম। আমারও সব রূপোর জিনিস উধাও। একটাই যা বিরাট আকারে কলসি

রয়েছে। কলসিটা কাগজে মুড়ে মার্কেট স্ট্রীটের দিকে পা বাড়ালাম।

কলসির বদলে পেটপুরে খেয়ে সুস্থ বোধ করলাম। আবার ক্লাবে এসে ঢুকলাম কোনো নতুন খবরা-খবর আছে কিনা জানতে। হ্যানোভার, কলিন্স ও ডাকন্ সবে বেরোতে যাচ্ছিল, আমায় দেখে বলল, ভেতরে কেউ নেই, ইচ্ছে করলে আমিও ওদের দলে যোগ দিতে পারি। ওরা ডাকনের ঘোড়ায় চেপে শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আমার জন্যেও একটা বাড়তি ঘোড়া জুটতে পারে। ডাকনের চারটে অসাধারণ গাড়ি-টানা ঘোড়া আছে। এগুলোকে ও হাতছাড়া করতে চায়না। জেনারেল ফলসম বন্ধু হিসেবে আগেই জানিয়ে দিয়েছেন যে শহরে যেখানে যত ঘোড়া আছে কাল খাদ্য হিসেবে কেড়ে নেওয়া হবে। অবশ্য শহরে ঘোড়ার সংখ্যা বেশী নয়, লোকে হাজার হাজার ঘোড়া গ্রামাঞ্চলে ছেড়ে দিয়ে এসেছে খড় আর দানার আক্রা দেখা দিতেই। তিনশ ড্রে-ঘোড়া ছিল বার্ডলের। সব ছেড়ে দিয়েছে। এই ঘোড়াগুলোর গড়পড়তা দর পাঁচশ' ডলার। কাজেই প্রায় এক লাখ পঞ্চাশ হাজার ডলার ক্ষতি হয়ে গেছে। বার্ডল ভেবেছিল পরে ঘোড়াগুলোকে উদ্ধার করতে পারবে। কিন্তু তা আর হবার নয়। স্যান্ ফ্রান্সিসকো থেকে পলাতকরাই সব কটাকে কেটেকুটে খেয়ে ফেলেছে। সামরিক বাহিনীতেও এখন খাদ্যের যোগান দিতে ঘোড়া আর খচ্চর বধ শুরু হয়ে গেছে।

ডাকনের ভাগ্য ভাল তার আস্তাবলে প্রচুর খড় আর দানা মজুত ছিল। কোনক্রমে আমরা ঘোড়ার পিঠে চারটে জিন চড়িয়ে নিলাম। ঘোড়াগুলো বেশ তেজীই আছে দেখছি। অবশ্য এদের পিঠে কখনো লোক চড়েনি। ঘোড়া করে স্যান্ ফ্রান্সিসকোর রাস্তা দিয়ে যেতে যেতেই আমার মনে পড়ে গেল সেই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের দিনগুলোর কথা। তবে আজকের স্যান ফ্রান্সিসকোর চেহারা তার চেয়ে ঢের বেশী করুণ। প্রাকৃতিক অভিসম্পাত আজকের এই দুর্দশার কারণ নয়। শ্রমিক ইউনিয়নের অত্যাচারেই এমনটা

হয়েছে। ইউনিয়ান স্কোয়ার পিছনে ফেলে আমরা থিয়েটার হোটেল আর বাজার এলাকার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। খাঁ খাঁ করছে রাস্তাগুলো। এখানে ওখানে পড়ে রয়েছে গাড়িগুলো —যখন যেখানে যেটা খারাপ হয়েছে বা তেল ফুরিয়েছে। জীবনের কোন চিহ্ন নেই কোথাও, শুধু ব্যাঙ্ক বা সরকারী ভবনের সামনে যা দু' চারটে করে পুলিশ বা সৈন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। হঠাৎ এক 'আই এল ডব্লিউ'য়ের লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দেওয়ালে তাদের নতুন বিবৃতি সাঁটছে। কি লিখেছে দেখতে দাঁড়িয়ে পড়লাম—'আমরা সুশৃঙ্খল ভাবে হরতাল পালন করছি। শেষ অবধি আমরা এই শৃঙ্খলা বজায় রাখবো। আমাদের দাবী মিটলেই হরতাল শেষ হবে। তবে আমাদের মালিকরা না খেতে পেয়ে যতক্ষণ না নতি স্বীকার করছে ততক্ষণ দাবী মিটবে না। একদিন আমরাও এমনি ভাবে না খেতে পেয়ে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি।'

'মেস্‌নারও এই একই কথা বলেছে।' কলিন্‌স্ বলল। 'আমি তো বাবা এখুনি নতি স্বীকাব করতে রাজী কিন্তু ওরা কী সে সুযোগ দেবে! কতদিন যে পেটপুরে খাইনি, ওহ্! ঘোড়ার মাংস খেতে কেমন কে জানে!'

আবার আমরা দাঁড়িয়ে পড়েছি আরেকটা পোস্টার পড়তে, 'আমরা যখন মনে করবো যে মালিকরা নতি স্বীকার করতে রাজী, টেলিগ্রাফ লাইন আবার চালু করে দেবো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মালিকদের সংগঠনগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেওয়া হবে। তবে একমাত্র শান্তি ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্যেই টেলিগ্রাফ ব্যবহার করতে দেওয়া হবে।'

আমরা আরো এগিয়ে যাই। মার্কেট স্ট্রীট পেরিয়ে কিছুদূর যেতেই শ্রমজীবী অঞ্চল। এখানকার রাস্তাঘাট নির্জন নয়। কোথাও গেটের ওপর ঝুঁকে, কোথাও রাস্তায় দল বেঁধে জটলা করছে আই এল ডব্লুউ-এর লোকেরা। স্বাস্থ্যবান হাসিখুশি বাচ্চারা খেলা নিয়ে মেতে আছে। মোটাসোটা গিন্নীরা সদর দরজার সামনে সিঁড়িতে বসে গল্প-গুজব

করছে। প্রত্যেকে যেন রসিয়ে রসিয়ে দেখছিল আমাদের। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আমাদের পিছনে পিছনে ছুটছে, 'ও দাদা—ও দাদা—খিদে পায়নি, খিদে?' একটি মা বুকে করে শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছিল, ডাকন্‌কে ডেকে বলল, 'ওরে মোটা তোর ঘোড়াটা আমায় দিবি? পেটপুরে খাইয়ে দেবো। হ্যাম আর আলু, জেলি মাখানো পাঁউরুটি, টিনের মাখন, দু' দু'কাপ কফি।'

'আচ্ছা, একটা জিনিস লক্ষ্য করছো?' হ্যানোভার আমাকে প্রশ্ন করল, 'গত ক'দিন রাস্তায় একটা কুকুর অবধি চোখে পড়েনি।'

ব্যাপারটা আমিও লক্ষ্য করেছি কিন্তু চিন্তা করে দেখিনি। এই অভিশপ্ত শহর ছেড়ে এখুনি পালিয়ে যাওয়া উচিত। শেষ পর্যন্ত স্যান ব্রুনো রোডে এসে পড়লাম। দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলেছি। মেন্‌লো গ্রামে আমার একটা বাড়ি আছে। সেইটাই আমাদের লক্ষ্য। ক্রমে ক্রমে আমরা আবিষ্কার করছি যে গ্রামের অবস্থা শহরের চেয়েও খারাপ, অনেক বেশী বিপজ্জনক। শহরে সৈন্য ও আই এল ডব্লুউয়ের লোকেরা শান্তি বজায় রেখেছে, এখানে কিন্তু একেবারে অরাজক অবস্থা। দু'লক্ষ লোক স্যান ফ্রান্সিসকো ছেড়ে পালিয়ে এসেছে দক্ষিণে। চাক্ষুষ দেখছি তাদের পলায়ন প্রায় পঙ্গপালের মতো স্বাক্ষর রেখে গেছে সর্বত্র। সব কিছু একেবারে লুঠেপুটে সাফ করে দিয়েছে। ডাকাতি মারপিট কোনটাই বাদ নেই। রাস্তার ধারে এখানে ওখানে পড়ে আছে লাশ। অগ্নিদগ্ধ খামার বাড়িগুলোর শুধু মসীলিপ্ত অবশেষ চোখে পড়ছে। বেড়াগুলো ভেঙে নুয়ে আছে, হাজারো মানুষের পায়ে পিষ্ট হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে শস্য। শাক-সবজির বাগানে যা ছিল সব উপড়ে নিয়েছে ক্ষুধার্ত-মানুষের পাল। মুরগী বা পালিত পশুর বংশ উজাড় হয়ে গেছে। স্যান্ ফ্রান্সিসকো থেকে নির্গত প্রত্যেকটি প্রধান সড়কেরই এই একই অবস্থা। এখানে ওখানে, বড় রাস্তা থেকে দূরে, কিছু কিছু চাষী গাদা বন্দুক আর রিভলবারের জোরে তাদের সম্পত্তি টিকিয়ে রেখেছে এখনো। ওরা আমাদের কাছে ঘেঁষতে বারণ করে বারবার সতর্ক করে দিয়েছে।

যা কিছু ক্ষয়ক্ষতি বা হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে সবই বস্তিবাসী আর উচ্চবিত্ত শ্রেণীদের কীর্তি। আই এল ডব্লু-এর লোকেদের খাবারের অভাব নেই তাই তারা শহরে নিজেদের বাড়িতেই শান্তিতে দিন কাটাচ্ছে।

বেলা বাড়ার আগেই আমরা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম অবস্থা কী পরিমাণ দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। ডান দিক থেকে আর্তনাদ আর রাইফেল গর্জনের আওয়াজ পেলাম। বুলেটগুলো বিপজ্জনক ভাবে আমাদের গা ঘেঁষে বেরিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার ধারে ঝোপগুলো হঠাৎ কেঁপে উঠল, একটা কালো রঙা অপূর্ব সুন্দর গাড়ি-টানা ঘোড়া রাস্তা পেরিয়ে আমাদেরই চোখের সামনে দিয়ে ছুটে পালাল। এক পলকেই দেখেছি ঘোড়াটার পা থেকে রক্ত ঝরছে। ঘোড়াটার পিছনে তাড়া করছে তিনটি সৈন্য। রাস্তার বাঁ দিকে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে ঘোড়া ধরার চেষ্টায় ওরা ছোটাছুটি করছে। শুনতে পাচ্ছি ওরা একে অন্যকে ডাকছে। রাস্তার ডান দিক থেকে এবার আরেকটি সৈন্য খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এসে একটা পাথরের টুকরোর ওপর বসে মুখের ঘাম মুছতে শুরু করে।

লোকটি দেঁতো হেসে আমাদের দিকে তাকিয়ে একটা দেশলাই চায়। ডাকন্ জিগোস করে, 'কি খবর হে?' লোকটা জানায় যে আধা-সামরিক বাহিনীর লোকেরা সব পালাচ্ছে। 'কোন খাবার নেই।' আমাদের বোঝাতে শুরু করে লোকটি। 'যা খাবার আছে শুধু পুরো দস্তুর সামরিক বাহিনীর লোকেদেরই দিচ্ছে।' আরো শুনলাম আল্‌কাটরাজ দ্বীপ থেকে সামরিক বন্দীদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাদের খাদ্য যোগাড় করা যাচ্ছে না বলে। রাস্তায় একটা মোড় নেবার পর অকস্মাৎ যে দৃশ্যটি এবার দৃষ্টিগোচর হল তা কোনদিন ভোলবার নয়। মাথার ওপর বড় বড় গাছের ডাল পাতাগুলো নুয়ে তোরণ সৃষ্টি করেছে। শাখা প্রশাখার মধ্যে দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঝরছে সূর্য কিরণ। প্রজাপতি ডানা নেড়ে বেড়াচ্ছে-এদিকে সেদিকে, মাঠ থেকে ভেসে আসছে লার্ক পাখির গান আর রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে

রয়েছে বিরাট একটা ট্যুরিঙ গাড়ি। গাড়ির ভেতরে এবং বাইরে এধার ওধার ছড়িয়ে রয়েছে কতকগুলো শবদেহ। দেখলেই বোঝা যাচ্ছে কী ঘটেছে। গাড়ির যাত্রীরা শহর থেকে পালাবার পথে বস্তিবাসী গুণ্ডাদের শিকার হয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই যা কিছু ঘটেছে। আক্রমণের কারণটা সদ্য খোলা মাংস আর ফলের টিন দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ডাকন্ মৃতদেহগুলো পরীক্ষা করে দেখতে এগিয়ে যায়।

'যা ভেবেছিলাম!' বলে উঠল ডাকন্। 'আমিও এই গাড়িতে চড়েছি। পেরিটনের গাড়ি—পুরো পরিবার সাবাড় হয়ে গেছে। এখন থেকে আমাদের সতর্ক হয়ে যাওয়া উচিত।'

'কিন্তু আমাদের কাছে তো আর খাবার নেই যে আক্রমণ করবে।' আমি একমত হলামনা।

আমি যে ঘোড়াটায় চড়ে রয়েছে সেটার দিকে আঙুল তুলল ডাকন্। এবার বুঝতে পেরেছি ও কী বলতে চায়।

সকাল বেলাই ডাকনের ঘোড়ার একটা নাল খুলে গেছল। ঘোড়ার নরম পায়ের খুরটা কেটে দু' টুকরো হয়ে গেছে। দুপুর থেকেই খোঁড়াতে শুরু করে ঘোড়াটা। ডাকন্ আর ঘোড়ার পিঠে চড়তে রাজী হয় না। ঘোড়াটা ছেড়ে যেতেও সে নারাজ। আমাদের এগিয়ে যেতে বলে। ও হেঁটে হেঁটেই ঘোড়াটাকে টেনে নিয়ে আসবে আমাদের বাড়িতে। সেখানেই দেখা হবে। এরপর আর ডাকনের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি, তার শেষ খবরটাও জানতে পারিনি।

একটা নাগাদ আমরা মেনলো শহরে এসে পৌঁছলাম। শহর না বলে অঞ্চল বলাই ভাল কারণ সবই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। চার দিক জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে মানুষের লাশ। শহরের ব্যবসায়িক অঞ্চল এমন কি আবাসিক অঞ্চলগুলো পর্যন্ত অগ্নিদগ্ধ। দু' একটা বাড়ি যাও বা এদিক ওদিক এখনো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে কার সাধ্য তার ধারে কাছে ঘেঁষে। একটু কাছে গিয়ে পড়লেই গুলি চালাচ্ছে। একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা হল। তিনি তাঁর পোড়া বাড়ির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ধোঁয়া অগ্রাহ্য করে জিনিসপত্র

খুঁজছেন। ওনার কাছেই শুনলাম যে প্রথম আক্রান্ত হয়েছিল দোকানগুলো। কথা শুনতে শুনতেই যেন স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পাই রাশি রাশি ক্ষুধার্ত, বিক্ষুব্ধ, হল্লাবাজ মানুষ, সংখ্যালঘু শহরবাসীর ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে। কোটিপতি আর নিঃসম্বল মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই চালিয়েছে খাদ্যের জন্যে, তারপর খাদ্য সংগ্রহ হলে আবার লড়াই বেধেছে নিজেদের মধ্যে। জানতে পারলাম পালো আল্টো শহর ও স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়েরও একই হাল হয়েছে। যে দিকেই চোখ মেলি না আমাদের সামনে এখন শুধু জনশূন্য নিষ্ফলা প্রান্তর। হায়রে—আমরা কিনা এতক্ষণ দেশের বাড়ি, দেশের বাড়ি ক'রে উৎফুল্ল হয়েছি! এখান থেকে তিন মাইল দূরে পশ্চিমের নিম্ন পর্বতমালার প্রথম সারির পাদদেশে আমার বাড়ি!

আমরা ঘোড়ায় চড়ে এগোতে এগোতেই দেখছি ধ্বংসলীলা শুধু প্রধান সড়কের আশেপাশেই সীমাবদ্ধ নেই। পলাতক জনতার অগ্রণী অংশ সড়ক ধরে এগিয়েছে আর লুণ্ঠতরাজ চালিয়েছে ছোট ছোট শহরগুলোর ওপর। কিন্তু এদের পর যারা এসেছে, সারা গ্রামাঞ্চল জুড়েই তারা অভিযান চালিয়েছে। বিরাট একটা ঝাঁটা বুলিয়ে সব যেন ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেছে। সিমেন্ট কংক্রিটের পাকা বাড়ি বলে আমাদেরটা আগুনে পোড়েনি, কিন্তু বাড়িতে জিনিস বলতে কিছু আর নেই। উইণ্ডমিলের মধ্যে মালির মৃতদেহটা আবিষ্কার করলাম। চারধারে ছড়িয়ে রয়েছে বন্দুকের শূন্য টোটা। আপ্রাণ লড়েছে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু ইটালিয়ান মজুর দু'টোকে দেখতে পাচ্ছি না, বাড়ির মহিলা-রক্ষক বা তার স্বামীরও কোনো পাত্তা নেই। গরু, বাছুর, ঘোড়া, ভাল-জাতের অত হাস মুরগী—কোনো প্রাণের চিহ্ন নেই কোথাও। রান্নাঘর আর ফায়ার প্লেস একেবারে নোঙরা হয়ে রয়েছে। লুণ্ঠনকারীরা এখানে রান্নাবান্না করেছে। বাইরেও বাগানে বহু অগ্নিকুণ্ডের চিহ্ন রয়েছে দেখছি। বোঝা যাচ্ছে অগুন্তি লোক এখানে খাওয়া দাওয়া সেরে রাত কাটিয়েছে। যা

খেয়ে শেষ করতে পারেনি, যাবার সময় নিয়ে চলে গেছে। আমাদের জন্যে এক মুঠোও রেখে যায়নি।

সারাটা রাত আমরা বৃথাই ডাকনের অপেক্ষায় বসে কাটিয়ে দিলাম। সকাল না হতেই জনা কয়েক দুর্বৃত্ত হানা দিল। রিভলবার চালিয়ে হতভাগাদের তাড়ান হল। এবার আমরা ডাকনের একটা ঘোড়াকে জবাই করলাম। নিজেরা যতটুকু পেরেছি খেয়েছি, বাকীটা সযত্নে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ভবিষ্যতের জন্যে। বিকেল বেলা কলিন্স পায়চারি করে আসি বলে বেরোল। কিন্তু বেরোল তো বেরোলই, সে আর ফিরল না। হ্যানোভার আর সহ্য করতে পারছে না, এই মুহূর্তেই এখান থেকে পালাতে চায়। কোনরকমে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সকাল বেলা অবধি অপেক্ষা করার জন্যে রাজী করাতে পেরেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস দেশজোড়া হরতাল এবার সমাপ্তির মুখে, আমি ফের স্যান্ ফ্রান্সিসকোতেই ফিরে যেতে চাই। সকাল বেলায় আমরা জুটি ভেঙে বিদায় নিলাম। হ্যানোভার দক্ষিণের দিকে যাচ্ছে আর আমি চলেছি উত্তরে। আমাদের দু'জনেরই ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বাঁধা আছে পঞ্চাশ পাউণ্ড ক'রে ঘোড়ার মাংস। ছোট্ট খাট্ট চেহারার হ্যানোভার যে শেষ পর্যন্ত টিকে গেছল সে কথা পরে জানতে পেরেছি, আর সেইসঙ্গে এও বুঝেছি যে যতদিন হ্যানোভার বাঁচবে তার জীবনের এই অভিযানের কাহিনী শুনিয়ে লোককে সে অবিরাম অধৈর্য ও উত্যক্ত করবে।

ফিরতি পথে বেলমণ্ট পর্যন্ত আসার পর আমার মাংসটুকু লুঠ করে পালাল মিলিশিয়ার তিন সৈনিক। ওদের মুখে শুনলাম, অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি বরং আরো খারাপের দিকেই গেছে। আই এল ডব্লুউ যে পরিমাণ খাদ্য গোপনে মজুত করে রেখেছে তাতে তাদের মাস কেটে যাবে। বাডেন অবধি কোন রকমে এসে পৌঁছবার পর জনা বারো লোকের আক্রমণে ঘোড়াটাও খোয়াতে হল। এদের মধ্যে দু'জন স্যান ফ্রান্সিসকোর পুলিশ আর বাকীরা সামরিক বাহিনীর স্থায়ী সৈন্য। অত্যন্ত অলক্ষুণে ব্যাপার বলতে

হবে। সামরিক বাহিনীর স্থায়ী সৈন্যরা যখন পালাতে আরম্ভ করেছে অবস্থা নিশ্চয় গুরুতর। আমি আবার হাঁটতে শুরু করার আগেই দেখি ওরা আগুন জ্বেলে ফেলেছে। ডাকনের শেষ ঘোড়াটাও ওদের হাতে জবাই হয়ে পড়ে রয়েছে রাস্তার ওপর।

ভাগ্য মন্দ হলে যা হয়, দক্ষিণ স্যান ফ্রান্সিসকোয় পৌঁছে গোড়ালিটা মচকাল। আর এগোনোর প্রশ্নই ওঠে না। সারাটা রাত শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে আর জ্বরে ধুঁকতে ধুঁকতে একটা বাড়ির বারান্দায় শুয়ে কাটাতে হল। দু' দুটো দিন ওখানেই শুয়ে কাটিয়ে দিলাম। এত অসুস্থ যে নড়তে পারিনি। শেষ পর্যন্ত তৃতীয় দিন একটা লাঠি যোগাড় করে তার ওপর ভর রেখে টলমলে পায়ে স্যান্ ফ্রান্সিসকোর দিকে রওনা হলাম। অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছি, গত তিন দিন মুখে খাবারটি ঠেকাতে পারিনি। সারাটা দিন যেন দুঃস্বপ্নের ঘোরে কেটেছে। সারাটা রাস্তা শুধু শয়ে শয়ে সৈন্য, পুলিশ আর তাদের পরিবারকে দেখেছি একসঙ্গে জোট বেঁধে স্যান ফ্রান্সিসকো ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

শহরে ঢুকেই মনে পড়ে গেল সেই মজদুর বাড়ির কথা, যেখানে রূপোর কলসিটা বেচে পেটপুরে খেয়েছিলাম। খিদের চোটে আমার পাদুটোই আমাকে সেই বাড়িটার দিকে টেনে নিয়ে চলল। জায়গাটায় পৌঁছলাম যখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। গলিটা পেরিয়ে বাড়ির পিছনের সিঁড়ি বেয়ে কোনক্রমে হামাগুড়ি দিয়ে খানিকটা উঠেই লুটিয়ে পড়লাম। তার আগেই অবশ্য লাঠিটা বাড়িয়ে দরজায় একটা আঘাত করেছি। এর পরেই নিশ্চয় আমি অজ্ঞান হয়ে গেছলাম। জ্ঞান ফিরে দেখলাম আমি ওদের রান্নাঘরে রয়েছি, চোখমুখ জলে ভেজা, মুখে কে যেন হুইস্কি ঢেলে দিচ্ছে। বিষম খেয়ে খানিকটা হুইস্কি ছিটিয়ে আমি কথা বলতে চাই। বলতে শুরু করেছিলাম যে আমার কাছে এখন রূপোর কলসি নেই কিন্তু আজ যদি দু' মুঠো খেতে পাই পরে ঠিক পাওনা মিটিয়ে দেবো। গৃহকর্ত্রী আমার কথার মাঝখানে বাধা দিলেন।

'আরে বোকা—খবর শোনোনি? আজই বিকেলবেলা তো হরতাল তুলে নেওয়া হয়েছে। খেতে দেবো না কেন!'

ভদ্রমহিলা দ্রুত পায়ে ঘরময় ঘুরে রান্নার ব্যবস্থা করছে। টিন থেকে বেকন বার করেছেন ভাজবেন বলে।

'দেরী করবেন না, আগে আমায় একটু কিছু খেতে দিন।' কাতর ভাবে ভিক্ষা চাইলাম। এক টুকরো পাঁউরুটির ওপর কাঁচা বেকন চড়িয়ে গোগ্রাসে গিলতে গিলতে ভদ্রমহিলার স্বামীর মুখে শুনলাম, আই এল ডব্লিউয়ের দাবি-দাওয়া মঞ্জুর হয়েছে। বিকেলের মুখেই টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা চালু হয়েছে এবং সর্বত্রই মালিক সংঘ নতি স্বীকার করেছে। স্যান ফ্রান্সিসকোয় আর কোন মালিক অবশিষ্ট ছিল না, কিন্তু মালিকদের হয়ে জেনারেল ফলসম কথা বলছেন। কাল সকাল থেকেই ট্রেন আর স্টীমার চলাচল শুরু হবে, অন্যান্য কাজকর্মও যত শীঘ্র সম্ভব, যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হলেই শুরু হয়ে যাবে।

সর্বাত্মক হরতাল শেষ হয়েছে। ইহ জীবনে আর দ্বিতীয় হরতাল দেখতে চাইনা। যুদ্ধের চেয়েও ঢের ভয়াবহ এই হরতাল! অত্যন্ত নিষ্ঠুর আর নীতিবর্জিত একটা ব্যাপার। মানুষকে মাথা খাটিয়ে আরো সুষ্ঠু যুক্তিযুক্ত উপায়ে কলকারখানা পরিচালনা করতে হবে। হ্যারিসন এখনো আমার গাড়ি চালাচ্ছে। এটা আই-এল ডব্লিউ আরোপিত শর্তের মধ্যে অন্যতম—তাদের প্রতিটি সদস্যকে পুরোনো পদে পুনর্বহাল করতে হবে। ব্রাউন আর ফিরে আসেনি, কিন্তু বাদবাকী সব চাকররাই আমার কাছে ফিরে এসেছে। ওদের আর ছাঁটাই করতে পারিনি প্রাণে ধরে, বেচারারা অত্যন্ত বিপাকে পড়েছিল বলেই রুপোর জিনিসপত্র আর খাবার নিয়ে পালিয়েছিল। তাছাড়া ওদের তো আর এখন ছাঁটাই করার উপায়ও নেই। আই এল ডব্লিউ সব ক'টাকেই তাদের ইউনিয়নের সদস্য করে নিয়েছে। সংগঠিত শ্রমিকদের দৌরাত্ম মানুষের সকল সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু! কিছু একটা করা দরকার!

মেক্সিকান

॥ ১ ॥

কেউই ওর ইতিহাস জানত না। পার্টির লোকেরা তো নয়ই। ওদের চোখে সে এক 'রহস্যময় দেশপ্রেমিক'। আসন্ন মেক্সিকান বিপ্লবের জন্য সে ওদের মতোই হাড়ভাঙা পরিশ্রম করলেও ওরা কিন্তু ওকে সহজে মেনে নিতে চায়নি। দলের একজনও ওকে পছন্দ করত না। প্রথম যেদিন ও এক ঘর লোকের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল সবাই ওকে গুপ্তচর ভেবেছিল। ডায়াজের গুপ্তচর বাহিনীর কেনা গোলাম। ভাবাই স্বাভাবিক কারণ সারা আমেরিকা জুড়ে সামরিক ও অসামরিক বিভিন্ন কারাগারে এখন আটক রয়েছে অসংখ্য কমরেড। তাছাড়া প্রতি নিয়ত আরো বহু কমরেডকেই শৃঙ্খলিত অবস্থায় সীমান্ত পার করিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করার জন্যে।

প্রথম দর্শনে বালকটি ওদের মনে কোন রেখাপাত করতে পারেনি। বালকই বলতে হবে কারণ বয়স তার আঠারোর বেশী নয় এবং বয়সের তুলনায় চেহারাটা তেমন বড়সড় কিছু নয়। ছেলেটি বলেছিল, তার নাম ফিলিপ রিভেরা, সে বিপ্লবের জন্যে কাজ করতে চায়। ব্যস্—আর কোন বাড়তি কথা সে উচ্চারণ করেনি, কোন কৈফিয়ত পেশ করেনি। নীরবে অপেক্ষা করেছিল। তার মুখে হাসির কোন আভাস ছিল না, দৃষ্টিতেও প্রকাশ পায়নি কোন আবেদন। অমন যে ডাকাবুকো পাওলিনো ভেরো সেও কিন্তু অন্তরে অন্তরে শিউরে উঠেছিল। ছেলেটার মধ্যে কি যেন একটা আছে। একটা অবাধ্য ভয়ঙ্কর ভাব যার হদিশ মেলাও ভার। ওর কালো চোখে যেন সাপের দৃষ্টি আর বিষ ঝরে পড়ে। নিরুত্তাপ আগুনের মতো জ্বলে চোখদুটো। একরাশ তিক্ততার ঘনীভূত রূপ। চক্রান্তকারীদের মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টি বুলোতে বুলোতেই তার চোখ

পড়েছিল মিসেস সেট্‌বীর ওপর। ছোটখাট মহিলাটি একমনে টাইপ করছিলেন। এক লহমার জন্যে ওর দৃষ্টি স্তব্ধ হয়েছিল মিসেস সেট্‌বীর ওপর। তারই মধ্যে ভদ্রমহিলা চোখ তুলে তাকান। সঙ্গে সঙ্গে সেই অজানা ব্যাপারটা তাঁর কাজ থামিয়ে দেয়। ফের টাইপ শুরু করার আগে তাঁকে আবার চিঠিটা পড়ে নিতে হয়।

পাওলিনো ভেরো জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আরেলানো আর রামোসের দিকে তাকিয়েছিল। ওদেরও চোখে এই একই জিজ্ঞাসা। সবাই নীরবে এ ওর দিকে চায়। অবিশ্বাস আর সন্দেহের ভাব প্রকাশ পায় তাদের দৃষ্টিতে। এই রোগা ছেলেটি তাদের কাছে অপরিচিত। একজন অপরিচিতকে আশঙ্কা করার মতো সব কারণগুলোই ওর মধ্যে রয়েছে। সমস্ত ধরা ছোঁয়ার বাইরে মনে হয় ছেলেটিকে। সৎ সাধারণ বিপ্লবীদের এরা ঠিক চিনতে পারে। এই বিপ্লবীরা ডায়াজ আর তার নৃশংসতাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে কারণ তারা সত্যিই সৎ ও সাধারণ দেশপ্রেমিক। এর মধ্যে কিন্তু বাড়তি কিছু আছে। সেটা যে ঠিক কী তা ওরা জানে না। ওদের মধ্যে সবচেয়ে তৎপর ভেরা। ভেরাই এগিয়ে এসেছিল নীরবতা ভঙ্গ করে।

'তাহলে তুমি বলছো বিপ্লবের জন্যে কাজ করতে চাও?' নিষ্প্রাণ শোনাল ভেরার কথাগুলো। 'কোটটা খুলে ওই ওখানে টাঙিয়ে রাখো। আমি তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি—এদিকে এসো—কোথায় গেল আবার ন্যাতা আর বালতিটা! বড্ড নোঙরা হয়েছে ঘরটা। ঘরটা মুছে ফ্যালো। এ ঘরটা হয়ে গেলে বাকীগুলোও এক এক করে সাফ্ করবে, তারপর পিকদানি আর জানলাগুলো তো রয়েইছে।'

'এটা কি বিপ্লবের স্বার্থে?' ছেলেটি জানতে চাইল।

'হ্যাঁ, বিপ্লবের স্বার্থে।' ভেরা উত্তর দিল। শীতল সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে প্রত্যেকের দিকে একবার করে তাকাল রিভেরা। তারপর কোটটা খুলে নিল।

'ঠিক আছে।' রিভেরা দুটোর বেশী শব্দ উচ্চারণ করেনি।

এরপর থেকে দিনের পর দিন রিভেরা কাজে এসেছে। ঝাঁট দিয়েছে, মেঝে মুছেছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছে ঘরদোর। উনুনের ছাই সরানো, কাঠকুটো আর কয়লা বয়ে এনে আগুন জ্বালানও তার নিত্তনৈমিত্তিক কাজ। পার্টির সবচেয়ে উৎসাহী কর্মীরা পর্যন্ত তাদের টেবিলে এসে বসবার আগেই কাজ সেরে রাখে সে।

'আমি কি এখানে শুতে পারি?' একদিন জিজ্ঞেস করল রিভেরা।

বা বা—চমৎকার! এতদিনে ডায়াজের দালালের স্বরূপ ধরা পড়ল তাহলে! পার্টির বাড়িতে থাকার মানেই হচ্ছে গোপন তথ্যগুলো জেনে ফেলা। কমরেডদের নামের তালিকা আর যেসব কমরেডরা এখন মেক্সিকোয় রয়েছে তাদের ঠিকানা সংগ্রহ করা। রিভেরার আবেদন অগ্রাহ্য হল। রিভেরাও আর এই নিয়ে কোন কথা তোলেনি এরপর। ও কোথায় শোয়, কোথায় খায়, কি ভাবেই বা খায়—এসব কথা পার্টির কেউই জানে না। আরেলানো একবার ওর হাতে ক'টা ডলার গুঁজে দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাতে রাজী হয়নি রিভেরা। ঘাড় নেড়ে প্রত্যাখ্যান করেছে। ভেরাও এরপর পয়সা নেবার জন্যে জোরাজুরি করলে রিভেরা বলেছে, 'আমি বিপ্লবের জন্যে কাজ করছি।'

এ যুগে বিপ্লবের জন্যে অর্থেরও প্রয়োজন আছে। আর্থিক অনটন পার্টির চিরসঙ্গী। অভুক্ত অর্ধভুক্ত পার্টি কর্মীরা নিরলস পরিশ্রম করে। চব্বিশ ঘণ্টার দিনটাও যেন বড় ছোট মনে হয় তাদের। তবু মাঝে মধ্যে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন মনে হয় মাত্র ক'টা ডলারের জন্যে না বিপ্লবের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এই রকম একটা ব্যাপার প্রথম ঘটে যখন দু'মাসের জন্য বাড়ি ভাড়া বাকী পড়ায় বাড়িওলা ওদের উৎখাতের হুমকি দেয়। সেদিন এই বিপ্লবের ঝাড়ুদার ফিলিপ রিভেরা—গায়ে যার সবচেয়ে খেলো নোঙরা আর জরাজীর্ণ পোশাক—সেই এনে দিয়েছিল গোনাগুন্তি ষাটটা আসলি সোনার ডলার। মিসেস সেট্‌বির টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছিল।

এরকম ঘটনা আরো আছে। তাড়াহুড়ো করে টাইপ করা তিনশোটা চিঠি ডাকটিকিটের অভাবে পোস্ট করা যাচ্ছিল না। খুবই গুরুত্বপূর্ণ সব চিঠি—সাহায্যের জন্যে আবেদন, সংগঠিত শ্রমিক গোষ্ঠীদের সমর্থন প্রার্থনা, দৈনিকপত্রের সম্পাদকদের কাছে একতরফা খবর না-ছাপার জন্যে অনুরোধ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে অহেতুক ভাবে কঠোর সাজা দেওয়ার প্রতিবাদ। ভেরার ঘড়িটা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছল। সাবেকি আমলের সোনার ঘড়িটা ও বাবার কাছ থেকে পেয়েছিল। মিসেস সেট্‌বির সোনার আঙটিটাও উধাও হয়ে গেল! অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা। রামোস আর আরেলানো হতাশায় তাদের লম্বা লম্বা গোঁফে তা দিল। যে কোন উপায়ে চিঠি পাঠাতে হবে, কিন্তু তাবলে ডাকঘর তো আর ধারে টিকিট দেবে না। এমনি যখন অবস্থা রিভেরা একদিন টুপিটা মাথায় দিয়ে গট্‌মট্‌ ক'রে বেরিয়ে গেছল বাইরে। তারপর ফিরে এসে দু' হাজারটা দু' সেন্টের টিকিট নামিয়ে রেখেছিল মিসেস সেট্‌বির টেবিলে।

'ও কী ডায়াজের নোঙরা হাত থেকেই চেয়ে আনছে ডলার-গুলো?' ভেরা তার কমরেডদের কাছে সন্দেহ ব্যক্ত করেছিল।

সবাই ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিল কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। বিপ্লবের ঝাড়ুদার ফিলিপ রিভেরা এখনো প্রয়োজন পড়লেই পার্টির জন্যে সোনাদানা এনে হাজির করছে।

এরপরেও ওরা কিন্তু রিভেরাকে মেনে নিতে পারে না। ওরা ওকে চেনে না, বোঝে না। ওর হালচাল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিছুতেই যেন ওর ওপর আস্থা রাখা যায় না। অথচ ওকে যে জিজ্ঞাসাবাদ করবে সে সাহস কারুর নেই।

'রিভেরা বোধহয় অত্যন্ত নিঃসঙ্গ। একেবারে উদাসী বলে মনে হয়। কি জানি, বুঝতে পারি না কিছু।' আরেলানোর অসহায় উক্তি।

'ও যেন মানুষই নয়।' রামোস বলে।

মে সেট্বি বলে, 'ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে ওর মনটা। ওর দেহে ছিটেফোঁটা আলো নেই হাসি নেই। সব জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যতই ওকে মৃত মানুষের মতো মনে হক না আসলে ও ভয়ানক ভাবে জীবন্ত।'

'নরক যন্ত্রণা ভোগ না করলে কাউকে অমন দেখতে হয় না। অথচ কতই বা বয়স ওর—বাচ্চা ছেলে।' ভেরা যোগ করে।

এত কথা হয় তবু ওকে কিন্তু কেউ পছন্দ করে না। একটাও কথা বলে না রিভেরা, কোন প্রশ্ন করে না, কোন মতামত ব্যক্ত করে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শোনে। শীতল চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টিটুকু বাদে অনুভূতির চিহ্নমাত্র প্রকাশ পায় না। একটা মৃত অবয়ব। উত্তপ্ত উত্তেজিত কণ্ঠে সবাই বিপ্লবের কথা আলোচনা করে। বক্তাদের মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টি বোলায় রিভেরা। বরফের ছুরির মতো ওর দৃষ্টির আঘাত প্রত্যেককে অস্থির বিচলিত করে।

'ও গুপ্তচর নয়।' মে সেটবির কাছে গোপনে মনোভাব ব্যক্ত করে ভেরা। 'রিভেরা দেশপ্রেমিক। হ্যাঁ—হ্যাঁ ঠিকই বলছি আমি—আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দেশপ্রেমিক। আমি বুঝতে পেরেছি। আমার বুকের ভেতর অনুভব করেছি—অনুভব করেছি মগজ দিয়ে। তবু বলব ওকে আমি বুঝতে পারি না।'

'ভীষণ মাথা গরম।' মে সেট্বি বলে।

'জানি।' কথা বলতে বলতেই শিউরে ওঠে ভেরা। 'ওর ওই চোখ দুটো তুলে যখন আমার দিকে তাকায়—ভালবাসা বলে কিছু নেই। আছে শুধু শাসানি। বুনো বাঘের বর্বর দৃষ্টি। আমি যদি বিপ্লবের কাজে বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে কোনদিন দোষী সাব্যস্ত হই, আমি কিন্তু জানি ও আমাকে খুন্ করবে। হৃদয় বলে ওর কিছু নেই। ইস্পাতের মতো নির্দয় আর শীতল বরফের মতো কঠিন। প্রচণ্ড শীতের রাতে নির্জন পাহাড়ের চূড়োয় কেউ যখন ঠাণ্ডায় জমে মরে তখনও তার ওপর চাঁদের মিষ্টি আলো ঝরে। রিভেরাও ঠিক ওই চাঁদের আলোর মতো। ডায়াজ বা তার খুনেদের কাউকে আমি ভয় পাই না। কিন্তু

এই ছেলেটাকে আমি ভয় পাই। সত্যি বলছি ওকে আমি ভয় পাই। ও যেন সাক্ষাত মৃত্যুর দূত।'

এত কথা বলে ভেরা কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই সবাইকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করায় রিভেরাকে বিশ্বাস করে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটা অর্পণ করার জন্যে! লস্ অ্যাঞ্জেলেস্ আর লোয়ার ক্যালিফোর্নিয়ার মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ওদের তিনজন কমরেডকে গুলি করে মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছে তাদের নিজেদেরই হাতে খোঁড়া কবরের মধ্যে। লস্ অ্যাঞ্জেলেসে দু'জন কমরেড মার্কিন কারাগারে বন্দী। সরকারী ফেডারেল বাহিনীর কমাণ্ডার জুয়ান অ্যালভারাডো একটি দানব বিশেষ, বিপ্লবীদের প্রতিটি অভিসন্ধি ভেস্তে দিয়েছে। লোয়ার ক্যালিফোর্নিয়ার সক্রিয় বিপ্লবী বা সমর্থকদের সঙ্গে সব যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে।

রিভেরাকে নির্দেশ দিয়ে দক্ষিণাঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। রিভেরা ফিরে এল যখন ফের যোগসূত্র স্থাপন হয়েছে আর জুয়ান অ্যাল্‌ভারাডো মারা গেছে। আমূল ছুরিকাবিদ্ধ অবস্থায় পড়েছিল অ্যালভারাডো তার শয্যায়। এমন নির্দেশ কিন্তু রিভেরাকে দেওয়া হয়নি। পার্টির কেউ অবশ্য এই নিয়ে তাকে প্রশ্ন করেনি। এই দুঃসময়ে এসব প্রশ্ন অবান্তর। রিভেরাও মুখ খোলেনি। সবাই শুধু বোঝদারের ভঙ্গিতে চাওয়া চাওয়ি করেছে।

'কী বলেছিলাম!' সেট্‌বিকে বলল ভেরা, 'ডায়াজ যদি কাউকে ভয় করে তো একেই করবে।'

মে সেটবি আগেই বলেছিল রিভেরার রগচটা স্বভাবের কথা। এবার তার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কখনো দেখা যায় রিভেরার ঠোঁটটা কেটে গেছে, কখনো গালে কালসিটে, আবার কখনো কান দুটো ফুলে থাকে। পরিষ্কার বোঝা যায় যে রিভেরা তার একান্ত নিজস্ব বাইরের জগতটায় দাঙ্গাহাঙ্গামা করে বেড়ায়। তার থাকা খাওয়া শোয়া সবই এই জগতটায়। বিপ্লবীদের সম্পূর্ণ অজানা এই দুনিয়া থেকেই সে সংগ্রহ করে আনে অর্থ। কিছুদিন কাটার পর

সাপ্তাহিক বিপ্লবী মুখপত্রের জন্য রিভেরা কম্পোজিটারের কাজ করতে শুরু করলো। মাঝে মধ্যে অবশ্য কাজ করার কোন উপায় থাকে না তার। কখনো আঙুলের গাঁটগুলো কেটে ছেড়ে বা ফুলে থাকে, কখনো বুড়ো আঙুলদুটোর ক্ষত বিক্ষত অবস্থা, আবার কখনো ডান কিংবা বাঁ হাতটা অকেজোর মতো শরীরের একপাশে নড়বড় করে। অব্যক্ত যন্ত্রণার ছাপ পড়ে মুখে।

'বখাটে ছোঁড়া!' আরেলানো বলে।

'নোঙরা অঞ্চলে ঘোরাফেরা করে।' রামোস বলে।

'তা না হয় হ'ল কিন্তু টাকাগুলো পায় কোত্থেকে?' ভেরা জানতে চায়। 'আজই শুনলাম, এই এক্ষুণি—সাদা কাগজ কেনার বিল্ মিটিয়ে দিয়েছে—এক শো চল্লিশ ডলার।'

'তার ওপর যখন-তখন ডুব মারে। কেন কী বৃত্তান্ত কিছুই বলেনা।' মে সেটবির মন্তব্য।

'ওর পিছনে একজন চর লাগালে হয়।' রামোস প্রস্তাব করে।

'আর যাই হোক আমি অন্তত চর হতে রাজী নই।' সাফ্ কথা ভেরার। 'তাহলে বোধহয় আমাকে আর জ্যান্ত দেখার সুযোগ পাবে না তোমরা। যে প্রচণ্ড তেজ ওর স্বয়ং ভগবানও যদি পথ জুড়ে দাঁড়ায় তো সহ্য করবে না।'

'ওর সামনে দাঁড়ালে নিজেকে যেন শিশুর মতো লাগে।' অকপটে স্বীকার করে রামোস।

'আমার কাছে রিভেরা মানেই শক্তি। একটা আদিম প্রাণ। ক্ষ্যাপা নেকড়ের মতো, ফণা উঁচু করা সাপের মতো, হুল ফোটানো বিছের মতো।' আরেলানো বলে।

'আসলে রিভেরা হচ্ছে বিপ্লবের নরমূর্তি।' ভেরা রায় দেয়। 'ও হচ্ছে বিপ্লবের শিখা—বিপ্লবের তেজ ও আদর্শ। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার অতৃপ্ত তৃষ্ণায় ও কাঁদে না, শুধু নীরবে নরবলি দেয়। ধ্বংসের দেবদূতের মতো নিস্তব্ধ রাতের পাহারা এড়িয়ে ওর চলাফেরা।'

'ওর জন্যে আমার কান্না পায়।' মে সেটবি বলে, 'কাউকে চেনে না

ও। সবাইকে ঘৃণা করে। আমাদের সহ্য করে কিন্তু সে শুধু এক পথের পথিক হিসেবে। এমন নিঃসঙ্গ ......একা...' কান্নায় গলা ধরে আসে সেটবির। চোখে ঝাপসা দ্যাখে।

রিভেরার হালচাল ও হাজিরার ব্যাপারটা সত্যিই রহস্যময়। মাঝেমধ্যে সপ্তাহ খানেক আসেই না। একবার তো পুরো একমাস গা ঢাকা দিয়েছিল। তবে প্রত্যেকবার ফিরে এসে বিনা বাক্যব্যয়ে সেট্‌বির টেবিলের ওপর সে ঠিক একরাশ স্বর্ণমুদ্রা ঢেলে দেয়। কখনো আবার দিনের পর দিন পুরো সময়টাই কাটিয়ে দেয় পার্টির অফিসে। আবার কখনো কখনো দুপুরবেলাতেও উধাও হয়ে যায় রিভেরা। এরকম যখন ঘটে সে সাত সকালে এসে হাজির হয়, যায়ও অনেক রাত করে। থ্যাঁতলানো আঙুল বা সদ্য কাটা রক্তঝরা ঠোঁট নিয়েও কম্পোজের কাজ করতে দেখেছে তাকে আরেলানো মাঝরাতে।

॥ ২ ॥

শক্তি পরীক্ষার সময় নিকটতর হয়। বিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করছে পার্টির ওপর। পার্টির ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। অর্থের প্রয়োজন আগের চেয়ে এখন ঢের বেশী। দেশপ্রেমিকরা তাদের শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত হস্তান্তর করে এখন নিঃসম্বল। দিনমজুর আর মেক্সিকো থেকে পলাতক শ্রমিকরা তাদের অকিঞ্চিতকর মজুরিরও অর্ধেক সমর্পণ করছে। কিন্তু এতে প্রয়োজন মিটছে না। রক্ত জল করে, চক্রান্ত করে, বছরের পর বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে আজ সাফল্যের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছানো গেছে। সময়টা অনুকূল। নিক্তির পাল্লায় দুলছে বিপ্লব। এখন প্রয়োজন আরেকটা ধাক্কা—শেষবারের মতো একটা বীরত্বপূর্ণ প্রয়াস। তাহলেই সাফল্যের দিকে ঝুঁকে পড়বে পাল্লাটা। মেক্সিকোকে তারা ঠিকই চেনে। একবার যদি বিপ্লব শুরু হয়ে যায়, আপনা হতেই সে কাজ সম্পূর্ণও হবে। ডায়াজের প্রশাসনিক ব্যবস্থা তাসের ঘরের মতো

ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়বে। সীমান্ত অঞ্চল অভ্যুত্থানের জন্যে প্রস্তুত। আই ডব্লু ডব্লু-র একশো কর্মী সমেত একজন মার্কিন নেতা শুধু আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে। আদেশ এলেই সীমান্ত অতিক্রম করে লোয়ার ক্যালিফোর্নিয়ায় অভিযান চালাবে ওরা। কিন্তু ওদের বন্দুক চাই। আটলান্টিক পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগের অসংখ্য মানুষের সঙ্গে পার্টির যোগাযোগ রয়েছে। এদের প্রত্যেকেরই প্রয়োজন বন্দুক। এদের মধ্যে সব রকমের মানুষ আছে—আছে নিছক দুঃসাহসী, ভাগ্যান্বেষী, দস্যু, অসন্তুষ্ট ইউনিয়ান কর্মী, সমাজতন্ত্রী, সন্ত্রাসবাদী, গুণ্ডা, পলাতক মেক্সিকোবাসী, পলাতক ক্রীতদাস, কোর্ দি অ্যালেন আর কলোরাডোর শুয়োরের খোঁয়াড়ের বাসিন্দা চাবুক প্রহৃত খনি-শ্রমিক। এই উন্মত্ত জটিল আধুনিক দুনিয়ায় যত দুরন্ত আগাছা সবাই চাইছে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে। চারধার জুড়ে এখন শুধু একই রব—বন্দুক চাই—টোটা চাই—বন্দুক চাই—টোটা চাই—

মিশ্র চরিত্রের এই নিঃসম্বল ক্ষুব্ধ জনতাকে একবার সীমান্তের ওপারে ঠেলে দিতে পারলেই শুরু হয়ে যাবে বিপ্লব। শুল্ক বিভাগ ও উত্তর দিকের প্রবেশ পথের বন্দরগুলো দখল করে নেওয়া হবে। ডায়াজের পক্ষে সম্ভব নয় আক্রমণ প্রতিরোধ করা। সাহস করে তার সৈন্যবাহিনীকে সে এদিকে পাঠাতে পারবে না। যে কোন উপায়ে সে দক্ষিণাঞ্চল রক্ষা করতে চাইবে। কিন্তু তবু বিপ্লবের আগুন দক্ষিণাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়বে। জনগণ বিদ্রোহ করবে। একের পর এক প্রতিটি শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। রাজ্যের পর রাজ্য নতি স্বীকার করবে। তারপর সবশেষে বিজয়ী বিপ্লবী বাহিনী চারধার থেকে আস্তে আস্তে ঘিরে ধরবে ডায়াজের শেষ দুর্গ মেক্সিকো সিটিকে।

কিন্তু অর্থ কোথায়? মানুষের ঠিকানা ওরা জানে—অস্থির উদগ্রীব যে মানুষগুলো অস্ত্র চালাবে। ওরা জানে কোন্ কোন্ ব্যবসায়ী অর্থের বিনিময়ে অস্ত্র সরবরাহ করবে। ওদিকে বিপ্লব-

বহ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করতে গিয়ে ইতিমধ্যেই পার্টি তহবিল শূন্য। শেষ ডলারটি পর্যন্ত খরচ হয়ে গেছে, সাহায্যকারী আর অভুক্ত দেশপ্রেমিকদের শুষে শুকনো করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবু বিপ্লব এখনো সাফল্য অসাফল্যের মাঝখানে দোদুল্যমান। বন্দুক আর টোটা! দীন-দরিদ্র বিপ্লবী সেনাবাহিনীকে অস্ত্রসজ্জিত করতে হবে। কিন্তু কী করে? রামোস হাহুতাশ করে তার সম্পত্তি সরকার দখল করে নিয়েছে বলে। যৌবনে বেহিসেবী পয়সা ওড়ানোর কথা স্মরণ করে হাত কামড়ায় আরেলানো। মে সেটবি ভাবতে চেষ্টা করে পার্টি যদি আগে থেকেই আরো হিসেব করে চলতো কোন লাভ হত কিনা।

'ভাবতেই কেমন লাগে যে নগণ্য কয়েক হাজার ডলার যোগাড় করতে না পারার জন্যেই হয়তো মেক্সিকো স্বাধীন হতে পারবে না।' পাউলিনো ভেরা বলেছিল।

প্রত্যেকের চোখেমুখে এখন শুধু হতাশা। এক্ষুণি খবর এসেছে ওদের শেষ আশা জোসে আমারিলো নিহত হয়েছে। চিহুয়াহুয়ায় তার খামার সংলগ্ন খোঁয়াড়ের দেয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। সম্প্রতি ওদের দলে যোগ দিয়েছিল জোসে। অর্থসাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। যে করেই হোক এই খবরটা নিশ্চয় জানাজানি হয়ে গেছল।

রিভেরা ঘর মুছতে মুছতেই হাঁটুগেড়ে বসে চোখ তুলে তাকায়। বুরুশটা উঁচু করে রেখেছে। সাবান গোলা নোঙরা জল হাতে লেগেছে।

'পাঁচ হাজারে কাজ হবে?' প্রশ্ন করলো রিভেরা।

সবাই বিস্মিত হয়ে তাকায়। ভেরা ঢোঁক গিলে ঘাড় নাড়ে। মুখ দিয়ে তার কথা সরে না কিন্তু রিভেরার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করতে এতটুকু অসুবিধা বোধ করে না।

'বন্দুকের অর্ডার দিয়ে দিন।' রিভেরা আবার মুখ খোলে। 'সময় অল্প। তিন সপ্তাহের মধ্যে আমি পাঁচ হাজার যোগাড় করে

আনব। ভালই হবে, ততদিনে একটু গরম পড়ে যাবে। তাছাড়া আমারও আর করার কিছু নেই।' একসঙ্গে এতগুলো কথা বলার মতো পাপকার্য রিভেরা এ অবধি কোনদিন করেনি।

ভেরা চায়না তার মনে এতটুকু আশা সঞ্চারিত হোক। অবিশ্বাস্য প্রস্তাব! বিপ্লবের কাজে যোগ দেবার পর থেকেই সে বারবার স্বপ্ন দেখেছে আর বারবার ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে অতি প্রিয় স্বপ্নগুলো। বিপ্লবের এই অতি দরিদ্র ঝাড়ুদারকে সে বিশ্বাস করেও বিশ্বাস করতে চায় না।

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।' ভেরা বলল রিভেরাকে।

'বলছিতো তিন সপ্তাহ লাগবে। বন্দুকের অর্ডার দিয়ে দিন।' বলতে বলতেই উঠে দাঁড়াল রিভেরা। জামার আস্তিন খুলে কোটটা চড়িয়ে নিল। 'বন্দুকের অর্ডার দিয়ে রাখুন। আমি এখন বেরোচ্ছি।'

॥ ৩ ॥

অনেক ছোটাছুটি দৌড়োদৌড়ি টেলিফোনের পর টেলিফোন আর গালাগালির ফুলঝুরি ছোটাবার পর কেলির অফিস রাত্তিরবেলা সরগরম হয়ে উঠেছে। ব্যবসা নিয়ে নাকানি চোবানি খাচ্ছে কেলি। সময়টা তার ভাল যাচ্ছে না। নিউ ইয়র্ক থেকে ড্যানি ওয়ার্ডকে নিয়ে এসেছে কেলি, বিলি কার্থির সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধে নামাবে বলে। তিন সপ্তাহ বাদেই লড়াই, ওদিকে কার্থি গুরুতর ভাবে আহত হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। অবশ্য ক্রীড়াসাংবাদিকদের কাছ থেকে খবরটা সযত্নে গোপন রাখা হয়েছে। এমন একটা লোক নেই যে কার্থির বদলে লড়তে পারে। কেলি টেলিফোনের লাইন প্রায় পুড়িয়ে ফেলেছে পূর্বাঞ্চল থেকে যে কোন একজন ভাল লাইট ওয়েট মুষ্টিযোদ্ধাকে আনবার ব্যবস্থা করতে, কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই চুক্তিবদ্ধ হয়ে বসে আছে, ওই দিন সময় দিতে পারবে না। অতি ক্ষীণ হলেও এতক্ষণে আশার একটা আলো দেখতে পেয়েছে কেলি।

'তোমার বুকের পাটা আছে বলতে হবে।' রিভেরাকে এক পলক দেখেই মন্তব্য করল কেলি।

দু'চোখ ভরা তীব্র ঘৃণা রিভেরার, কিন্তু মুখে তার বিন্দুমাত্র প্রকাশ নেই।

'ওয়ার্ডকে আমি কাত করে দেবো।'

'কি করে জানলে? ওয়ার্ডের লড়াই দেখেছ?'

রিভেরা ঘাড় নেড়ে জানাল দেখেনি।

'ও দুচোখ বন্ধ করে শুধু এক হাতের ঘুষিতেই তোমায় শেষ করে দেবে।'

রিভেরা তাচ্ছিল্য ভরে কাঁধ ঝাঁকায়।

'কথা বলছো না কেন?' মুষ্টিযুদ্ধ ব্যবস্থাপক দাঁত খিঁচিয়ে উঠল।

'আমি ওকে কাত করে দেবো।'

'কার কার সঙ্গে লড়েছ বলো দেখি?' জানতে চাইল মাইকেল কেলি। মাইকেল ব্যবস্থাপকের ভাই। ইয়েলোস্টোন পুলরুমে বক্সিঙের আসর বসিয়ে বেশ ভালই রোজগার করে সে।

রিভেরা তিক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েই প্রশ্নের উত্তর দিল।

পাকা খেলোয়াড়ের মতো দেখতে ব্যবস্থাপকের তরুণ সেক্রেটারী অবজ্ঞাভরে হুঁঃ করে উঠল।

'যাই হোক রবার্টকে তো তুমি চেনো!' বিবাদমান নীরবতা ভঙ্গ করল কেলি। 'ওকে আমি ডেকে পাঠিয়েছি। এখুনি এসে পড়বে। ততক্ষণ তুমি ব'সো। তবে তোমার চেহারা দেখে কোন সুবিধে করতে পারবে বলে মালুম হচ্ছে না। আজেবাজে গট্‌আপ লড়াই দিয়ে দর্শকদের ভোলানো যাবে না। জানো তো রিঙের ধারের চেয়ারের টিকিট পনের ডলার করে বিক্রি হচ্ছে।'

রবার্ট ঢুকতেই বোঝা গেল সে কিঞ্চিত মদ্যপান করে এসেছে। লম্বা রোগা মানুষ রবার্ট—কেমন শিথিল ভঙ্গি। এমন কি কথাও বলে টেনে টেনে অবসন্ন ভাবে।

সোজা কাজের কথা পাড়ল কেলি

'দ্যাখো রবার্ট, তুমি তো খুব বড়াই করছিলে যে এই ক্ষুদে মেক্সিকানটি তোমার আবিষ্কার। ওদিকে কার্থিতো হাত ভেঙে বসে আছে। তা এই খুদে ছোকরা তো আজ সিধে আমার কাছে এসে প্রায় দাবি জানাচ্ছে যে কার্থির জায়গায় তাকে লড়তে দিতে হবে। তুমি কি বলো?'

'কোন অসুবিধে নেই।' ধীরে ধীরে বলল রবার্ট। 'ভালই লড়বে।'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে এক্ষুণি বলবে যে ওয়ার্ডকে ও কাত্ করে দিতে পারে।' কেলি খিঁচিয়ে উঠল।

রবার্ট বেশ ভেবেচিন্তে এবার জবাব দিল, 'না, তা বলব না। ওয়ার্ড এ-ক্লাশ—রিঙের মাস্টার। তাবলে রিভেরাকে ও সহজে কাবু করতে পারবে না। রিভেরাকে তো আমি চিনি। আজ অবধি আমি ওর কোন দুর্বলতা খুঁজে পাইনি। তাছাড়া ওর দু' হাতই সমান চলে। যে কোন জায়গা থেকে ও ঘুম-পাড়ানি মার্ ঝাড়তে পারে।'

'অত কথা জানতে চাই না, আমার প্রশ্ন হচ্ছে খেলা জমাবার মতো লড়তে পারবে তো? তুমি তো আজীবন খেলোয়াড় তৈরি করে গেলে। তোমার বাযের ওপর আমার পুরো আস্থা আছে। টিকিটের দাম উসুল হয়ে গেছে বলবে তো দর্শকরা?'

'নিশ্চয়। শুধু তাই নয়, ওয়ার্ডকে ও রীতিমতো বেগ দেবে। তুমি ওকে চেনো না। আমিই ওকে আবিষ্কার করেছি। ও বলির পাঁঠা নয়—একটি মূর্তিমান দানব। ঘূর্ণিঝড়ও বলতে পারো। ওয়ার্ডকে রীতিমতো ঘাবড়ে দেবে—দর্শকরাও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবে ওর কীর্তি দেখে। বলছি না ওয়ার্ডকে একেবারে হারিয়ে ছাড়বে, কিন্তু ওর লড়াই দেখেই সবাই বুঝতে পারবে এই স্থানীয় অখ্যাত ছেলেটি উঠতি যোদ্ধা।'

'বেশ—তোমার কথাই মানলাম।' কেলি তার সেক্রেটারির দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'ওয়ার্ডকে ফোন করো। ওকে বলেই

রেখেছি যে তেমন কারুর খোঁজ পেলে ডাক্ পাঠাব। ইয়েলোস্টোনেই পাবে। ওখানে এখন ও কেরামতি দেখাচ্ছে।'

রবার্টের দিকে তাকিয়ে কেলি বলল, 'একটা ড্রিঙ্ক চলবে নাকি?'

রবার্ট সোডা হুইস্কির গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে রিভেরার গল্প শুরু করল।

'এনাকে কি করে আবিষ্কার করেছিলাম সে কথা তো এখনো বলিইনি। বছর কয়েক আগে সেদিন আমি আখড়ায় প্রেনিকে তালিম দিচ্ছিলাম ডিলানির সঙ্গে লড়াইয়ের আগে তৈরি করার জন্যে। প্রেনি একটি আস্ত শয়তান। ওর শরীরে দয়ামায়া বলে কোন বস্তু নেই। যারাই ওর সঙ্গে প্র্যাকটিস করতে আসতো তাদের একেবারে মেরেধোরে শেষ করে দিত। ফলে এমন কাউকেই পাচ্ছিলাম না যে স্বেচ্ছায় ওর সহকারী হবে। এই বাচ্চা মেক্সিকান ছেলেটাকে ক'দিনই ঘুরঘুর করতে দেখছিলাম আশেপাশে। মরিয়া হয়ে ভুখা বাচ্চাটাকেই ধরলাম। দু'হাতে গ্লাভসদুটো একরকম হ্যাঁচকা টানে পরিয়ে দিলাম। কাঁচা চামড়াকে তবু টেনে ছেঁড়া যায় কিন্তু রিভেরাকে নয়। তবু তো না খেয়ে খেয়ে ওর তখন শোচনীয় অবস্থা। একেবারে দুর্বল শরীর। বক্সিঙেরও অ-আ জানতো না! প্রেনি ওকে একেবারে কিলিয়ে শেষ করে দিল। তবু দু' রাউণ্ড টিকেছিল। সে চোখে দেখা যায় না। শেষ পর্যন্ত জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছিল। কিচ্ছু না, শুধু খেতে পেত না বলেই এটা ঘটেছিল। এমন মার খেয়েছিল দেখে চেনা যাচ্ছিল না। আমি ওকে আধ ডলার দিয়েছিলাম আর পেট পুরে খাইয়েছিলাম। ওর গোগ্রাসে খাওয়াটাও দেখবার মতো। কয়েক দিন বোধহয় পেটে কিছুই পড়েনি। ভেবেছিলাম এরপর আর ব্যাটা ধারেকাছে ভিড়বে না। কিন্তু পরের দিনই দেখি আবার এসে হাজির হয়েছে। আধ ডলার আর পেট-পুরে খাওয়ার এমনই আকর্ষণ। এমনি ভাবে একটা করে দিন পেরোতে লাগল আর রিভেরার দক্ষতাও বেড়ে চলল। রিভেরা জন্মগত বক্সার আর সহ্যশক্তি অসীম। হৃদয় বলে

কোন বস্তু নেই। একটা বরফের চাঁই। আজ অবধি ওকে কখনো আমি একসঙ্গে এগারোটার বেশী শব্দ উচ্চারণ করতে শুনিনি। নিজের কাজটুকু ছাড়া আর কিছু বোঝে না।'

'হ্যাঁ—আমি ওর লড়াই দেখেছি।' সেক্রেটারি ছেলেটি বলল। 'আপনার হয়ে অনেক জায়গায় লড়েছে।'

'দ্বিতীয় সারির সবাই ওর সঙ্গে লড়েছে।' রবার্ট বলল। 'ওদের কাছ থেকে লড়াইয়ের কায়দাগুলো ও আস্তে আস্তে রপ্ত করে নিয়েছে। অনেককেই হারিয়েছে। কিন্তু লড়াইয়ে ওর মন ছিল না। আমি ভাবতাম লড়াইয়ের ব্যাপারটাই ও পছন্দ করে না। হাবভাব দেখেই মনে হত।'

'গত ক'মাসে ছোট ছোট ক্লাবগুলোয় বেশ কিছু লড়াইয়ে নেমেছে।' কেলি বলল।

'হ্যাঁ। কী যে হয়েছে ওর বলা শক্ত। হঠাৎ যেন লড়াইয়ে মন লেগে গেছে। আগুনের লকলকে শিখার মতো হঠাৎ ছুটে এসে যে ক'টা স্থানীয় বক্সার ছিল সবাইকে খতম করে দিয়েছে। টাকা পয়সার প্রয়োজন পড়েছে মনে হয়। কিছু টাকা কামিয়েওছে কিন্তু জামাকাপড়ের ছিরি দেখে বোঝার উপায় নেই। অদ্ভুত ছেলে। কী যে করে কেউ জানেনা। কেউ জানেনা কোথায় থাকে—কী করে সময় কাটায়। লড়াইয়ের সময়ে হঠাৎ যেমন উদয় হয় আবার সেদিনের মতো কাজ ফুরোলেই হাওয়া। আবার কখনো কখনো একেবারে কয়েক সপ্তাহ নিপাত্তা হয়ে যায়। কারুর উপদেশ কানে নেয় না। যদি কেউ ওর ম্যানেজারের কাজ নিতে পারতো তার ভাগ্যই ফিরে যেত। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে রিভেরা কোন পাত্তাই দেয় না। হ্যাঁ—আরেকটা কথা। পাওনাকড়ির কথা উঠলেই দেখবে শুধু নগদ টাকা ছাড়া আর কিছু চেনেনা ও।'

এমনি সময়ে পারিষদবর্গকে সঙ্গে করে ড্যানি ওয়ার্ড এসে ঢুকল। ওর ম্যানেজার আর প্রশিক্ষকও এসেছে। ভদ্রতার, অমায়িক ব্যবহারের আর বিশ্বজয়ী ক্ষমতার সুগন্ধ ভরা এক ঝলক হাওয়া

ছড়িয়ে দিল। শুভেচ্ছার বন্যা, কারুর সঙ্গে ঠাট্টা, কারুর কথার চোখা প্রত্যুত্তর আর সবার জন্যেই মুখভরা হাসি। এটা কিন্তু ওর রপ্ত করা একটা কায়দা—সম্পূর্ণ আন্তরিক নয়। ড্যানি একজন ভাল অভিনেতা। সে জানে এ জগতে চলার পথে ভদ্রতা একটা বড় সম্বল। ভদ্রতার মুখোশের তলায় তার স্বরূপটা কিন্তু ভিন্ন—ড্যানি একজন অতি বিচক্ষণ চতুর মুষ্টিযোদ্ধা আর হিসেবী ব্যবসায়ী। ওকে যারা চেনে বা ওর সঙ্গে যাদের কারবার, সবাই বলে প্রয়োজন পড়লে মুহূর্তের মধ্যে সত্যিকার ড্যানি আত্মপ্রকাশ করে। সমস্ত ব্যবসায়িক আলোচনার সময়েই ড্যানি উপস্থিত থাকে। অনেকে তো বলে ড্যানির ম্যানেজার আসলে ওর লাউড স্পিকার ছাড়া আর কিছুই নয়।

রিভেরার প্রকৃতি একেবারেই ভিন্ন রকম। তার ধমনীতে বইছে রেড্ ইণ্ডিয়ান ও স্প্যানিশ রক্ত। এক কোণে মুখ বুজে বসে আছে। শুধু কালো চোখ দুটো প্রত্যেকের মুখ ঘুরে যাচ্ছে। কিছুই তার দৃষ্টি এড়াচ্ছে না।

'এই তাহলে সে!' ড্যানি বলল। প্রস্তাবিত প্রতিপক্ষের ওপর নজর বুলিয়ে যাচাই করে নেয়। 'হ্যালো ওল্ড বয়!'

রিভেরার চোখদুটো যেন বিষ বর্ষণ করে। মুখে কোন কথা নেই। গিঙ্গো মাত্রেই ও অপছন্দ করে কিন্তু ড্যানির প্রতি এই যে তীব্র ঘৃণা এটা ওর স্বভাব বহির্ভূত।

'যাব্ বাবা!' ব্যবস্থাপকের দিকে তাকিয়ে মুখভঙ্গি করে বলল ড্যানি। 'তুমি কি বোবা-কালার সঙ্গে আমায় লড়তে বলছ?' হাসির লহরা থামলে ড্যানি আবার খোঁচা মারল, 'দেখলেই বোঝা যাচ্ছে লস্ অ্যাঞ্জেলেসের অবস্থা কাহিল। তা না হলে আর এই মালটিকে ছাড়া কিছু জোটাতে পারলে না! কোন্ কিণ্ডারগার্টেন স্কুল থেকে এটিকে ধরে আনলে?'

'দেখে যাই মনে হোক্, ও কিন্তু ভালই লড়ে ড্যানি।' রবার্ট এগিয়ে আসে রিভেরার সমর্থনে।

'তাছাড়া অর্ধেক টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে।' কেলির কণ্ঠে অনুরোধের সুর। 'তুমি আর আপত্তি করো না ড্যানি। এছাড়া আমাদের আর করার কিছু নেই।'

ড্যানি আবার তাচ্ছিল্যভরে রিভেরার দিকে একবার তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'তার মানে খুব সামলে সামলে লড়তে হবে, এই তো? অবশ্য আপনা থেকে যদি পটল তোলে তো করার কিছু নেই।'

রবার্ট বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করে।

'না ড্যানি, সাবধানের মার নেই।' ড্যানির ম্যানেজার তাকে সতর্ক করে দেয়। 'কিছু বলা যায় না, সুযোগ দিলে হয়ত ফট করে একটা কশিয়ে দেবে।'

'ঠিক আছে—ঠিক আছে—সাবধানই হবো।' ড্যানি হাসে। 'প্রথমেই দু'ঘা কশিয়ে দেব তারপর দর্শকদের খাতিরে সেবাশুশ্রূষা করে যাব। পনের রাউণ্ড অবধি চালালেই কাজ হবে তো কেলি? তারপর কিন্তু ওর বিচালির শয্যার ব্যবস্থা পাকা।'

'ব্যস্-ব্যস্—তাহলেই হল। তবে দেখ কেউ যেন ধরতে না পারে।' কেলি বলল।

'তাহলে এবার ব্যবসার কথাটা হয়ে যাক!' ড্যানি একটু থেমে মনে মনে হিসেব করে নেয়। 'টিকিট বিক্রির পঁয়ষট্টি পারসেণ্ট তো নিশ্চয়। যেমন কথা ছিল কার্থির সঙ্গে। কিন্তু ভাগাভাগিটা অন্য রকম হবে। আশি পারসেণ্ট আমি নেবো।' এবার ম্যানেজারের দিকে ফিরে ড্যানি বলল, 'ঠিক বলেছি তো?'

'এই যে, শুনলে তো সব কথা?' রিভেরাকে জিজ্ঞেস করল রবার্ট।

রিভেরা ঘাড় নাড়ে। ব্যাপারটা আবার বুঝিয়ে বলে কেলি। 'টিকিট বিক্রির পঁয়ষট্টি শতাংশ তোমাদের মধ্যে ভাগাভাগি হবে। তুমি তো ফালতু—কেউ চেনেও না। কাজেই এই টাকাটার আশি

শতাংশ পাবে ড্যানি আর বাকীটা তুমি। তুমিই বলো রবার্ট; এরচেয়ে ভাল আর কী হতে পারে?'

'হ্যাঁ, রিভেরা। তোমার আপত্তি করার কোন কারণ নেই। বুঝতেই পারছো এখনো তোমার নাম হয়নি।' রবার্ট বোঝাতে চায়।

'টিকিট বিক্রির পঁয়ষট্টি শতাংশ মানে কত?' রিভেরা জানতে চাইল।

'পাঁচ হাজার—খুব বেশী হলে আট হাজারও হতে পারে।' মাঝখান থেকে বলে উঠল ড্যানি। 'তোমার ভাগে হাজার বা ষোলশ পড়বে। আমার মতো নামকরা একজনের কাছে মার খাবার জন্যে এতগুলো ডলার—ভালই বলো?'

রিভেরার কথা শুনে ওদের ভিরমি খাওয়ার অবস্থা। 'যে জিতবে পুরোটাই তার।' খুব জোর দিয়ে বলল রিভেরা।

কারুর মুখে আর কথা নেই।

ড্যানির ম্যানেজার শেষ পর্যন্ত মুখ খুলল, 'আহা—কী কথা! বাচ্চা ছেলে উপহার দেবে আমাদের।'

ড্যানি অসম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়ে।

'আজকে থেকে আমি লড়াই শুরু করছি না। বোঝাতে শুরু করল ড্যানি। 'রেফারি বা এই কম্পানি সম্বন্ধেও কোন বিরূপ ধারণা পোষণ করি না। মাঝে মধ্যে যে গট-আপ ব্যাপারগুলো ঘটে তাও ধরছিনা। তবু বলবো আমার মতো বক্সারের কাছে এটা মোটেই ভাল ঠেকছে না। আমি কখনো অযথা ঝুঁকি নিইনা। কিছু কি বলা যায়, হয়তো হাতটা ভেঙে গেল বা কোন বদমাইশ লুকিয়ে ওষুধ বিষুধ খাইয়ে দিল, তখন?' গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়তে লাগল ড্যানি। 'জিতি বা হারি ওই আশি আর কুড়ি হিসেবেই ভাগাভাগি হবে। তুমি কি বলোহে মেক্সিকান?'

রিভেরা মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল।

ড্যানি একেবারে ফেটে পড়ল। এতক্ষণে স্বরূপ বেরিয়ে পড়েছে।

'হারামজাদা বদমাইশ্! নোঙরামি করতে এসেছিস তো! ইচ্ছে করছে এখুনি তোর খুলিটা চৌচাপট গুঁড়িয়ে দিই।'

রবার্ট নীরবে উঠে এসে দাঁড়াল বিবদমান দু' পক্ষের মাঝখানে।

'যে জিতবে সেই সব পাবে।' বেজার মুখে বলল রিভেরা।

'তোমার এই গোঁয়ার্তুমির কারণটা কী?' ড্যানি শুধোল।

'কারণ আমি তোমাকে খতম করতে পারি।'

ড্যানি প্রায় উঠে দাঁড়িয়েছিল কোটটা খুলবে বলে। কিন্তু ওর ম্যানেজার জানে এটা লোক দ্যাখানো ভড়কি। কোটটা আর গা থেকে খোলা হল না, তার আগেই সবাই মিলে ওকে ধরে বুঝিয়ে সুঝিয়ে টেনে টুনে বসিয়ে দিল। সবাই ড্যানির সমব্যথী। রিভেরা শুধু একা দাঁড়িয়ে।

'তুমি একটি আস্ত নির্বোধ—' কেলি এবার বোঝাবার ভার নিল। 'কে তুমি! কে চেনে তোমায়! জানি, গত ক'য়েক মাস ধরে স্থানীয় বক্সারদের তুমি একে একে হারিয়েছ। কিন্তু ড্যানি হচ্ছে জাত লড়িয়ে। এই লড়াইয়ের পরই ও চ্যাম্পিয়ানশীপের লড়াইয়ে নামবে। কিন্তু তুমি একেবারেই অপরিচিত। লস অ্যাঞ্জেলেসের বাইরে কেউ তোমার নাম শোনেনি।'

'শুনবে।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে রিভেরা বলল। 'এই লড়াইয়ের পরেই সবাই শুনবে।'

'তুই কি সত্যিই ভাবিস আমাকে হারাতে পারবি?' ড্যানি ফোঁস করে উঠল।

রিভেরা ঘাড় নেড়ে নীরবে সম্মতি জানাল।

'শোনো—শোনো—অযৌক্তিক কথা বলো না।' কেলি অনুরোধ করে। 'তাছাড়া তোমার নামটা কত প্রচার হবে ভেবে দ্যাখো!'

'আমি টাকা চাই।'

'হাজার কয়েক বছর চেষ্টা করলেও আমাকে হারাতে পারবি না।' ড্যানি ওকে যেন আশ্বস্ত করতে চায়।

'তাহলে আর তোমার আপত্তির কারণ কি?' পাল্টা প্রশ্ন করল

রিভেরা। 'জেতা যদি এতই সোজা, পুরো টাকাটা পাবার ব্যবস্থা পাকা না করার কারণটা কী?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ—খুবই সোজা। তাই করবো—পুরো টাকাটাই নেবো!' হঠাৎ মনস্থির করে চেঁচিয়ে ওঠে ড্যানি। 'ওই রিঙের মধ্যেই তোকে পিটিয়ে খুন করে ফেলে দেবো। শুধু শুধু হাঙ্গামা বাধাবার এই সাজা। কেলি! চুক্তিপত্র তৈরি করো! যে জিতবে সেই পুরো টাকা পাবে। খেলার পাতায় খবরটা দিয়ে দিও। প্রেস্টিজের লড়াই বলে ঘোষণা করো। এই ছোঁড়াটাকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার।'

কেলির সেক্রেটারি লিখতে শুরু করেছিল। হঠাৎ ড্যানি বাধা দিল।

'দাঁড়াও!' রিভেরার দিকে তাকাল ড্যানি। 'ওজন?'

'রিঙের ধারে।' রিভেরা উত্তর দিল।

'আজ্ঞে না। বিজয়ী যদি সব পায় তাহলে সকাল দশটায় ওজন হবে।'

'তাহলেই বিজয়ী সবটা পাবে?' রিভেরা প্রশ্ন করল।

ড্যানি ঘাড় নাড়ল। আর চিন্তার কিছু নেই। পুরো ক্ষমতা সমেত লড়াইয়ের আসরে নামবে সে।

'ঠিক আছে, সকাল দশটায় ওজন।' রিভেরা বলল।

সেক্রেটারি লিখে নিল।

'তার মানেই কিন্তু পাঁচ পাউণ্ড।' রবার্ট অভিযোগ জানাল রিভেরার কাছে। 'তুমি বোকামি করলে কিন্তু, হারবার ব্যবস্থা পাকা করে দিলে নিজেই। ষাঁড়ের মতো ক্ষমতা নিয়ে রিঙে ঢুকবে ড্যানি। এর পর আর তোমার কোন আশাই রইল না জেতবার।'

উত্তরের বদলে রিভেরা শুধু হিসেব করা ঘৃণাটুকু চোখে নিয়ে তাকাল। রবার্ট যতই ভাল হোক—ইয়াঙ্কী তো! রবার্টকেও ও ঘৃণা করে।

॥ ৪ ॥

প্রায় সবার অলক্ষ্যে রিঙের মধ্যে ঢুকল রিভেরা। গুটি কয়েক দর্শক শুধু এদিক ওদিক থেকে নিষ্প্রাণ ভাবে হাততালি দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। কারুরই বিন্দুমাত্র আস্থা নেই রিভেরার ওপর। রিভেরা ওদের চোখে বলির পাঁঠা আর গুরুদেব ড্যানি তার ঘাতক। তাছাড়া দর্শকরা হতাশও হয়েছে। ড্যানি ওয়ার্ড আর বিলি কার্থির ক্ষিপ্র যুদ্ধ দেখবে আশা করেছিল সবাই। এখন দুধের সাধ মেটাতে হবে ঘোল দিয়ে। এই ছোঁড়াটা আর কী করবে! ব্যাপারটাতে ওদের আদৌ যে কোন সমর্থন নেই সেটা ব্যক্ত হয়েছে দর্শকরা ড্যানির হয়ে টু-টু-ওয়ান, এমন কী থ্রি-টু-ওয়ান হিসেবে বাজি ধরায়। আর দর্শকরা যার হয়ে বাজি ধরে তাকেই তারা মনে প্রাণে সমর্থন করে।

মেক্সিকান ছেলেটি তার নিজের কোণে বসে অপেক্ষা করছে। সুদীর্ঘ মিনিটগুলো যেন আর পেরোতে চায় না। ড্যানি ইচ্ছে করে দেরী করছে। এই কায়দাটা পুরোনো হলেও তরুণ নবীন যোদ্ধাদের কিন্তু আজও অসুবিধায় ফেলে দেয়। এইভাবে বসে থাকা মানেই নিজের মনের আশঙ্কাগুলোর আর হৃদয়হীন তামাক-খেকো দর্শকদের সম্মুখীন হওয়া। আস্তে আস্তে ভয়টা তাদের মনে জাঁকিয়ে বসে। কিন্তু এই প্রথম কায়দাটা বিফল হল। ঠিকই বলেছিল রবার্ট, রিভেরার শরীরে ভয় বলে বস্তুটিই নেই। এত অনুভূতি প্রবণ আর আবেগদীপ্ত রিভেরা কিন্তু ভীতিসঞ্চারী স্নায়ুগুলোই যেন তার দেহে অনুপস্থিত। তার নিজের সহকারীরা পর্যন্ত আসন্ন পরাজয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে আবহাওয়া গুমোট করে তুলেছে কিন্তু তবু বিকার নেই রিভেরার। কয়েকজন গ্রিঙ্গো আর অপরিচিত লোক রিভেরাকে সাহায্য করছে। এরা মুষ্টিযুদ্ধের দুনিয়ার নোংরা তলানি—গৌরবহীন, যোগ্যতাহীন। তাছাড়া তারা যে পরাজিতের দলে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই তাদের।

'খুব সাবধান কিন্তু—' স্পাইডার হ্যাগার্টি সাবধান করে দেয়।

ও রিভেরার দ্বিতীয় সহকারী। 'যতক্ষণ পারো লড়াই চালিয়ে যেও। কেলি আমাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন। তা না হলে খবরের কাগজে গট্-আপ লড়াই বলে খবর ছেপে দেবে। বক্সিঙের খেলার আরো দুর্নাম রটবে লস অ্যাঞ্জেলেসে।'

কথাগুলো নিশ্চয় উৎসাহব্যঞ্জক নয়। কিন্তু রিভেরা কোন কান দেয় না। পয়সার জন্যে লড়াই করাকে রিভেরা ঘৃণা করে। ঘৃণিত গ্রিঙ্গোদের ঘৃণিত খেলা। হাঁড়িকাঠে যেমন ছাগল মাথা দেয় ঠিক তেমনিভাবে ওদের প্রশিক্ষণের আখড়ায় শুধু মার খাবার জন্যেই ঢুকেছিল রিভেরা। শুধু দু'মুঠো অন্নের প্রয়োজনে। মুষ্টিযুদ্ধে এক অসাধারণ ও জন্মগত নৈপুণ্যের অধিকারী হয়েও মুষ্টিযুদ্ধকে সে ঘৃণা করে। পার্টিতে যোগ দেবার আগে পয়সার জন্যে সে কোনদিন লড়তে নামেনি কিন্তু তবু লড়তে নেমে পয়সা সে অত্যন্ত সহজেই উপার্জন করেছে। মনুষ্যবংশে রিভেরাই অবশ্য প্রথম নয় যে অবাঞ্ছিত পেশায় সাফল্য অর্জন করেছে।

কোন বিশ্লেষণের মধ্যে যাচ্ছেনা রিভেরা। সে শুধু জানে এই লড়াইটা তাকে জিততে হবে। এর কোন অন্যথা হওয়া সম্ভব নয়। রিভেরার এই দৃঢ় বিশ্বাসের পিছনে যে প্রচণ্ড শক্তিগুলো কাজ করছে, দর্শককুলের পক্ষে তার সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। ড্যানি ওয়ার্ড লড়ছে পয়সার জন্যে—পয়সা দিয়ে যে সহজ সুখ কেনা যায় তার জন্যে। কিন্তু রিভেরার লড়াইয়ের কারণগুলো তার মগজের মধ্যে জ্বলছে—কতকগুলো ভয়ঙ্কর আর জ্বলন্ত চিত্র। রিঙের কোণে একা বসে সুচতুর প্রতিপক্ষের দিকে সজাগ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আর বাস্তব জীবনের মুহূর্তগুলোর মতোই সত্য হয়ে উঠছে মানসপটের চিত্রগুলো।

রিও ব্ল্যাঙ্কোর সাদা পাঁচিলঘেরা জলশক্তি চালিত কারখানাগুলো দেখতে পায় রিভেরা। দেখতে পায় অনাহারে ক্ষীণ দেহ ছ'হাজার শ্রমিক আর সাত আট বছর বয়সের অসংখ্য শিশুকে। সারাদিন ধরে খেটে মরছে দশ সেণ্ট দৈনিক মজুরির জন্যে। দেখতে পায়

ঠেলাগাড়িতে করে লাশ বওয়া হচ্ছে। দেখতে পায় রঙ-ঘরের শ্রমিকদের মৃত্যু চিহ্নিত বীভৎস মস্তকগুলো। মনে পড়ে যায় বাবা বলেছিলেন, 'রঙ-ঘর মানেই আত্মহত্যার জায়গা'—এক বছর কাজ করা মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। ছোট্ট সেই ঘরখানার ছবি ভেসে আসে চোখের সামনে, মা রান্না করছে, ভাঙাচোরা সংসার ঠেলতে হিমশিম খাচ্ছে, আর তারই মধ্যে ঠিক সময় করে রিভেরাকে আদর করছে, ভালবাসছে। বাবাকেও দেখতে পায় রিভেরা। বিশাল চেহারা, একঝোড়া গোঁফ, পেশীবহুল বক্ষ, সবার জন্যে বুকভরা ভালবাসা। হৃদয়টা তাঁর এত বড় যে সবাইকে ভালবাসার পরেও মায়ের জন্যে, আর ঘরের কোণে যে শিশুটি খেলা করতো তার জন্যে ভালবাসা তাঁর উপচে উপচে পড়তো। তখনো ওর ফিলিপ রিভেরা নামকরণ হয়নি। বাবা মার নাম অনুযায়ী নাম ছিল ফার্নাণ্ডেজ। সবাই জুয়ান বলে ডাকতো। পরে ও নিজেই নামটা পাল্টে নিয়েছে। পুলিশের কর্তা ব্যক্তিরা ফার্নাণ্ডেজ নামটাকে ঘৃণা করে।

জোয়াকুইন ফার্নাণ্ডেজ! বিশাল দেহ, অনন্ত ভালবাসা। তখন বোঝেনি রিভেরা, কিন্তু আজ পিছন দিকে তাকিয়ে সব বুঝতে পারছে! রিভেরা দেখতে পায় তার বাবা ছোট্ট ছাপাখানাটায় বসে টাইপ বসাচ্ছে। অগোছালো টেবিলটার সামনে বসে এক নাগাড়ে দ্রুত লিখে যাচ্ছে কী সব হিজিবিজি। সেইসব অদ্ভুত সন্ধ্যাবেলার কথা মনে পড়ে যায় রিভেরার। অন্ধকারে গোপনে চোরের মতো আসতো মজুররা। বাবার সঙ্গে দেখা করতো, ঘন্টার পর ঘন্টা কথাবার্তা বলতো। রিভেরা তখন তার বিছানায় শুয়ে থাকলেও সব সময় ঘুমিয়ে থাকতো না।

স্পাইডার হ্যাগার্টির কথাগুলো যেন কোন্ সুদূর থেকে তার কানে ভেসে আসে, 'প্রথমেই সরে দাঁড়ানো চলবে না। কেলি বলে দিয়েছেন। ভালমতো মার খাও তবে পয়সা।'

দশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। এখনো নিজের জায়গায় বসে আছে রিভেরা কিন্তু ড্যানির পাত্তা নেই। চালবাজিরও একটা সীমা আছে!

রিভেরার মানসচক্ষে আরো অনেক স্মৃতি ছবির মতো ধরা পড়ে। সেই স্ট্রাইক—স্ট্রাইক না বলে লক্ আউট বলাই ভালো, কারণ রিও ব্ল্যাঙ্কোর শ্রমিকরা তখন পুয়েব্লোর ধর্মঘটী ভাইদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল। খিদের জ্বালা, পাহাড় চষে বুনো বেরি ও গাছ গাছড়ার শেকড় বাকড় যোগাড় করে পেট ভরানো আর তারপর সবার পেট কামড়ানি আর অসহ্য যন্ত্রণা! তারপরে সেই দুঃস্বপ্নের রাত—স্টোর ঘরের সামনে ফাঁকা মাঠ, হাজার হাজার ভুখা শ্রমিক, জেনারেল রোজালিও মার্টিনেজ ও পরফিরিও ডায়াজের সৈন্যবাহিনী; মৃত্যুবর্ষী রাইফেলের নিরন্তর গর্জন। শ্রমিকদের গায়ের তাজা খুন ঝরিয়েই শ্রমিকদের সমস্ত অপরাধ ধুয়ে সাফ করে দেওয়া। সেই রাত! সেই রাতেই ও দেখেছিল ঠেলাগাড়ি বোঝাই করে লাশের গাদা চলেছে ভেরাক্রুজের দিকে। সমুদ্রের হাঙরদের খাদ্য হতে! মৃত দেহের ভয়াল স্তূপের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে রিভেরা তার বাবা মায়ের ছিন্নভিন্ন দেহদুটির খোঁজ পেয়েছিল। মায়ের কথা আরো ভাল করে মনে আছে। মুখটা শুধু বাইরে বেরিয়েছিল, দেহটা চাপা পড়েছিল ডজন খানেক লাশের নীচে! সেই মুহূর্তে আবার গর্জে উঠেছিল পরফিরিও ডায়াজের সৈন্যদের রাইফেলগুলো। রিভেরা সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়েছিল জমির ওপর। শিকারীর চোখে ধুলো দিয়ে পাহাড়ী চিলের মতো সরে পড়েছিল।

সমুদ্র গর্জনের মতো প্রচণ্ড একটা শব্দ কানে এল রিভেরার। প্রশিক্ষক আর সহকারীদের পিছনে নিয়ে ড্যানি ওয়ার্ড এগিয়ে আসছে দর্শকদের মধ্যে দিয়ে। জনপ্রিয় নায়কের নিশ্চিত বিজয় জেনেই দর্শকরা উন্মত্ত চিৎকারে ফেটে পড়ল। সবাই ওকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে, সবাই ওর পক্ষে। এমন কী ড্যানি যখন কায়দা মেরে রিঙের দড়ি গলে ভেতরে লাফিয়ে ঢুকল, রিভেরার সহকারীরা পর্যন্ত কিঞ্চিত খুশী বোধ না করে পারেনি। অবিরাম হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে ড্যানির মুখখানা। ড্যানি যখন হাসে তার মুখের প্রতিটি অংশ তাতে অংশ গ্রহণ করে। চোখের কোণে কুঞ্চিত রেখা আর চোখের গভীরে

তার সুস্পষ্ট প্রকাশ। এত উৎফুল্ল বক্সার সচরাচর দেখা যায়না। তার মুখখানা সৌজন্য আর মিত্রতার একখানি সচল বিজ্ঞাপন। প্রত্যেকে ওর পরিচিত। দড়ির এপাশ থেকেই বন্ধুদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করছে। যারা দূরে রয়েছে প্রশংসা করার সুযোগ না পেয়ে চেঁচিয়ে উঠছে, 'সত্যি ড্যানি! পারো বটে।' পুরো পাঁচ মিনিট ধরে শুধু অভ্যর্থনা চলে। রিভেরা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। দর্শকরা তার অস্তিত্বই স্বীকার করছেনা। স্পাইডার হ্যাগার্টির ফুলো মুখটা ঝুঁকে পড়ে রিভেরার ওপর।

'ঘাবড়ে যেও না।' সতর্ক করে দেয় স্পাইডার। 'নির্দেশগুলো মনে থাকে যেন। টিকে থাকতে হবে। শুয়ে পড়লে চলবে না। শুয়ে পড়লে কিন্তু ড্রেসিঙরুমে আমরা তোমায় পিটিয়ে তক্তা বানাব। বুঝেছ তো? লড়তেই হবে।'

দর্শকদের হাততালি শুরু হয়ে গেছে। ড্যানি রিঙ পেরিয়ে রিভেরার দিকে এগিয়ে আসে। দু'হাত একত্রিত ক'রে রিভেরার ডান হাতটা ধরে ঝাঁকায়। সহৃদয়তায় উদ্বেল। ড্যানির হাসিমাখা মুখখানা রিভেরার মুখের খুব কাছেই রয়েছে। ড্যানির খেলোয়াড়ি মনোভাবের পরিচয় পেয়ে দর্শকরা চেঁচিয়ে উঠে তাকে তারিফ জানায়। ভ্রাতৃবৎ স্নেহে তার বিপক্ষকে সে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। ড্যানির ঠোঁটদুটো নড়ে ওঠে। দর্শকরা ধরে নেয় অশ্রুত শব্দগুলো নিশ্চয় শ্রুতিমধুর। আবার হর্ষধ্বনি করে ওঠে সকলে। ইতর শব্দগুলো শুধু রিভেরাই শুনেছে।

'শোন্‌ বে' মেক্সিকান ছুঁচো!' খুশী আর হাসিভরা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করে ওঠে ড্যানি। 'তোর কত তেল আছে আজ দেখবো।'

রিভেরা একটুও নড়ে না। উঠেও দাঁড়ায়নি। ওর চোখদুটোই শুধু ঘৃণা বর্ষণ করে।

'উঠে দাঁড়া শালা কুত্তার বাচ্চা!' পেছনে রিঙের ওধার থেকে কারা যেন চেঁচায়।

তার অখেলোয়াড়ি ব্যবহারের জন্যে সিটি মেরে আওয়াজ দিয়ে

ধিক্কার জানায় জনতা। তবু নির্বিকার বসে আছে রিভেরা। ড্যানি নিজের দিকে ফিরে আসার সময় আরেকবার হর্ষধ্বনি ওঠে।

ড্যানি পোশাক ছাড়তেই সবাই আনন্দে 'উঃ!' 'আঃ!' ক'রে ওঠে। নিখুঁত শরীরখানা। স্বাস্থ্য ক্ষমতা আর নমনীয় মাংসপেশীর সজীবতা পূর্ণ। নারী দেহের মতো ফর্সা আর মসৃণ তার গায়ের চামড়া। ওইখানেই সব লাবণ্য, সহ্য ক্ষমতা আর শক্তির আবাস। ড্যানি তার প্রমাণও রেখেছে বেশ কয়েক গণ্ডা লড়াইয়ে। স্বাস্থ্য-চর্চার সব মাসিক পত্রিকাতেই তার ছবি ছাপা হয়।

স্পাইডার হ্যাগার্টি রিভেরার মাথা দিয়ে শোয়েটারটা টেনে খুলে নিতেই একটা গোঙানির মতো আওয়াজ ওঠে চারধারে। রঙটা কালো বলে রিভেরাকে আরো রোগা দেখাচ্ছে। ওরও পেশীবহুল চেহারা কিন্তু ড্যানির মতো চটক নেই। দর্শকরা যেটা খেয়াল করে ছাখেনি সেটা ওর বুকের মাংসপেশী। তার দেহের সুদৃঢ় তন্তু ও মাংসপেশীর ঐকবদ্ধ তাৎক্ষণিক ক্ষিপ্রতার কথা দর্শকদের জানবার উপায় নেই। তারা বুঝতেও পারেনি যে অতি সূক্ষ্ম কতকগুলো স্নায়ু সারা দেহ জুড়ে জাল বিছিয়ে রিভেরাকে এক অসামান্য যুদ্ধযন্ত্রে পরিণত করেছে। দর্শকদের চোখে রিভেরা শুধু খয়েরি চামড়াওলা আঠার বছরের এক বালক। শরীরটাও তার বালকেরই মতো। ড্যানি চব্বিশ বছরের পুরুষ—শরীরটাও তার পুরুষেরই মতো। তাদের এই বৈপরীত্য আরো স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে দু'জনে যখন রেফারির শেষ নির্দেশ শোনার জন্যে রিঙের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়।

রিভেরা লক্ষ্য করে সাংবাদিকদের পিছনে বসে আছে রবার্ট। আরো বেশী মদ খেয়েছে আজ। আরো আস্তে আস্তে কথা বলছে।

'ঘাবড়ো না রিভেরা।' জড়িত কণ্ঠে বলতে থাকে রবার্ট। 'মনে রেখো ও কখনোই তোমাকে খুন করতে পারবে না। শুরুতেই ও তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে কিন্তু তাতে বিচলিত হয়ো না। নিজেকে শুধু আড়াল করো, এড়িয়ে যেও, জাপটে ধরো। তোমাকে

এমন কিছু আঘাত করতে পারবে না। শুধু ভেবো তোমার ওপর কেউ ঘুষি চালিয়ে হাত পাকাচ্ছে। যেমন হতো আখড়ায়।'

রিভেরার লক্ষণ দেখে বোঝা গেল না কথাগুলো তার কানে ঢুকেছে কিনা।

'খুদে শয়তান। মুখে একটি কথা নেই।' রবার্ট তার পাশের ভদ্রলোককে বিড়বিড় করে বলল। 'চিরকালই এমনি।'

এই প্রথম রিভেরা ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে চাইল না। হাজার হাজার রাইফেলের ছবি ভেসে উঠে তার দৃষ্টি অবরোধ করেছে। রিঙের কাছের বহুমূল্য সীট থেকে শুরু করে যতদূর দৃষ্টি যায় প্রতিটি দর্শকের মুখ এক একটি রাইফেলে রূপান্তরিত হয়েছে। মেক্সিকোর রৌদ্রদগ্ধ সুদীর্ঘ সীমানারেখার ছবিটা দেখতে পাচ্ছে রিভেরা। ওই সীমানা বরাবর অপেক্ষা করছে অসংখ্য পোড়খাওয়া মানুষ। অপেক্ষা করছে শুধু রাইফেলের জন্যে।

রিভেরা তার নিজের কোণে দাঁড়িয়ে আছে। সহকারীরা ক্যানভাসের টুলটা নিয়ে দড়ি গলে বেরিয়ে গেছে। চৌকো রিঙের অপর কোণে ওর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে ড্যানি। ঘণ্টা পড়তেই লড়াই শুরু হয়ে গেল। খুশীর অট্টরোলে ঘর কাঁপিয়ে তোলে দর্শকরা। তারা কখনো এমন আশাব্যঞ্জক ভাবে কোন লড়াই শুরু হতে দেখেনি। কাগজে ঠিকই লিখেছিল। প্রেস্টিজের লড়াই। দু'জনের মধ্যের দূরত্বের তিন-চতুর্থাংশ পার করে একাই ছুটে এল ড্যানি। মেক্সিকান ছেলেটাকে একেবারে শেষ করে ফেলার ইচ্ছেটা আদৌ গোপন থাকেনি। একটা নয়, দুটো নয়, এক ডজন ঘুষি হাঁকিয়েও ক্ষান্ত হয়নি ড্যানি। ঘুষির ঘূর্ণিঝড় তুলেছে। ধ্বংসের তাণ্ডব। হতচকিত রিভেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ঘুষির বন্যায়। যেখান-যেখান থেকে, যে-যে ভাবে ঘুষি চালানো যায়, তার কোনটাই বাকী রাখেনি বক্সিঙ শিল্পের কলাকার। মারের চোটে পিছু হটে দড়ির গায়ে আছড়ে পড়ে রিভেরা। রেফারি দু'জনকে ছাড়িয়ে দেয় কিন্তু আবার মার খেয়ে দড়ির ওপর এসে পড়ে।

এটা লড়াই নয়—নিষ্ঠুর নরহত্যা। পেশাদার বক্সিঙের আসর ছাড়া অন্য যে-কোন জায়গা হলে এই এক মিনিটের মধ্যেই দর্শকদের সব উদ্দীপনা নিঃশেষ হয়ে যেত। ড্যানি সত্যিই তার ওস্তাদি দেখাচ্ছে—অপূর্ব জৌলুস। দর্শকরা এত নিশ্চিত, এত উত্তেজিত তারা, পক্ষপাতিত্ব এমন ভাবে তাদের ওপর জাঁকিয়ে বসেছে যে কেউই খেয়াল করেনি যে মেক্সিকান ছেলেটি এখনো নিজের পায়ে ভর রেখেই দাঁড়িয়ে আছে। রিভেরাকে তারা ভুলেই গেছে। ওকে তারা দেখতেই পাচ্ছে না। ড্যানির মানুষখেকো আক্রমণের তলায় একেবারে ঢাকা পড়ে গেছে রিভেরা। এক মিনিট, দেখতে দেখতে দু'মিনিট পেরিয়ে গেল। এতক্ষণে দু'জনে একটু সরে দাঁড়াতে দর্শকরা রিভেরাকে দেখতে পেল। ঠোঁট কেটে গেছে, নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। দড়িতেও রক্ত লেগেছে আর সেই দড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানোর জন্যে রিভেরার পিঠটায় রক্তের ডোরা কাটা। একটা জিনিস কিন্তু দর্শকদের নজরে পড়েনি। রিভেরা একটুও হাঁপাচ্ছে না, আগের মতোই তার দু'চোখে সেই নিরুত্তাপ আগুন। প্রশিক্ষণের আখড়ায় বহু উঠতি চ্যাম্পিয়ানই তার ওপর এই রকম নিষ্ঠুর মানুষ-খেকো আক্রমণ চালিয়েছে। ক্ষতিপূরণ বাবদ লড়াই পিছু আধ ডলার থেকে শুরু করে ফি সপ্তাহে পনেরো ডলার অবধি উপার্জন করেছে শুধু প্রাণটাকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে। কঠিন পথে কঠিন শিক্ষায় শিক্ষিত রিভেরা!

এবার একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। হঠাৎ থেমে গেল চোখ-ধাঁধানো দাপাদাপি ঝটাপটি। একা দাঁড়িয়ে আছে রিভেরা। ড্যানি, হ্যাঁ অবিসংবাদিত ড্যানিই উল্টে পড়ে আছে। চৈতন্য ফিরে পাবার প্রয়াসে কেঁপে কেঁপে উঠছে শরীরটা। টলমল করে পড়ে যায়নি ড্যানি, বিনা কারণে লুটিয়ে পড়েনি। অকস্মাৎ মাঝ আকাশে গুলিবিদ্ধ হবার মতো রিভেরার ডান হাতের হুক্ ওকে ধরাশায়ী করেছে। রেফারি এক হাতে রিভেরাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ভূলুণ্ঠিত বীরের ওপর ঝুঁকে পড়ে সেকেণ্ড গণনা শুরু করে। পেশাদার

বক্সিঙের আসরের রীতি অনুযায়ী সরাসরি নক্‌ডাউন আঘাত হানতে পারলেই দর্শকরা অভিনন্দন জানায়। আজকে কিন্তু তার ব্যতিক্রম ঘটল। একেবারেই অপ্রত্যাশিত ঘটনাটা। নীরব উৎকণ্ঠা নিয়ে সবাই সেকেণ্ড গণনা লক্ষ্য করছে। একা রবার্টের উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর নীরবতা ভঙ্গ করেছে।

'বলেছিলাম না ওর দু'হাতই সমান চলে!'

পঞ্চম সেকেণ্ডে ড্যানি উপুড় হয়ে শুল। সাত সেকেণ্ড গোনা হতেই দেখা গেল হাঁটুর ওপর ভর রেখে বসেছে, যাতে নয় গোনা হলেই এবং দশ গোনার আগেই খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে। দশ উচ্চারণ করার সময় তার হাঁটু যদি মেঝে ছুঁয়ে থাকে তাহলে ধরা হবে সে উঠতে পারেনি—অর্থাৎ পরাজিত। ওর হাঁটুদুটো মেঝের স্পর্শ ত্যাগ করা মাত্র ধরা হবে সে উঠেছে এবং সেই মুহূর্তেই তাকে আবার মেরে শুইয়ে দেবার ন্যায্য অধিকার আছে রিভেরার। রিভেরা কোন সুযোগ ছাড়তে চায় না। মেঝে থেকে হাঁটু ওঠা মাত্র ঘুষি চালাবে। ড্যানির চারদিকে চক্কর মারে রিভেরা কিন্তু ওদিকে রেফারি আবার ড্যানি আর রিভেরার মাঝখানে প্রদক্ষিণ শুরু করে দিয়েছে। রিভেরা জানে রেফারি ইচ্ছাকৃত ভাবে সেকেণ্ড গণনা প্রলম্বিত করছে। সব ব্যাটা গ্রিঙ্গো তার বিরুদ্ধে, এমন কী রেফারীও বাদ নেই।

রেফারি 'নয়' হাঁকার সঙ্গে সঙ্গে অন্যায় ভাবে রিভেরাকে সজোরে একটা ধাক্কা মেরে পিছনে ঠেলে দেয়। এই সুযোগে উঠে দাঁড়ায় ড্যানি। তার ঠোঁটের কোণে আবার হাসি ফুটে ওঠে। কিছুটা কুঁজো হয়ে হাত দিয়ে মুখ আর তলপেট ঢেকে ড্যানি কোনক্রমে রিভেরাকে জাপটে ধরে। খেলার নিয়ম অনুযায়ী এই আলিঙ্গন ভঙ্গ করাই রেফারির কর্তব্য। রেফারি কিন্তু তা করেনি। ডুবন্ত মানুষের মতো রিভেরাকে আঁকড়ে ধরেছে ড্যানি। এক একটা মুহূর্ত পেরচ্ছে আর সেই সঙ্গে ক্রমশ হৃত শক্তি পুনরুদ্ধার করছে। রাউণ্ডের শেষ এক মিনিট দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে। কোনক্রমে এই রাউণ্ডটা টিকে যেতে পারলে পুরো এক মিনিট অবসর পাবে। ড্যানি

টিকেও গেল শেষপর্যন্ত। চরম বিপর্যস্ত অবস্থাতেও মুখে তার হাসি লেগেছিল।

'ও হাসি ঘোচার নয়।' কে যেন চেঁচিয়ে উঠল। দর্শকরা এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হাসল।

'বাঞ্চতের ঘুষি যা না, ভয়ঙ্কর।' টুলে বসে হাঁসফাঁস করতে করতে ড্যানি তার প্রশিক্ষককে বলল। সহকারীরা দ্রুত বেগে তার পরিচর্যা শুরু করে দিয়েছে।

দ্বিতীয় আর তৃতীয় রাউণ্ডে ঝিমোনো খেলা একেবারেই জমলো না। চতুর ড্যানির অভিজ্ঞতাও কম নয়। শুধু মার বাঁচিয়ে বা এড়িয়ে আত্মরক্ষা করে গেছে। প্রথম রাউণ্ডের বিবশ করা আঘাতের জের কাটাবার জন্যে সময় নিচ্ছে। চতুর্থ রাউণ্ডে আবার নিজমূর্তি ধরল ড্যানি। আত্মবিশ্বাসে বেশ খানিকটা চিড় খেয়েছে কিন্তু তবু সুস্বাস্থ্যের দৌলতে সে তার শক্তি ফিরে পেয়েছে। ড্যানি কিন্তু আর তাণ্ডবলীলা চালাচ্ছে না। বন-মানুষের ক্ষমতা এই মেক্সিকান ছোঁড়াটার। সেইজন্যেই ড্যানি এবার তার শিক্ষাকে কাজে লাগাচ্ছে। কী কৌশলে, কী দক্ষতায় বা অভিজ্ঞতায় ড্যানির তুলনা নেই। মারাত্মকভাবে কোন আঘাত হানতে না পারলেও অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে একের পর এক আঘাতের মাধ্যমে প্রতি-পক্ষকে ও ক্রমশ দুর্বল করে দিতে চাইছে। রিভেরা একটা ঘুষি চালায় তো ও চালায় তিনটে কিন্তু তার কোনটাই লড়াই জেতার মতো নয়। একটা বিচ্ছিন্ন আঘাত হিসাবে কার্যকর না হলেও সামগ্রিক ভাবে বিচার করলে জয় পরাজয় নির্ধারণে এর অসীম গুরুত্ব। রিভেরাকে এখন শ্রদ্ধার চোখে দেখছে ড্যানি। ছোঁড়াটার ডান বাঁ দুটো হাতই সমান চলে। বিস্ময়কর ক্ষমতা ওর সর্ট আর্ম কিক্‌গুলোর।

লড়াই চলাকালীন রিভেরা আত্মরক্ষার পদ্ধতি হিসেবে অত্যন্ত অস্বস্তিকর স্ট্রেট লেফ্‌ট মার চালাতে শুরু করল। বার বার আক্রমণের পর আক্রমণ সে স্ট্রেট লেফ্‌ট মেরে ড্যানিকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। বার

বার চোট লাগছে চোখে আর নাকে। ড্যানির প্রতিভা কিন্তু বহুমুখী, এইজন্যেই সে চ্যাম্পিয়ান হতে চলেছে। ইচ্ছানুসারে যে কোন সময় সে লড়াইয়ের পদ্ধতি পরিবর্তন করে নিতে পারে। ড্যানি এবার ইন্-ফাইটিঙ পদ্ধতিতে খুব কাছ থেকে আঘাত হানতে শুরু করে। ইন্-ফাইটিঙের শয়তানিতে ড্যানি সিদ্ধহস্ত। তাছাড়া এর ফলে রিভেরার স্ট্রেট লেফ্ট মার্গুলোও এড়িয়ে যাওয়া যাচ্ছে। বার বার অগণিত দর্শক উল্লাসে ফেটে পড়ে। উল্লাস চরমে পৌছয় ড্যানি কৌশলে নিজেকে বন্ধন মুক্ত করে উর্ধ্বমুখী আপারকাট মেরে রিভেরাকে একেবারে শূন্যে তুলে মাটিতে আছড়ে ফেলাতে। রিভেরা এক হাঁটুর ওপর ভর রেখে সেকেণ্ড গণনার যতদূর সম্ভব সুযোগ নিতে চায়। পরিষ্কার বুঝতে পারছে যে রেফারি এক একটা সেকেণ্ড পেরোবার আগেই এক দুই গুনে চলেছে।

সপ্তম রাউণ্ডে ড্যানি আবার সেই নৃশংস ইন্সাইড আপারকাট ঝাড়ল। রিভেরা শুধু টলে গেছল কিন্তু অসুরক্ষিত অসহায়তার পরবর্তী মুহূর্তটিতে ড্যানি তাকে আরেক ঘুষির আঘাতে একেবারে দড়ি গলিয়ে ফেলে দিল। নীচে দৈনিক কাগজের সাংবাদিকদের মাথার ওপর গিয়ে পড়ল রিভেরা! সাংবাদিকরা তাকে ঠেলে তুলে দিল দড়িঘেরা মঞ্চের বাইরের দিকের কিনারার ওপর। রিভেরা ওইখানেই একটা হাঁটুর ওপর ভর রেখে বসল। রেফারি যেন কোনক্রমে সময়টা পার করে দেবার জন্যে দ্রুত আওড়ে চলেছে—এক, দুই……দড়ির ভেতরে মঞ্চের ওপর অপেক্ষা করছে ড্যানি। এই দড়ি গলেই রিভেরাকে মঞ্চে প্রবেশ করতে হবে। রেফারি কিন্তু মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে ড্যানিকে কোন বাধা দেয়নি বা ধাক্কা মেরে হাটিয়ে দেয়নি।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছে প্রতিটি দর্শক।

‘শেষ করে দাও ড্যানি! খতম করে দাও।’ চিৎকার করছে লোকে। এক এক ক’রে এখন সবাই চেঁচাতে শুরু ক’রে দিয়েছে। সম্মিলিত কণ্ঠের চিৎকার যেন নেকড়ের পালের রণসঙ্গীতের মতো লাগে।

ড্যানি চেষ্টার কসুর করেনি কিন্তু নয় গোনা অবধি অপেক্ষা না করে, আট গোনা মাত্র রিভেরা অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ দড়ি গলে ভেতরে ঢুকেই জাপটে ধরল ড্যানিকে। এবার সক্রিয় হয়ে উঠল রেফারি। জোর করে টেনে ছাড়িয়ে নিল রিভেরাকে। আবার তার মার্ খাবার ব্যবস্থা পাকা করে দিল। একজন দুর্নীতিপরায়ণ রেফারির পক্ষে যে যে সুবিধে দেওয়া সম্ভব, ড্যানিকে তার সবগুলোই দেওয়া হয়েছে।

রিভেরা কিন্তু টিকে গেল। আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেছে। ইয়াঙ্কী মাত্রেই ঘৃণার পাত্র এবং ইয়াঙ্কী মাত্রেই দুর্নীতিগ্রস্ত। সবচেয়ে মুস্কিল হচ্ছে এরই মধ্যে ওর মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে বারবার ঝলসে উঠছে হরতালের পর বিও ব্ল্যাঙ্কো ছেড়ে আসার সময় দেখা যাত্রা-পথের দু'ধারের ভয়াবহ আর কদর্য চিত্রগুলো—মরুভূমির বুক-চেরা ঝকঝকে রেললাইন, আমেরিকার পুলিশ বাহিনী, জলাধারের সামনে ভবঘুরেদের ভিড়, জেলখানা। একই সঙ্গে রিভেরা দেখছে উজ্জ্বল গৌরবময় সুমহান বিপ্লব রক্তরঙে তার দেশকে আদিগন্ত রাঙিয়ে দিচ্ছে। রাইফেলগুলো তো তার চোখের সামনেই রয়েছে। দর্শকদের ঘৃণ্য মুখগুলো এক একটা রাইফেল। এই রাইফেলের জন্যেই তার লড়াই। সে এখন নিজেই রাইফেল! সে নিজেই বিপ্লব! পুরো মেক্সিকোর হয়ে লড়ছে সে।

দর্শকরা ক্রমশই রিভেরার ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। কেন সে পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছেনা? সেই তো তাকে হারতেই হবে, তাহলে এই জেদ কেন? হাতে গোনা দু'চারজন শুধু রিভেরার সম্বন্ধে আগ্রহী। জুয়াড়ী দর্শকদের এই নির্দিষ্ট সংখ্যক সংখ্যালঘু অংশ চিরকালই বেশী ঝুঁকি নিয়ে বাজি ধরে। রিভেরার পক্ষে তারা দশে চার বা তিনে এক হিসেবে অর্থ লগ্নী করেছে।

রিভেরা ক'রাউণ্ড টিকবে তার ওপরেও প্রচুর বাজি ধরা হয়েছে। সাত রাউণ্ড এমন কি ছ'রাউণ্ড টিকবে না বলেও অনেকেই বহু অর্থ নিয়োগ করেছে। যারা এই বাজিতে জিতে গেছে তারাও এখন নিশ্চিন্ত

মনে তাদের প্রিয় মুষ্টিযোদ্ধাকে উৎসাহিত করতে হর্ষধ্বনির মাত্রা বৃদ্ধি করছে।

রিভেরার কিন্তু পরাজয় স্বীকারের কোন লক্ষণ নেই। অষ্টম রাউণ্ডে আরেকবার আপারকাট্ মারার চেষ্টা করে বিফল হয়েছে ড্যানি। নবম রাউণ্ডে আবার স্তম্ভিত করে দিল রিভেরা। আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় ছিল দু'জনে। হঠাৎ ত্বরিত গতি রিভেরার নর্তকের মতো নমনীয় দেহটা যেন পিছলে গিয়ে নিজেকে বন্ধন মুক্ত করে বেরিয়ে এল। দুই দেহের মধ্যবর্তী স্বল্প পরিসরের মধ্যেই রিভেরার ডান হাতটা কোমরের কাছ থেকে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে এল। ধরাশায়ী ড্যানি সময় গণনার পুরো সদব্যবহার করে তবে উঠল। দর্শকরা বিস্ময়ে অভিভূত। ড্যানিকে তার নিজের প্যাঁচেই কাত্ করে দিয়েছে। তার বিখ্যাত রাইট আপারকাট তার ওপরেই প্রয়োগ করেছে রিভেরা। 'নয়' হাঁকার পর মুহূর্তে রিভেরা কিন্তু কোন চেষ্টাই করল না ড্যানিকে আবার কাবু করার। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে রেফারি বাধা দেবার জন্যেই মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ রিভেরা যখন ওঠবার চেষ্টা করছিল অবস্থাটা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। রেফারী তখন ধারে কাছেও ছিল না।

দশম রাউণ্ডে রিভেরা দু'বার রাইট আপারকাট চালিয়েছে। কোমরের কাছ থেকে হাত চালিয়ে ড্যানির চিবুকের ওপর ঘুষি ঝেড়েছে। মরিয়া হয়ে ওঠে ড্যানি। মুখের হাসিটা মেলায়নি কিন্তু। আবার সে বেধড়ক ঘুষি চালাতে শুরু করে। যতই দাপট দেখিয়ে নাচনকোঁদন করুক না ড্যানি, রিভেরার তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। উল্টে রিভেরা এই ঘূর্ণিপাকের মধ্যেই ঠিক ঠাহর করে তিনটি মোক্ষম আঘাতে পরপর তিনবার ধরাশায়ী করেছে ড্যানিকে। ড্যানি আর আগের মতো তাড়াতাড়ি সামলে উঠতে পারছে না। একাদশ রাউণ্ডে দেখা গেল ড্যানির অবস্থা কাহিল। একাদশ থেকে চতুর্দশ রাউণ্ড ড্যানির জীবনের সবচেয়ে কলঙ্কময় অধ্যায়। একেবারে খোলসের মধ্যে ঢুকে কোন রকমে নিজেকে আড়াল করে যাচ্ছে

আত্মরক্ষার তাগিদে। শক্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এখন শুধু কোনক্রমে সময় অতিবাহিত করা। তাছাড়া সফল মুষ্টি-যোদ্ধার পক্ষে জানা সম্ভব এমন কোন বেআইনি পদ্ধতি নেই যা সে প্রয়োগ করছে না। কৌশলের আর তার শেষ নেই। কখনো জাপটে ধরার সময় এমন ভাবে ধাক্কা মারছে যেন ব্যাপারটা অনিচ্ছাকৃত, কখনো রিভেরার গ্লাভসপরা হাতটা চেপে ধরছে নিজের শরীর আর হাতের মধ্যে, কখনো রিভেরার নাকের ওপর গ্লাভস চেপে দম বন্ধ করে দিতে চাইছে। আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থাতেই ড্যানির রক্তাক্ত ও হাসি মাখা ঠোঁট দুটো বারবার অশ্রাব্য অকথ্য ভাষায় নোংরা কথা ছুঁড়ছে রিভেরার কানে। দর্শক থেকে শুরু করে রেফারি পর্যন্ত প্রত্যেকেই ড্যানির পক্ষে, ড্যানিকেই সাহায্য করছে। দর্শকরা জানে ড্যানি এখন কী চাইছে। এই অপরিচিত বিস্ময়ের হাতে কাবু হয়ে ড্যানি এখন শেষ ভরসা হিসেবে একটি মোক্ষম ঘুষি কশিয়ে ওস্তাদের শেষ মার দেবার কথা ভাবছে। ড্যানি প্রায় যেচে মার খাচ্ছে, ভাঁওতা দিচ্ছে, সরে যাচ্ছে পিছনে। সবের পিছনেই কিন্তু তার একটাই উদ্দেশ্য—একটা সুযোগ পাওয়া—একটা ছিদ্র —তাহলেই ও তার দেহের সমস্ত ক্ষমতা উজাড় করে ঘুষিটা ঝাড়বে। খেলার মোড় ঘুরিয়ে বাজিমাত করবে। ড্যানিও চায় নামকরা বক্সারদের মতো পরপর ডান হাত আর বাঁ হাত চালিয়ে তলপেট আর চোয়ালের ওপর মোক্ষম ঘুষি কশিয়ে খেলার দান উল্টে দিতে। সে সামর্থ্য ড্যানির আছে। লোকে বলে যতক্ষণ ড্যানি নিজের পায়ে ভর রেখে দাঁড়িয়ে থাকে ততক্ষণ তার হাতের জোরও পুরো-মাত্রায় বজায় থাকে।

দু' রাউণ্ডের মধ্যে অবসরের সময় রিভেরার সহকারীরা তার দিকে মোটেই নজর দেয় না। তোয়ালেগুলো বেশ কায়দা করেই নাড়াচ্ছে কিন্তু রিভেরার দমছুট ফুসফুসে বাতাস পৌঁছচ্ছে না। স্পাইডার হ্যাগার্টি তাকে উপদেশ দিচ্ছে কিন্তু রিভেরা জানে ওকে ভুল বোঝানো হচ্ছে। প্রত্যেকে ওর বিরুদ্ধে। চারপাশ থেকে ষড়যন্ত্র

কারীরা ওকে ঘিরে রেখেছে। চতুর্দশ রাউণ্ডে আবার ড্যানিকে ধরাশায়ী করে রিভেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিল। হাত দুটো নীচে পায়ের পাশে নামিয়ে রেখেছে। রেফারি এক দুই করে সেকেণ্ড গুনছে। ওদিকের কোণ থেকে কিছু সন্দেহজনক গুঞ্জন কানে আসে রিভেরার। মাইকেল কেলিকে দ্যাখে রবার্টে'র কাছে এগিয়ে এসে মুখ নীচু করে কানে কানে কথা বলতে। ভুখা বিড়ালের মতো শ্রবণ শক্তি রিভেরার। ছেঁড়া ছেঁড়া দু'চারটে কথা ঠিক শুনতে পেয়েছে। আরো শুনতে চায় রিভেরা। ড্যানি উঠতেই কায়দা করে লড়াইয়ের স্থান পরিবর্তন করে নেয়। ড্যানিকে জাপটে ধরে দড়ির ওপর এসে পড়ে।

'যে করেই হোক—' মাইকেলকে বলতে শোনে। রবার্ট ঘাড় নাড়ছে। 'যে করে হোক ড্যানিকে জিততেই হবে। না হলে সর্বনাশ। আমার এক গাদা টাকা—নিজের টাকা—বাজিতে লাগিয়ে বসে আছি। পনেরো রাউণ্ডেও যদি টিকে যায় তো ব্যস—একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে যাব। ও তোমার কথা শুনবে। যাহোক করে বোঝাও।'

রিভেরার চোখের সামনে আর স্মৃতিচিত্র ভাসছে না। এরা এবার তাকে টোপ খাওয়াতে চাইছে। আবার ও ড্যানিকে ধরাশায়ী করে হাত ঝুলিয়ে দাঁড়ায় এই ফাঁকে একটু বিশ্রাম নিতে। রবার্ট উঠে দাঁড়িয়েছে।

'ব্যস—ব্যস—আর কী হবে মেরে! নিজের দিকে চলে যাও।' রিভেরাকে বলল রবার্ট।

কর্তৃত্বের সুরে কথা বলে রবার্ট। যেমন হামেশা বলতো মুষ্টিযুদ্ধের আখড়ায়। রিভেরা শুধু ঘৃণাভরে রবার্টের দিকে একবার তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল, কখন ড্যানি ওঠে। বিশ্রামের সময় হতেই কেলি আসে রিভেরার কাছে। রিভেরাকে অনেক করে বোঝাতে চায়।

'কী মুস্কিল—ছেড়ে দাও না।' নীচু গলায় রুক্ষ স্বরে কথা বলছে কেলি। 'তোমাকে সরে দাঁড়াতে হবে রিভেরা। আমার কথা শুনে

দ্যাখো—তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যত। পরের বার ঠিক সুযোগ দেবে ড্যানিকে হারাবার। কিন্তু এবার নয়, আর লড়ো না।'

রিভেরার দৃষ্টিতেই মালুম হয় যে কথাগুলো শুনছে কিন্তু হ্যাঁ না কিছুই বলে না।

'কী হলো, কথা বলছো না যে?' কেলি রাগত কণ্ঠে শুধোল।

'হারতে তোমাকে হবেই।' স্পাউডার হ্যাগার্টি যোগ করল 'এমনি না হলেও রেফারি তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। কেলি যা বলছে শোন—সরে দাঁড়াও। আমি তোমাকে চ্যাম্পিয়ান করে দেবো।'

রিভেরা উত্তর দেয় না।

'সত্যি বলছি—আমার কথা শুনে দেখই না—'

ঢঙ করে ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অশুভ কিছুর আশঙ্কা চেপে ধরে রিভেরাকে। দর্শকরা কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেনি। ব্যাপারটা যাই হোক, সেটা এই রিঙের মধ্যেই ঘটবে, রিভেরাকে জড়িয়েই ঘটবে। ড্যানি যেন আবার তার আগের নিশ্চিন্তভাব ফিরে পেয়েছে। যে রকম দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে আসছে, ভয় পায় রিভেরা। একটা কূটচাল আছে এর পিছনে। ড্যানি ছুটে আসে কিন্তু রিভেরা তার মোকাবিলা করতে নারাজ। এক পাশে সরে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। ড্যানি আসলে একটা আলিঙ্গনের মধ্যে যেতে চাইছে। এর পিছনে বদমাইশি আছে। রিভেরা পিছু হটে, গোল হয়ে ঘোরে, কিন্তু সে আর কতক্ষণ! শেষ অবধি তাকে আলিঙ্গনে ধরা পড়তে হবেই। ওদের মতলবটা কি তখনই জানা যাবে। মরিয়া হয়ে সে এবার এগিয়ে আসে ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি ঘটাতে। রিভেরা ড্যানিকে এমন ভাবে প্রলুব্ধ করে যেন সেও চাইছে আলিঙ্গনের মধ্যে যেতে। ড্যানি ছুটে আসে। তাদের দেহ দুটো স্পর্শ করার ঠিক আগের মুহূর্তে হরিণের মতো তড়াক করে পিছনে সরে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ড্যানির সহকর্মীরা ও কোণ থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, ফাউল—ফাউল—

রেফারি ফাউল বলে ঘোষণা করতে যাচ্ছিল কিন্তু রিভেরা ওদের সবাইকে বোকা বানিয়েছে। ড্যানির দেহ স্পর্শ অবধি করেনি। ফাউল বলবে কী করে! কী করবে ভেবে না পেয়ে রেফারি হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত দর্শকদের মধ্যে থেকে তীক্ষ্ণ সরু কণ্ঠে একটি কিশোর চেঁচিয়ে ওঠে, 'ডাহা জোচ্চুরি!' এরপর আর রেফারির কিছু করার থাকে না।

ড্যানি এবার খোলাখুলি গালিগালাজ করতে শুরু করেছে। জোর করে ধরতে চাইছে রিভেরাকে। রিভেরাও নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। রিভেরা ঠিক করে ফেলেছে আর ও ড্যানির দেহে কোন ঘুষি মারবে না, তাহলেই ওরা ফাউল ঘোষণা করে দেবে। এতে তার জেতবার সুযোগ অর্ধেক হয়ে গেছে কিন্তু তবু জিততে যদি তাকে হয়, একমাত্র মুখে আঘাত করেই জিততে পারবে। সামান্যতম সুযোগ দিলেই ওরা ফাউল হেঁকে রিভেরাকে পরাজিত করবে। ড্যানির হাবভাবে একেবারে স্পষ্ট ভাবেই ধরা পড়েছে সে কথা। দু' রাউণ্ড ধরে ড্যানি নাগাড়ে রিভেরাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছে। রিভেরা তবু কাছে ঘেঁষতে সাহস পাচ্ছে না। ডজন ডজন ঘুষি সহ্য করে যাচ্ছে তবু আলিঙ্গনে আটকে পড়তে চাইছে না। শেষবেলায় ড্যানির এই মনমাতানো অপূর্ব আক্রমণ দর্শকদের উন্মাদ করে দিয়েছে। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। আসল ব্যাপারটা তারা কিছুই বোঝেনি। তাদের প্রিয় যোদ্ধা শেষপর্যন্ত সত্যিই জিততে চলেছে এইটুকু দেখেই তারা সন্তুষ্ট।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তারা রিভেরাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে—'লড়্ না শালা হলদেমুখো শয়তান! এগিয়ে আয় না হারামী! বুকের পাটা দেখি!' একই সঙ্গে ড্যানিকে তারা উৎসাহিত করে, 'ছেড়োনা, ওকে শেষ করে দাও। একেবারে শেষ করে ফ্যালো।'

এই আসরের মধ্যে একমাত্র কারুর যদি মাথা ঠাণ্ডা থাকে তো সে রিভেরার। তার দেহে ফুটন্ত রক্ত বইছে। তার মতো তীব্র ক্রোধ জ্বালা ঘৃণা এই অগণিত দর্শকের মধ্যে একজনেরও নেই তবু

ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো দশ হাজার কণ্ঠের সম্মিলিত ক্রুদ্ধ হীন গর্জনও তার কাছে যেন খরগ্রীষ্মে গাছের শীতল ছায়ার মতো। এর চেয়ে হাজারো গুণ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাকে বাস্তব জীবনে।

সপ্তদশ রাউণ্ডে সুযোগ পেল ড্যানি। একটা জবরদস্ত ঘুষি খেয়ে টলে গেল রিভেরা। তার হাতদুটো অসহায়ের মতো ঝুলে পড়ল। টলমল করতে করতে পিছনে সরে গেল। ড্যানি ভাবে এই তার সুযোগ। রিভেরা তার হাতের মুঠোয় এসে গেছে। রিভেরা কিন্তু ভান করেছিল। ড্যানি অসতর্ক হতেই সোজা একটি ড্রাইভে তার মুখের ওপর সজোরে আঘাত হানল। ড্যানি ধরাশায়ী হল। আবার উঠে দাঁড়াতেই ঘাড় ও চোয়ালের ওপর ডান হাতের নীচু ক'রে মারা ডাউন-চপে ফের শুইয়ে ফেলল ড্যানিকে। পরপর তিনবার এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। কোন রেফারির পক্ষেই এই মার্‌কে ফাউল ঘোষণা করা সম্ভব নয়।

'বিল! এই বিল!' কেলি আকুলস্বরে ডাকে রেফারিকে।

'কিছু করার নেই। হাত-পা বাঁধা।' রেফারিও দুঃখিত স্বরে বলল।

আঘাতে আঘাতে জর্জরিত ড্যানি তবু বীরের মতো বারবার উঠে দাঁড়াচ্ছে। রিঙের কাছে কেলি এবং আরও অনেকে পুলিশ পুলিশ বলে ডাকাডাকি শুরু করে দেয় লড়াই থামিয়ে দেবার জন্যে। ড্যানির সহকারীরা কিন্তু তবু তোয়ালে ছুঁড়ে লড়াইয়ের সমাপ্তি স্বীকার করে নিতে রাজী নয়! রিভেরা দেখল হোঁতকা পুলিশ অফিসার দড়ি গলে মঞ্চের ভেতর ঢুকছে। রিভেরা বুঝতে পারেনা এর অর্থ কী। গ্রিঙ্গোদের এই খেলায় প্রতারণার আর অন্ত নেই। ড্যানি উঠে দাঁড়িয়ে বেসামাল অসহায় অবস্থায় টলমল করছে। রেফারি আর পুলিশ ক্যাপ্টেন রিভেরার দিকে হাত বাড়াবার মুহূর্তে ঘুষিটা চালিয়ে দিল রিভেরা। আর লড়াই থামাবার দরকার হবে না, কারণ ড্যানি আর উঠবে না।

'কই গোনো !' রেফারিকে লক্ষ্য করে মোটা ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল রিভেরা।

গোনা শেষ হলে ড্যানির সহকারীরা তাকে টেনে তুলে নিয়ে গেল নিজের জায়গায়।

'কে জিতল বলো !' রিভেরা দাবি জানায়।

অনিচ্ছুক ভাবে রিভেরার গ্লাভ্‌স্‌ পরা হাতটা উঁচু করে তুলে ধরল রেফারি।

কোন অভিনন্দন নেই রিভেরার জন্যে। একাই সে ফিরে এল মঞ্চের ওপর নিজের কোণে ! সহকারীরা তখন তার বসার জন্যে টুলটা অবধি পাতেনি। দড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল রিভেরা। অন্তরের সব ঘৃণাটুকু এসে ভিড় করেছে তার ছুচোখে। এদিক থেকে ওদিক—প্রত্যেকের মুখের ওপর দিয়ে ঘৃণার নজর বুলিয়ে গেল। দশ হাজার গ্রিঙ্গোর কাউকেই বাদ দেয়নি। হাঁটুছুটো দেহের ভার সইতে পারছে না আর ঠকঠক করে কাঁপছে। ক্লান্তিতে চোখ বেয়ে নামছে অশ্রুধারা। বমি বমি মাথা ঘোরা ভাবের জন্যে গ্রিঙ্গোদের ঘৃণ্য মুখগুলো আগুপিছু ছুলছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল রিভেরার, এইগুলোই তো রাইফেল ! এই রাইফেল তো এখন তারই। বিপ্লবের গতি ছুর্নিবার।

গল্পের শেষে

১

এবড়ো খেবড়ো কাঠের টুকরো দিয়ে তৈরি টেবিলটা। যারা তাস নিয়ে 'হুইস্ট' খেলছে, মাঝে মধ্যেই নিজেদের দিকে তাস টেনে আনতে অসুবিধেয় পড়ছে। অমসৃণ টেবিলের ওপর আটকে যাচ্ছে তাসগুলো। গায়ের জামা অবধি খুলে বসেছে সবাই। তবু মুখের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে! ওদিকে পশমের মোজা ও মোকাসিন পরে থাকলেও পাগুলো ঠাণ্ডায় যেন জমে অসাড় হয়ে যাচ্ছে। ছোট্ট এই কেবিন ঘরটায় মেঝে আর মেঝের মাত্র গজ খানেক ওপরে, ঠিক এতটাই তাপমাত্রার প্রভেদ। লোহার পাত দিয়ে তৈরি ইউকোন স্টোভটা গনগন করে জ্বলছে, তবু মাত্র আট ফুট দূরে, দরজার পাশে মেঝের একটু ওপরে তাকের ওপর রাখা মাংস-গুলো জমে একেবারে নিরেট হয়ে গেছে। নীচের দিক থেকে দেওয়ালের এক তৃতীয়াংশ ছেড়ে কেবিনের দরজাটাও বরফ জমে আটকে আছে। শোবার বাঙ্কের পিছনে কেবিনের দেওয়ালের কাঠের গুড়ির ফাঁকে ফাঁকে সাদা বরফ জমে চকচকে করছে। অয়েল পেপারের নীচের দিকটায় ঘরের মানুষদের নির্গত নিশ্বাস-বায়ু বরফ হয়ে জমে এক ইঞ্চি পুরু আবরণ সৃষ্টি করেছে।

বাজি ধরে হুইস্ট খেলা চলছে। যে জুটি হারবে তাকে এই ইওকোনের সাতফুট পুরু বরফ আর তুষারের স্তর ভেদ করে মাছ ধরার জন্যে গর্ত খুঁড়তে হবে।

'মার্চ মাস পড়ে গেল, তবু এত ঠাণ্ডা!' তাস ভাঁজতে ভাঁজতে বলে উঠল একজন।

'কি মনে হচ্ছে বব্?'

'তা মাইনাস্ পঞ্চান্ন বা ষাট ডিগ্রি তো হবেই। তুমি কি বলো ডাক্তার?'

ডাক্তার মুখ ফিরিয়ে দরজার তলার দিকে একবার পরীক্ষা-মূলক দৃষ্টিতে তাকাল।

'পঞ্চাশের চেয়ে বেশী হবে না। উনপঞ্চাশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। দরজাটার দিকে তাকাও, কতটা বরফ জমেছে দেখলেই বুঝতে পারবে। সেবার যখন মাইনাস সত্তরে নেমে গেছল তাপমাত্রা, কম করে হলেও আরো চার ইঞ্চি উঁচু অবধি বরফ জমেছিল।'

দরজায় বাইরে থেকে ধাক্কা পড়ে। ডাক্তার হাত তুলে তাস বাছতে বাছতেই বলে, 'কাম্ ইন্!'

যে লোকটি ঘরে ঢুকেছে বিশাল চেহারা তার। চওড়া কাঁধ। জাতে সুইডিশ। অবশ্য কানঢাকা টুপিটা খুলে মুখের ওপর গোঁফ দাড়ি থেকে বরফ ঝেড়ে না ফেললে বোঝার উপায় থাকত না সে কোন্ দেশের লোক। বরফের মুখোশে ঢাকা পড়ে গেছল সব কিছু। আগন্তুক বরফ ঝেড়ে পরিষ্কার হতে হতেই ওরা হাতের খেলা শেষ করে ফেলেছে।

'শুনেছি এখানে একজন ডাক্তার এসেছেন!' উৎসুক ভাবে প্রশ্ন করল লোকটি। বিচলিত দৃষ্টিতে প্রত্যেকের দিকেই একবার তাকিয়েছে। দীর্ঘকাল তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করার চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছে তার রুক্ষ চোখে মুখে। 'আমি বহুদূর থেকে আসছি, হোয়াইয়ো'র ডান দিকের ফালি থেকে।'

'আমিই ডাক্তার। ব্যাপারটা কি?'

ডাক্তারের কথার খেই ধরেই লোকটা যেন এবার তার বাঁ হাতটা উঁচু করে ধরল। বীভৎস ভাবে ফুলে রয়েছে দ্বিতীয় আঙুলটা। কী করে এমন হল তারই অসংলগ্ন কাহিনীটা গড়গড় করে বলতে শুরু করে দিয়েছে।

'দেখি দেখি, আমায় দেখতে দাও আগে।' অধৈর্য হয়ে বলে ডাক্তার। 'টেবিলের ওপর হাতটা রাখো। এই যে—এইভাবে।'

খুব আলতো করে সন্তর্পণে হাতটা রাখল লোকটি। যেন তলতলে একটা ফোঁড়া এখুনি ফেটে যাবার ভয় আছে।

'ধ্যাত্—' ধমকে ওঠে ডাক্তার। 'এত ঘাবড়াবার কী হল! একশো মাইল পথ তো পায়ে হেটে এসেছ সারাবার জন্যেই! ভাল করে ছাখো কি করছি, পরের বার নিজেই করে নিতে পারবে।'

একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে ডাক্তার হঠাৎ তার ডান হাতটা দিয়ে দায়ের মতো সজোরে এক কোপ বসাল লোকটার স্ফীতকায় আঙুলটার ওপর। ত্রাসে যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে লোকটি। একটা বুনো জন্তুর মতো শোনায় চিৎকারটা। লোকটা সত্যিই বুনো জন্তুর মতো প্রায় লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিল ডাক্তারের ঘাড়ে। এমন বিশ্রি রসিকতা সহ্য করা যায়!

'ব্যস্-ব্যস্—' ডাক্তারের তীক্ষ্ণ কর্তৃত্বব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর ওকে নিরস্ত করে। 'এখন কেমন লাগছে? ভাল না? লাগতেই হবে ভাল। পরের বার তুমি নিজেই নিজের চিকিৎসা করতে পারবে। কই স্ট্রদার্স—তাস দাও! এবার তোমাদের হারাবই।'

সুইডিশ লোকটির মুখে খুব ধীরে ধীরে স্বস্তির ছাপ ফুটে উঠল। ব্যাপারটা এতক্ষণে হৃদয়ঙ্গম করছে। বাড়ি খাবার পর আঙুলের যন্ত্রণাটা চলে গেছে, বিস্মিত দৃষ্টিতে আঙুলটাকে পর্যবেক্ষণ করে লোকটি—ধীরে ধীরে ভাঁজ করে আর খুলে দ্যাখে লাগছে কিনা। এবার সে পকেটের মধ্যে হাতপুরে একটা সোনা ভর্তি থলে টেনে বের করল।

'কত দেবো?'

ডাক্তার অধৈর্য ভাবে ঘাড় নাড়ায়। 'কিছু না, আমি কি প্র্যাকটিশ করছি নাকি, কই—তোমার দান বব্।'

লোকটি ভারী ভারী পা ফেলে এগিয়ে যায়, আবার লক্ষ্য করে আঙুলটাকে, তারপর সপ্রশংস দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকায়।

'খুব ভাল লোক তো আপনি। কি নাম আপনার?'

'লিণ্ডে, ডাক্তার লিণ্ডে।' স্ট্রদার্স উত্তর দেয়, ডাক্তারকে বাড়তি হাঙ্গামা পোয়াবার হাত থেকে যেন বাঁচাতে চাইছে।

'দিনের অর্ধেকই তো কাবার হয়ে গেছে। আজকের রাতটা বরং এখানেই থেকে যাও।' এক রাউণ্ড খেলা শেষ হলে ডাক্তার তাস ভাঁজতে ভাঁজতে লোকটিকে বলল। 'এত ঠাণ্ডায় বেরোনো ঠিক হবে না। একটা বাড়তি বাঙ্ক আছে এখানে, শোবার কোন অসুবিধে নেই।'

ডাক্তারের পাতলা ছিপছিপে চেহারা। খয়েরি চুল, শ্যাম বর্ণ চোয়াড়ে মুখ, পাতলা ঠোঁট—একটি বলিষ্ঠ মানুষ। পরিষ্কার ভাবে কামানো গালের চামড়া সুস্বাস্থ্যের পরিচয় বহন করছে। অত্যন্ত তৎপর তার প্রতিটি গতিবিধি। তাস ভাঁজছে, বিলি করছে, একবারো এলোমেলো হতে দিচ্ছে না। কালো চোখদুটোতে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। চোখে চোখ রেখে ছাড়া তাকায় না। রোগা কমনীয় হাতদুটো সদা অস্থির। দেখলেই মনে হয় সূক্ষ্ম কাজে পারদর্শী। হাত দুটোর দিকে যেই তাকাক না শক্তিমত্তার পরিচয় পাবে।

'এবার আমাদের দান।' শেষ বারের মতো তাস টেনে নিল ডাক্তার। 'দেখা যাক্, কে হারে আর কে জেতে। কে জানে, কার কপালে আজ গর্ত খোঁড়া আছে।'

আবার দরজায় করাঘাতের শব্দ। এবার ক্ষেপে যায় ডাক্তার। 'আজ আর দেখছি খেলা শেষ করা যাবে না।' ইতিমধ্যে দরজা খুলে দিতে এক অপরিচিত ব্যক্তি ঘরে এসে ঢুকল।

'কি ব্যাপার বলে ফ্যালো।' ডাক্তার আগন্তুকের উদ্দেশে বলল।

আগন্তুক বৃথাই চেষ্টা করে তার বরফ জমা ঠোঁট আর চোয়াল ফাঁক করার। স্পষ্ট বোঝা যায় বেশ কয়েকদিন ধরে ও একটানা হেঁটেছে। গালের হাড় দুটোর কাছে চামড়াটা কালো হয়ে গেছে বারবার তুষার ক্ষত সৃষ্টি হওয়ায়। বরফের একটা কঠিন আস্তরণে নাক থেকে চিবুক পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেছে। শুধু শ্বাস প্রশ্বাসের জন্যে যা একটা ফুটো দেখা যাচ্ছে বরফের মধ্যে। এই ফুটোর মধ্যে দিয়ে

ও খৈনি খেয়ে থুতু ফেলছে। তামাক পাতার রস গড়িয়ে গড়িয়ে জমাট বেঁধে একটা খয়েরি রঙা ছুঁচোলো দাড়ি তৈরি হয়ে গেছে।

বোবার মতো লোকটি মাথা নাড়ে। চোখ দুটোয় কৌতুকের হাসি! বাক্‌শক্তি ফিরে পাবার জন্যে স্টোভটার কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ায়। মুখের বরফটা গলিয়ে নেওয়া দরকার। বরফ মুক্ত হবার প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করবার জন্যে আঙুল দিয়ে খুঁটে আধগলা বরফের কুচিগুলোকে টেনে ফেলে দেয়। বরফ কুচি স্টোভের ওপর পড়া মাত্র ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে শব্দ হয়।

'আমার কিছুই হয় নি।' শেষপর্যন্ত লোকটি ঘোষণা করল। 'তবে এখানে যদি কোনো ডাক্তার থাকে তো খুবই উপকার হবে। লিট্‌ল্ পেকোতে একজন লোক খুব অসুস্থ। আসলে একটা চিতাবাঘের সঙ্গে একেবারে হাতাহাতি লড়াই করতে হয়েছিল। নখের আঁচড়ে কামড়ে একেবারে শোচনীয় অবস্থা।'

'কত দূরে?' ডাক্তার লিণ্ডে জানতে চাইল।

'কত আর, এই একশো মাইল হবে।'

'কতদিন আগে হয়েছে?'

'এই তিন দিন হল। আসতে আসতেই তিন দিন কেটে গেছে।'

'অবস্থা কি খুবই খারাপ?'

'কাঁধের হাড় সরে গেছে। পাঁজরার কয়েকটা হাড় তো নিশ্চয় ভেঙেছে। ডান হাতটাও ভাঙা। মুখটুকু বাদে সারা শরীর নখের আঁচড়ে ফালা ফালা, একেবারে হাড় অবধি পৌঁছে গেছে। নেহাত উপায় নেই তাই কয়েকটা ক্ষত আমরাই সেলাই করে দিয়েছি আর শিরাগুলো সুতো দিয়ে বেঁধে দিয়েছি।'

'ব্যাস—কম্মো সেরেছো!' অবজ্ঞা ভরে বলে উঠল লিণ্ডে। "ক্ষতগুলো কোন জায়গার?'

'পেটের।'

'তার মানে যে অবস্থা করে রেখেছ, বুঝতেই পারছি।'

'মোটেই না। সেলাই করার আগে পোকা মারা ওষুধ দিয়ে

জায়গাগুলো পুরো পরিষ্কার করেছি। সাময়িক ভাবে একটা জোড়াতালি দেওয়া আর কি! লিনেন সুতো ছাড়া আর কিছুই তো ছিল না। তাও আমরা পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি।'

'স্বচ্ছন্দে ধরে নিতে পারো ওর মৃত্যু অবধারিত।' ক্রুদ্ধ ডাক্তার তাস নাড়তে নাড়তে অভিমত প্রকাশ করে।

'মোটেই না। ও মরবার লোক নয়। জানে, আমি ডাক্তার খুঁজতে এসেছি, যতক্ষণ না তুমি গিয়ে পৌঁছচ্ছো ঠিক বেঁচে থাকবে। নিজেকে ও মরতে দেবে না। আমি তো ওকে চিনি।'

'ধর্ম বিশ্বাস বনাম পচ-ধরা ক্ষত, অ্যাঁ?' ডাক্তার বিদ্রূপ করল। 'যাক্‌গে আমি এখানে ডাক্তারি করতে আসিনি। আর একটা মরা মানুষকে দেখতে যাবার জন্যে একশো মাইল পায়ে হেঁটে যাবারও কোন ইচ্ছে নেই।'

'মানুষটা মরেনি তাই যেতেও তোমার ইচ্ছে হবে।'

লিণ্ডে ঘাড় নাড়ে। 'নাহে—বৃথাই তুমি এতদূর এসেছ। বরং রাত্তিরটা এখানে কাটিয়ে যাও।'

'না। তোমাকে নিয়ে আর দশ মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব।' তুমি ভাবছ কি করে, যে আমি যাবই?' লিণ্ডসে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করে।

উত্তরে টম ড' যে বক্তৃতাটি ঝাড়ে সেটি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

'তোমার যদি মনস্থির করতে সাত দিনও লাগে তবু তুমি না পৌঁছানো পর্যন্ত ও মরবে না। তাছাড়া ওর পাশে ওর বৌ আছে। চোখে তার এক ফোঁটা জল নেই, কোন কান্নাকাটির বালাই নেই। তুমি না পৌঁছনো পর্যন্ত ওর বৌ ওকে ঠিক বাঁচিয়ে রাখবে। দারুণ ভাব ওদের মধ্যে। তাছাড়া ওর বৌয়ের মনের জোরও কিছুমাত্র কম নয়। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। লোকটা যদি দুর্বল হয়ে পড়ে ওর বৌ-ই তখন নিজের প্রাণটা পুরে দেবে ওর দেহে। ঠিক বাঁচিয়ে রাখবে। অবশ্য ও যে ভেঙে পড়বে না সে বিষয়ে আমি বাজি ধরতেও রাজী। তুমিও নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

আমি তোমায় চ্যালেঞ্জ করছি, তুমি পৌঁছে দেখবে ও ঠিক বেঁচে আছে। না যদি হয়, তুমি যা বাজি ধরবে ধরো, তার তিনগুণ ওজনের সোনা আমি তোমায় ফিরিয়ে দেবো। তীরের ধারে আমার কুকুরের পাল অপেক্ষা করছে। দশ মিনিটের মধ্যে তোমার বেরিয়ে পড়া উচিত। যেতে তিন দিনের বেশী লাগবে না কারণ আমার আসার সময়েই বরফ কেটে রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। আমি যাচ্ছি তাহলে, কুকুরগুলোকে দেখা দরকার। দশ মিনিট বাদেই তুমি আসছ কিন্তু!'

টম ড' টুপি টেনে কান ঢাকা দিয়ে হাতে পশমী দস্তানা গলিয়ে বেরিয়ে গেল।

'হতভাগা কোথাকার!' বন্ধ দরজার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল লিণ্ডে।

২

সেদিন রাত্রে অন্ধকার ঘনিয়ে আসার বেশ কিছুক্ষণ পরে টম ড' আর লিণ্ডে তাদের ছাউনি ফেলল। পঁচিশ মাইল পথ পিছনে ফেলে এসেছে তারা। ছাউনিটা সাদাসিধে হলেও যথোপযুক্ত। বরফের ওপর আগুন জ্বলছে, তার পাশেই স্প্রুসের ডাল দিয়ে তৈরি মাদুরের একক শয্যার ওপর বিছানো হয়েছে ওদের লোমশ কম্বল দু'টো। শয্যার পিছনে তেরছা করে খাটানো ক্যানভাসের টুকরোটা তাপ প্রতিফলিত করবে। ড' কুকুরদের খেতে দিয়ে বরফ আর জ্বালানী কাঠ টুকরো করল। লিণ্ডে হাঁটু গেড়ে রাঁধতে বসেছিল, তুষারক্ষত হওয়ায় গাল দুটো খুব জ্বালা করছে। পেট ভরে খেয়ে তারা পাইপ ধরাল, তারপর আগুনের সামনে মোকাসিন জুতো শোকাতে শোকাতে গল্প-গুজব হল খানিকটা। শোওয়া মাত্র গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল দু'জনে। ক্লান্ত ও সুস্থ মানুষের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক।

সকালে উঠে দেখা গেল অস্বাভাবিক শৈত্যপ্রবাহে ছেদ পড়েছে।

লিগুের আন্দাজ মতো তাপমাত্রা এখন হিমাঙ্কের পনেরো ডিগ্রি নীচে, আরো কমে আসবে ঠাণ্ডা। ড' চিন্তিত হয়ে পড়ে। আজই ওদের ক্যানিয়নে পৌঁছবার কথা। দুশ্চিন্তার কারণটা বুঝিয়ে বলে ড'। বসন্ত কাল এসে গেলে বরফ গলে ক্যানিয়নের মাঝ দিয়ে জল বইতে শুরু করবে। ক্যানিয়নের দেওয়ালগুলোর উচ্চতা শত সহস্র ফুট। আরোহণ হয়তো করা যাবে কিন্তু চলার গতি হবে মন্থর।

সেদিন সন্ধ্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন ভীতিপ্রদ গিরি খাতের মধ্যে সুরক্ষিত ভাবে ছাউনিটা ফেলার পর পাইপ ধরিয়ে বসে দু'জনের মধ্যে কথা হচ্ছিল। বড্ড গরম পড়ে গেছে। দু'জনেরই মতে তাপমাত্রা এখন শূন্যের ওপরে। গত ছ' মাসের মধ্যে এই প্রথম।

'এত উত্তরের দিকে চিতাবাঘ দেখা যায় বলে কেউ কখনো শোনেনি।' ড' বলে চলে। 'রকির ভাষায় জন্তুটার নাম 'কাউগার।' আমি কিন্তু আমাদের দেশে, ওরিগনের কারি প্রদেশে এরকম জন্তু অনেক শিকার করেছি। সে যাইহোক, যদি বাঘ বলেও ধরে নিই, এত বড় বাঘ আমি জীবনে কখনো দেখিনি। একেবারে রাক্ষুসে চেহারা। কী করে যে নিজেদের অঞ্চল ছেড়ে এতদূরে এসে পড়ল, সেইটাই একটা প্রশ্ন।'

লিগুে কোন মন্তব্য করল না। দুটো কাঠির মাথায় রাখা তার মোকাসিনটা থেকে বাষ্প উঠছে। জুতোর দিকে কারুর নজর নেই। সেঁকবার জন্যে উল্টেও দেয়নি। কুকুরগুলো কুণ্ডলি পাকিয়ে এক একটা লোমের ডেলার মতো বরফে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ চটপট্ ক'রে একটা জ্বলন্ত কাঠ ফাটার শব্দে এতক্ষণের গভীর নীরবতা যেন আরো স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল। ঘুম ভেঙে চমকে উঠে বসে ড'য়ের দিকে তাকাল লিগুে। ড'-ও ঘাড় নেড়ে লিগুের দিকে চাইল। দু'জনেই কান খাড়া করে শুনছে। অনেক দূর থেকে ভেসে আসা একটা অস্পষ্ট কলরব ক্রমশ প্রচণ্ড গর্জন হয়ে ওঠে। গর্জন ক্রমশই নিকটবর্তী হয়, ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে,

পাহাড়ের শিখরে শিখরে, ক্যানিয়নের গহ্বরে গহ্বরে নেচে নেচে বেড়ায়। অরণ্যভূমি এবং গিরিখাতের গায়ে ফাটলের মধ্যে গজানো স্বল্প সংখ্যক পাইন গাছগুলোও তার দাপটে মাথা নত করে। ওরা বুঝতে পারে তীব্রবেগে উষ্ণ বাতাস বইছে, ঘূর্ণি ঝড় উঠেছে। অগ্নিকুণ্ড থেকে ফুলকির ফোয়ারা ছিটিয়ে পড়ছে। কুকুরগুলো ঘুম ভেঙে উঠে সামনের পায়ে ভর রেখে বসেছে। হিম শীতল নাকগুলো আকাশের দিকে উঁচু করে হু-হু-শব্দে নেকড়ের মতো একটানা ডাক্ ছাড়ছে।

'এবার চিনুক্ ধরতে হবে।' ড' বলল।

'তার মানে নদীর পাশের রাস্তা তো?'

'হ্যাঁ। পাহাড়ী পথে এক মাইল পেরোনো অনেক সহজ।' প্রায় মিনিট খানেক লিঙেকে ভাল মতো লক্ষ্য করার পর বাতাসের গর্জনের ওপর গলা চড়িয়ে পরীক্ষামূলক ভাবে ড' বলল, 'এ পর্যন্ত আমরা পনের ঘণ্টা হেঁটেছি।' আবার একটু অপেক্ষা করে ড' শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল, 'কী মনে হচ্ছে ডাক্তার, পারবে তো শেষ পর্যন্ত?'

উত্তর স্বরূপ লিঙে তার পাইপের আগুন ঝেড়ে নিভিয়ে দিল। ভিজে মোকাসিনগুলো টেনে নিয়ে পরতে শুরু করে দিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দু'জনে মিলে প্রচণ্ড বাতাসের দাপট অগ্রাহ্য করে কুকুরদের তৈরি করে নিল লাগাম পরিয়ে। ছাউনি গুটিয়ে লোমশ কম্বল আর রান্নার সাজ সরঞ্জামগুলো স্লেডের পিঠে বাঁধা হল। অন্ধকারের মধ্যেই এবার তাদের যাত্রা শুরু হল। প্রায় এক সপ্তাহ আগে এই পথ দিয়েই ড' এসেছে। সারারাত ধরে গর্জন মুখরিত হয়ে রইল চিনুক। ক্লান্ত কুকুরগুলোকে যেমন তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে তেমনি নিজেদের দেহের অবশ মাংস পেশীগুলোকেও সচল রাখার জন্য কম মেহনত করতে হয়নি। আরো বারো ঘণ্টা হাঁটার পর প্রাতরাশ সারবার জন্যে ওরা থামল। এক নাগাড়ে সাতাশ ঘণ্টা হেঁটেছে।

বেশ কয়েক পাউণ্ড বেকন দিয়ে ভাজা হরিণের মাংস গলাধঃকরণ করার পর ড' বলল, 'এবার এক ঘণ্টা ঘুম।'

সঙ্গীকে হু' ঘণ্টা ঘুমোবার সুযোগ দিল ড'। নিজে সাহস করে চোখের পাতা এক করতে পারেনি! কোমল বরফের স্তরের ওপর আঁকিবুঁকি কেটে সময় কাটিয়েছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বরফের স্তরের উচ্চতা ক্রমশ কমে আসছে। হু'ঘণ্টার মধ্যে তিন ইঞ্চি নীচে নেমে গেছে। বসন্ত বাতাসের কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে অস্পষ্ট ভাবে অথচ খুব কাছ থেকেই কানে আসছে অলক্ষ্যে প্রবাহিত জলস্রোতের শব্দ। অগুন্তি জলধারা পুষ্ট লিট্‌ল্ পেকো নদী বরফের নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে।

লিণ্ডের কাঁধে হাত রেখে তাকে জোরে জোরে ঝাঁকাতে শুরু করল ড'।

'ডাক্তার! ও ডাক্তার! একটু চেষ্টা করে ছাখো, ঠিক আরেকটু হাটতে পারবে, নিশ্চয় পারবে।'

নিদ্রায় ভারী চোখের পাতার তলায় ডাক্তারের ক্লান্ত কালো চোখ হুটো একবার সাড়া দিয়েই আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

'ডাক্তার! শুনছো—নখের আঁচড়ে একেবারে ছিঁড়েখুঁড়ে পড়ে আছে রকি। আগেই তো বলেছি, কোন রকমে আমি ওর পেট সেলাই করেছি...ডাক্তার—'আবার ডাক্তারের চোখ হুটো বুজে আসতেই ঝাঁকানি দেয় ড'। 'শুনছো ডাক্তার, আরেকটু হাঁটতে পারবে কি? শুনতে পাচ্ছো, কি বলছি? আরেকটু হাঁটতে পারবে না?'

লাথি মেরে ক্লান্ত কুকুরগুলোর ঘুম ভাঙানো মাত্র সব কটা দাঁত খিঁচিয়ে গরগর করে ওঠে। এখন ওরা মন্থর গতিতে এগোচ্ছে। ঘণ্টা পিছু হু'মাইলের বেশী নয়। সুযোগ পেলেই কুকুরগুলো ভিজে তুষারের ওপর শুয়ে পড়ছে।

'আর কুড়ি মাইল এগোলেই গিরিখাত পেরিয়ে যাবো।' ড'

উৎসাহ দেয়। 'তারপর আর বরফের হাঙ্গামা নেই। আমরা পাড়ের ওপর উঠে আসব। ওখান থেকে দশ মাইল এগোলেই রকিদের শিবির। বলতে গেলে তো পৌঁছেই গেছি। রকির একটা ব্যবস্থা করে ফেরবার সময় তুমি নৌকোয় চড়েই আসতে পারবে। একদিনে ফিরে আসবে।'

তুষারের ওপর পায়ে হাঁটা কিন্তু ক্রমশই দুরূহ হয়ে উঠছে। জমাট নদীর কিনারা থেকে খসে খসে পড়ছে বরফের চাঙড় আর যেখান থেকে খসে পড়ছে না, জলস্রোত বয়ে যাচ্ছে। জলের মধ্যে ছপ ছপ করে পা ভিজিয়ে এগোতে হচ্ছে ওদের। কুলকুল শব্দে বয়ে চলেছে লিট্‌ল্ পেকো। চারধারেই বরফের ওপর ফাটল আর গর্ত দেখা দিচ্ছে। এখন এক একটা মাইল হাঁটা, সমতলে দশ মাইল হাঁটার সমান।

'স্লেডের ওপর চড়ে বসো ডাক্তার। জিরিয়ে নাও একটু।' ড' আহ্বান জানাল।

প্রত্যুত্তরে কালো চোখের জ্বলন্ত চাউনি তাকে আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করার সুযোগ দিল না।

দুপুর না হতেই আসন্ন অমঙ্গলের কথা স্পষ্ট টের পেল ওরা।

নদীর তুষারাবৃত বক্ষের ওপর দাঁড়িয়েই ওরা স্পষ্ট টের পাচ্ছে যে অন্তঃসলিলা খর জলস্রোতের সঙ্গে ভেসে আসা তুষারের চাঙড়াগুলো গুম গুম শব্দে আঘাত হানছে। শঙ্কাপীড়িত কুকুরগুলো নাকে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। পাড়ের ওপর উঠে আসতে চাইছে তারা।

'বোঝা যাচ্ছে যে সামনেই নদীর বুকের ওপর দিয়ে জল ব'ইছে।' ড' বোঝাতে শুরু করল। 'এক্ষুনি কোথাও না কোথাও জলস্রোতে বাধা পড়বে, আর অমনি একশো মিনিটে একশো ফিট লাফিয়ে উঠবে নদীর জল। ওপরে ওঠার একটা পথ পেলে সঙ্গে সঙ্গে উঠে যাওয়া উচিত। এসো এসো, আর দেরী নয়। ভেবে দ্যাখো, এমনিতে এই ইওকোনই সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেমন জমাট বেঁধে পড়ে থাকে।'

ক্যানিয়নের এই অংশটা অত্যন্ত সংকীর্ণ। দু' পাশের বিশাল দেওয়াল এত খাড়া যে ওপরে ওঠার কোন উপায় নেই। বাধ্য হয়ে ওরা নদীর বুক ধরেই এগিয়ে চলল। তারপর সহসাই নেমে এল বিপর্যয়। অভিযাত্রী দলটির ঠিক মধ্যবর্তী অংশের পায়ের তলার জমাট বরফ সশব্দে বিস্ফোরিত হল। দড়ি-বাঁধা সারিবদ্ধ কুকুরদের মধ্যে মাঝখানের দুটো পড়ে গেল বরফভাঙা গর্তে। ডুবন্ত কুকুর দুটোকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল জলের তীব্র প্রবাহ আর সেই সঙ্গে দড়িতে টান প'ড়ে, সামনের কুকুরটাকেও পিছনে টেনে এনে গর্তের মধ্যে ফেলে দিল। ডুবন্ত কুকুর তিনটের আকর্ষণ ক্রন্দনরত পিছনের কুকুর দুটোকেও ক্রমশ গর্তের দিকে টেনে আনল। ওরা দু'জনে প্রাণপণ শক্তিতে শ্লেডগাড়িটাকে চেপে ধরেছে কিন্তু আটকাতে পারছে না। ওদেরও টেনে নিয়ে চলেছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঘটে গেছে ব্যাপারটা। চকিতে ছুরির এক কোপে শ্লেডে বাঁধা কুকুরটার দড়ি কেটে দিল ড'। মুহূর্তের মধ্যে কুকুরটা হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে গর্তের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। এবার দু'জনে মিলে শ্লেডটাকে টেনে এনে পাড়ের ওপর একটা ফাটলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। তারপর চোখের সামনেই দেখল বরফের উপরিস্তর ভেঙে এক নাগাড়ে ধ্বসে পড়ছে চাঁইচাঁই বরফ।

মাংস আর শোবার লোমওলা কম্বলগুলো শুধু গাঁটরি বেঁধে নিয়ে শ্লেডটাকে ওরা পরিত্যাগ করল। লিণ্ডে চায়নি ড' সবচেয়ে ভারী বোঝাটা বহন করুক, কিন্তু ড'-এর জেদই বজায় থাকল।

'ভুলে যেও না ওখানে পৌঁছেই তোমাকে কাজে হাত লাগাতে হবে। চলো, চলো—'

দুপুর একটার সময় ওরা আরোহণ শুরু ক'রে ওপরে এসে উঠল যখন তখন রাত আটটা। সমতল ভূমিতে পা দিয়েই দু'জনে লুটিয়ে পড়ে জমির ওপর। একটি ঘণ্টা শুধু শুয়েই কাটিয়ে দেয়। তারপর আগুন জ্বালে, কফি তৈরি হয়, প্রচুর পরিমাণে মাংস গলাধঃকরণ করে। অবশ্য প্রথমেই লিণ্ডে দু'জনের বোঁচকাদুটো হাতে

তুলে পরীক্ষা করে দেখেছে যে ড'-এরটা তার চেয়ে দু'গুণ ভারী।

'সত্যি তুমি লোহার মানুষ ড'!' ডাক্তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

'আমাকে বলছ? দূর-দূর-দাঁড়াও না রকির সঙ্গে আগে দেখা হোক্! খাঁটি ইস্পাত দিয়ে তৈরি—কিংবা প্ল্যাটিনাম বা সোনা, যা খুশী বলতে পারো। আমি পর্বতারোহী কিন্তু তবু আমাকে ও হেসেখেলে কাবু করে দেয়। দেশে থাকতে কারি প্রদেশে যখন ভাল্লুক শিকারে যেতাম, আমার সঙ্গীদের ছুটিয়ে নাজেহাল করে ছেড়ে দিতাম। প্রথম যেদিন এখানে এসে রকির সঙ্গে ভাল্লুক শিকারে বেরোই, মাথায় বদ্‌মাইশি চাপল। ভাবলাম ওকে একটু শিক্ষা দেওয়া যাক্। হাতের শেকল ঢিলে দিয়ে কুকুরগুলোকে ছোটাতে শুরু করলাম। একটু পরে দেখি রকিও এসে হাজির হয়েছে। কত আর ছুটবে এভাবে, আবার ঢিলে দিলাম শেকল। এবার এক ঘণ্টা ছোটার পরেও দেখি যথারীতি আমার পিছনেই রয়েছে রকি। বোকা বনে গিয়ে বললাম, 'এবার তুমি বরং আমার সামনে সামনে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।' রকি পথ দেখিয়ে এগোতে শুরু করে দিল সঙ্গে সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত ওর সঙ্গ ছাড়িনি, কিন্তু সত্যি বলছি, ভাল্লুকের দেখা না পাওয়া পর্যন্ত নাকানি-চোবানি খাইয়েছিল।

'রকিকে কেউ আটকে রাখতে পারে না। শরীরে ওর ভয় বলে কোন বস্তু নেই। গত বছর শরতকালে একদিন ও আর আমি সন্ধ্যের মুখে শিবিরে ফিরছি, তখনো বরফ জমতে শুরু করেনি। ওর কাছে শুধু একটা কার্তুজ আছে আর আমার হাত একেবারেই ফাঁকা। এমন সময় কুকুরগুলো একটা মাদী গ্রিজ্‌লি ভাল্লুককে ঠাহর করে। ভাল্লুকটা ছোটই ছিল। মাত্র তিনশো পাউণ্ডের মতো ওজন। কিন্তু তুমি তো জানো, গ্রিজলিগুলো কি রকম হয়! 'খবর্দার, গুলি করো না!' বন্দুক উঁচু করতেই রকিকে নিষেধ করলাম। 'মাত্র একটাই গুলি আছে, তাছাড়া এত অন্ধকারে লক্ষ্য স্থির করা যাবে না।'

'তুমি গাছে চড়ে ব'সো।' রকি বলল। গাছে আমি অবশ্য চড়িনি কিন্তু ভাল্লুকটা যখন গুলি খেয়েও টলতে টলতে গজরাতে গজরাতে কুকুর পালের দিকে তাড়া করে এসেছিল, সত্যিই তখন ভেবেছিলাম যে গাছে চড়ে বসে থাকলেই ভাল করতাম। সে এক কাণ্ড। অবস্থা আরো ঘোরালো হয়ে উঠল ভাল্লুকটা যখন বিরাট একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে একটা গর্তে ঢুকে বসল। কুকুরগুলোর পক্ষে গুঁড়ির নীচের দিক দিয়ে ভাল্লুকটাকে আক্রমণ করার কোন উপায় ছিল না। এদিকে এপাশ থেকে ভাল্লুকের ওপর লাফিয়ে পড়া মাত্র এক্ এক্ থাবায় এক একটাকে খতম করে দিচ্ছে। চারদিকে শুধু ঝোপঝাড়, ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসছে, একটাও গুলি নেই—কিচ্ছু করার উপায় নেই।

'তখন রকি কি করল জানো? গুঁড়ির নীচের দিকে গিয়ে আড়াল থেকে হাত বাড়িয়ে ছুরি চালাতে আরম্ভ করল। একবার, দু'বার, তিন বার ছুরি বসাল কিন্তু শুধু চামড়া অবধি পৌঁছচ্ছে ছুরিটা। ওদিকে একের পর এক কুকুরগুলো সাবাড় হয়ে যাচ্ছে। মরিয়া হয়ে উঠল রকি।

'কুকুরগুলোকে এভাবে মরতে দেওয়া যায় না। এক লাফে গুঁড়ির ওপর চড়ে ভাল্লুকটার লেজ ধরে পিছন দিকে ঝুঁকে পড়ল। টানের চোটে ভাল্লুক, কুকুর আর রকি সবাই মিলে গড়িয়ে পড়ল ঢালু পাড়ের ওপর থেকে বিশ ফুট নীচে নদীর জলে। সে কী চিৎকার গজরানি আর আঁচড়া-আঁচড়ি। জলে পড়ে যে যেদিকে পারল সাঁতরে উঠল। না, ভাল্লুকটাকে ধরতে পারেনি রকি, কিন্তু কুকুরগুলোর তো প্রাণ বাঁচাল। এই হচ্ছে রকি। একবার যদি মনস্থির করে ফ্যালে কারুর সাধ্য নেই ওকে আটকায়।'

চলতি পথের পরবর্তী ছাউনি তৈরি করার পর লিও বসে বসে শুনতে লাগল রকির আহত হবার কাহিনী।

'সেদিন আমাদের শিবির থেকে মাইল খানেক দূরে বনের মধ্যে গেছলাম। কুড়ুলের হাতল বানাবার জন্যে একটা বার্চ গাছের ডালের দরকার পড়েছিল।

ফিরে আসছি, হঠাৎ কানে এল দারুণ হট্টগোল—চেঁচামেচি। এই জায়গাটাতেই আমরা একটা ভাল্লুক ধরার ফাঁদ পেতেছিলাম। একটা পুরোনো ঝুড়ির মধ্যে কোন শিকারী এই ফাঁদটা ফেলে গেছল। দেখতে পেয়ে রকিই পেতেছিল ফাঁদটাকে। শুনতে পেলাম পালা করে রকি আর তার ভাই হ্যারি একবার ক'রে চিৎকার করছে, তারপরেই আবার হাসছে। মনে হল যেন কোন খেলা চলছে। কিন্তু খেলাটা কি শুনলে মাথা তোমার গরম হয়ে যাবে। কারি প্রদেশেও অনেক আহাম্মুককে দেখেছি বীরত্ব দেখাবার জন্য যা নয় তাই করছে। কিন্তু রকিরা যে কাণ্ড বাধিয়েছিল তার পাশে সে তো ছেলেখেলা। ফাঁদে আটকা পড়ে একটা চিতাবাঘ হুঙ্কার করছে আর ওরা একটা সরু গাছের ডাল হাতে নিয়ে পালা করে জন্তুটার নাকের ওপর বাড়ি মারছে। কিন্তু শুধু এটুকু হলেও তো ভাল ছিল। ঝোপের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেই দেখি হ্যারি গাছের ডালটা দিয়ে বাড়ি মারার পর ডালটা থেকে ছ' ইঞ্চি ভেঙে নিয়ে অবশিষ্টটুকু গুঁজে দিল রকির হাতে। এবার বুঝতে পারছো? ওরা একবার করে বাড়ি মারছিল আর ডালটাকে ভেঙে ছোট করে নিচ্ছিল। শুনতে যতটা সোজা লাগছে ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। চিতাটা পিঠ কুঁজো করে, গুড়ি মেরে, পিছনে সরে, অত্যন্ত তৎপর ভঙ্গিতে আঘাত এড়াতে চাইছিল। তাছাড়া কখন যে সামনে ঝাঁপ মারবে তাও বোঝা দুষ্কর। আরো অদ্ভুত ব্যাপার চিতাটার পিছনের একটা পা শুধু ফাঁসে আটকা পড়েছিল। সে ফাঁসটাও বেশ ঢিলেই ছিল নিশ্চয়।

'দুঃসাহসের খেলায় মেতে উঠেছিল দু'জনে। কাঠিটা একটু একটু ক'রে ছোট হচ্ছে আর চিতাটাও ক্রমশই আরো ক্ষেপে উঠছে। দেখতে দেখতে কাঠিটা প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল। মাত্র চার ইঞ্চি পরিমাণ অবশিষ্ট রয়েছে— এবার রকির পালা। হ্যারি বলল, 'এবার রণে ক্ষান্ত দাও, বুঝলে?' রকি রাজী হয় না, 'ক্ষান্ত দেবো কেন?'

হ্যারি উত্তর দিল, 'কারণ এবার তুমি মারার পর আমার জন্যে আর কাঠি বলে কিছু থাকবে না।' রকি হাসতে হাসতে বলল, 'তখন তোমাকেই হার স্বীকার করতে হবে। আমি কেন হার মেনে নেবো!' রকি চার ইঞ্চি কাঠি হাতে এগিয়ে গেল।

'সত্যি ডাক্তার, জীবনে যেন আর কখনো না এমন দৃশ্য দেখতে হয়। বাঘটা পিছু হ'টে, পিঠ কুঁজো করে ওত্ পেতেছিল। সোজা হলেই সামনে ছ' ফুট জায়গা থাবার মধ্যে পাবে। ওদিকে রকির কাঠি চার ইঞ্চি লম্বা। বাঘটা সত্যিই ঝাঁপিয়ে পড়ল রকির ঘাড়ে। এমন জাপটা জাপটি ঝটাপটি লেগে গেল যে গুলি চালালে দু'জনেই মরবে। হ্যারিই শেষ পর্যন্ত ছুরি চালিয়ে চিতাটার পেট ফাঁসাল।'

'আগে যদি জানতাম এইভাবে জেনেশুনে ও এই কাণ্ড করেছে, কক্ষণো আসতাম না।' সব শোনার পর ডাক্তার মন্তব্য করল।

ড' বিজ্ঞের মতো ঘাড় নেড়ে বলে, 'রকির বৌ-ও তাই বলেছিল। কি ভাবে কি হয়েছে, এসব কথা বলতেই বারণ করে দিয়েছিল।'

'লোকটা কি পাগল নাকি?' বিস্মিত ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জানতে চাইল ডাক্তার।

'ওরা সবাই পাগল। দু'টো ভাই সারাক্ষণ এ-ওর পিছনে লেগে আছে। খালি বাহাদুরি দেখানো নিয়ে রেষারেষি। এই তো গত বছর শরতকালে, সেদিন দারুণ দুর্যোগ--খাল দিয়ে দুর্বার বেগে জল বয়ে যাচ্ছে, বরফের চাঙড় ভেসে চলেছে—দু'ভাই বাজি ধরে নেমে পড়ল সাঁতার কাটতে। এমন কোন কাজ নেই যা ওরা করতে পারে না। রকির বৌও বাদ যায় না। রকি বারণ না করলে হেন কাজ নেই যা করতে পারে না। রকি কিন্তু ওর বৌকে মোটামুটি সামলে সামলে রাখে। শিবিরের কোন কাজ করতে দেয় না। সেইজন্যেই তো আমাকে আর আরেকজনকে ভাল মাইনে দিয়ে রেখেছে। অর্থের ওদের অভাব নেই। দু'জনে দু'জনের

ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে। গত বছর শরতকালে ওরা প্রথম এই জায়গাটায় এসেছিল। চারদিকে একবার তাকিয়েই রকি বলেছিল, 'মনে হচ্ছে প্রচুর শিকার মিলবে।' হ্যারিও সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়েছিল, 'বেশ তো, এখানেই তাহলে শিবির বসানো যাক্।' আমি কিন্তু ভেবেছিলাম ওরা নিশ্চয় সোনার খোঁজে এসেছে। পরে দেখলাম সারা শীতকাল কেটে গেল সোনা নিয়ে ওদের কোন মাথা ব্যথা নেই।'

লিঙের রাগ আরো বাড়ে, 'মূর্খদের জন্যে আমারও কোন মাথাব্যথা নেই। এখন ফিরতে পারলেই বাঁচতাম।'

'না ডাক্তার, না—' ড' ওকে আশ্বস্ত করতে চায়। 'ফিরে যাবে কি করে, খাবার কোথায়? তাছাড়া কালই আমরা পৌঁছে যাব। শেষ নদীটা পেরোলেই তো ওদের কেবিন। সব কিছু বাদ দিলেও মনে রেখো, তুমি এখন তোমার ঘাঁটিতে নেই, চাইলেও আমি তোমাকে যেতে দেবো না।'

ক্লান্ত হলেও লিঙের কালো চোখ দুটো ঝলসে উঠে ড'কে সতর্ক করে দিল। বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। ড' হাত বাড়িয়ে ডাক্তারের হাতটা চেপে ধরল।

'আমারই অন্যায় ডাক্তার। কিছু মনে করো না। অতগুলো কুকুর খোয়া গেল, মাথার কি আর ঠিক আছে!'

একদিন নয়, তিন তিন দিন পরে ওরা দু'জনে পৌঁছতে পারল। পাহাড়ের মাথায় হঠাৎ তুষার ঝড়ে আটকে পড়েছিল। ক্লান্ত পায়ে ওরা এগিয়ে আসে কেবিনের দিকে। গর্জনরত লিটল পেকো নদীর ধারে পেটমোটা কেবিনটা যেন থেবড়ে বসে আছে। উজ্জ্বল সূর্যালোক থেকে অন্ধকার ঘরে পা দিয়ে লিঙে প্রথমটা ঘরের বাসিন্দাদের তেমন ঠাহর করতে পারেনি। শুধু দু'টি পুরুষ আর একটি নারীর অস্তিত্ব টের পেয়েছে। ওদের সম্বন্ধে অবশ্য তার কোন আগ্রহ নেই। সোজা এগিয়ে যায় বাঙ্কের দিকে, যেখানে আহত লোকটি শুয়ে আছে। চিত হয়ে চোখ বন্ধ করে পড়ে

আছে। লিণ্ডে লক্ষ্য করে লোকটির ভুরুগুলো পেনসিলের সরু রেখার মতো, মাথার খয়েরি চুলগুলো যেন রেশমের সুতো। পেশীবহুল সুদৃঢ় ঘাড়ের ওপর রোগা মুখটা বড্ড বেমানান লাগছে। তবু রুগ্ন মুখেও সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ অবয়বগুলোর স্বাতন্ত্র্য লোপ পায়নি।

'ড্রেসিং করেছ কি দিয়ে?' মেয়েটিকে প্রশ্ন করে ডাক্তার।

'করোসিভ সাব্‌লিমেট, রেগুলার সলিউশান।' উত্তর দিল মেয়েটি।

ডাক্তারের চকিত দৃষ্টি এসে বিদ্ধ করল মেয়েটিকে। পর মুহূর্তেই সে আহত লোকটির দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। ঘনঘন নিশ্বাস পড়ছিল মেয়েটির। এবার জোর করে দম চেপে ধরেছে। লিণ্ডে এবার ঘরের পুরুষ বাসিন্দাদের দিকে তাকাল।

'তোমরা এখন যেতে পারো। কাঠ-টাঠ কাটোগে যাও।'

ওদের মধ্যে একজন অসন্তুষ্ট ভাবে গজগজ করে ওঠে।

'কেসটা খুব সিরিয়াস।' লিণ্ডে বুঝিয়ে বলে, 'আমি ওর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'আমি ওর ভাই।' একটি লোক বলল।

মেয়েটি এবার অনুনয়ের দৃষ্টিতে লোকটির দিকে তাকাতেই ঘাড় নেড়ে অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে লোকটি দরজার দিকে পা বাড়াল।

'আমাকেও যেতে হবে?' বেঞ্চের ওপর থেকেই প্রশ্ন করল ড'। এসেই গড়িয়ে পড়েছিল।

'হ্যাঁ—যাও এখন।'

কেবিন খালি না হওয়া অবধি ডাক্তার লোক দেখানো ভঙ্গিতে রুগীকে পরীক্ষা করার ভান করে যায়।

'তাহলে এই তোমার রেক্স স্ট্র্যাণ্ড!' ঘর খালি হতে ডাক্তার বলল।

মেয়েটি বাঙ্কের ওপর শায়িত লোকটির দিকে দৃষ্টি ফেরায়। যেন নিজেকে আশ্বস্ত করতে চাইছে যে এই লোকটাই রেক্স স্ট্র্যাণ্ড। নীরবতা ভঙ্গ না করেই এবার সে লিণ্ডের দিকে তাকাল।

'কথা বলছো না যে ?'

মেয়েটি অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'কী লাভ ? তুমি তো জানো ওই রেক্স স্ট্র্যাণ্ড !'

'ধন্যবাদ। তবু তোমাকে মনে করিয়ে না দিয়ে পারছি না যে এই প্রথম আমার ওকে দেখার সৌভাগ্য হ'ল। বসো বসো।' আঙুলে করে টুলটা দেখিয়ে দিয়ে নিজে বেঞ্চটার ওপর বসে পড়ল। 'একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছি। ইউকন থেকে এখানে আসার যে কোন বড় রাস্তা নেই।'

একটা পেন্সিল-কাটা ছুরি দিয়ে বুড়ো আঙুল থেকে একটা কাঁটা বার করতে চেষ্টা করছে ডাক্তার।

মিনিটখানেক অপেক্ষা করে মেয়েটি প্রশ্ন করল, 'কী করবে এখন ?'

'খাবো দাবো, বিশ্রাম নেবো, তারপর ফিরে যাবো।'

'না না, সেকথা নয়। বলছি ওর কি করবে ?' অচৈতন্য লোকটির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটি বলল।

'করব আবার কী ! কিচ্ছু না।'

বাঙ্কের কাছে এগিয়ে অসুস্থ লোকটির কোঁকড়া চুল ভর্তি মাথাটার ওপর আলতো করে হাত রাখল মেয়েটি।

'তার মানে তুমি ওকে খুন করতে চাও।' ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল। 'তোমার কিছু না-করা মানেই খুন করা, কারণ চেষ্টা করলে তুমি ওকে বাঁচাতে পারো।'

'তাই যদি মনে করো তো তাই।' একটু ভাবল লিণ্ডে। তারপর নিষ্ঠুর ভাবে হেসে তার চিন্তাটা ব্যক্ত করল, 'এই হতচ্ছাড়া দুনিয়াটায় সেই আদিম কাল থেকেই তো এই রীতিই প্রচলিত—কেউ বউ চুরি করলে লোকে তাকে মেরেই ফ্যালে।'

'তুমি কিন্তু অন্যায় কথা বলছো গ্র্যাণ্ট।' মেয়েটির শান্ত কণ্ঠ। 'তুমি ভুলে যাচ্ছো আমি স্বেচ্ছায় বেরিয়ে এসেছি, চলে আসতেই চেয়েছিলাম। কেউ আমায় বাধ্য করেনি। রেক্স আমায় চুরিও

করেনি। তুমিই আমাকে হারিয়েছো। অত্যন্ত খুশী মনে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে আমি ওর হাত ধরে বেরিয়ে এসেছি। আমার আগ্রহের কোনই ঘাটতি ছিল না। বরং বলতে পারো আমিই ওকে চুরি করেছি। আমরা একসঙ্গেই চলে এসেছি।'

'তা বলেছ ভালই।' লিণ্ডে স্বীকার করে। 'তোমার চিন্তা করার স্বভাবটা আজো যায়নি দেখছি। তা ম্যাজ্—রেক্সকে তো তাহলে বেশ মুস্কিলে পড়তে হয়েছে বলো।'

'যে গভীর ভাবে চিন্তা করতে পারে, সে ঠিক তেমনি ভালোও বাসে—'

'ঠিক ততটা বোকাও হয় না।' মাঝখান থেকে বলে উঠল লিণ্ডে।

'তাহলে তুমি মানছো তো, যে, যা করেছি ভালই করেছি?'

'দূর্—' হার মানার ভঙ্গিতে দু'হাত ছুঁড়ল লিণ্ডে। 'বুদ্ধিমান মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার এই ঝামেলা। ছেলেরা সব ভুলে যায়, নিজের কথার জালে নিজেই জড়িয়ে পড়ে। তুমি যদি শুধু কথার জাল বুনেই রেক্সকে পাকড়াও করে থাকো, তাতেও অবাক হবো না।'

এবার ম্যাজের নীল চোখের সরল দৃষ্টি আর তার সারা শরীর যৌবনের যে গর্বে টলমল করে ওঠে সেইটাই লিণ্ডের কথার উত্তর।

'না ম্যাজ, আমি কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। তুমি নির্বোধ হলেও ওকে পাকড়াতে পারতে। শুধু ওকে কেন, যাকে ইচ্ছে তাকে। তোমার এই সৌন্দর্য, দেহের গড়ন আর বাঁধুনি—আমার তো না-জানার কথা নয়! আমিও তো এই একই যন্ত্রে একদিন পেষাই হয়েছি। শুধু হয়েছি বলবো কেন, আমার দুর্ভাগ্য যে এখনো আমার ইচ্ছেগুলো মরেনি।'

অস্থির অধৈর্য কণ্ঠে বলে চলল লিণ্ডে। ঠিক সেই আগের মতো। ম্যাজ জানে লিণ্ডের কথা মাত্রেই স্বতঃস্ফূর্ত। লিণ্ডের শেষ কথাটার খেই ধরল ম্যাজ।

'মনে পড়ে গ্র্যাণ্ট—জেনেভা লেকের কথা?'

'না পড়ে উপায় কী! বলতে গেলে আমার খুশীগুলো তখন একটা অস্বাভাবিক মাত্রা পেয়েছিল।'

ম্যাজ ঘাড় নাড়ে। চোখগুলো তার জ্বলজ্বল করে ওঠে। 'পুরোনো দিনের খাতির বলেও তো একটা কথা আছে, মানো? প্লিজ গ্র্যান্ট, একটু মনে ক'রে ছাখো, সেই পুরোনো দিনগুলো··· একটু মনে করো···একটু·· আমাদের ভালবাসার কথা·· একজনের আরেকজনকে না হলে কি হত তখন?'

'তুমি কিন্তু অন্যায় সুযোগ নিচ্ছ।' লিঙে একটু হেসে তারপর আবার বুড়ো আঙুলটার ওপর আক্রমণ চালাল। কাঁটাটাকে টেনে বার ক'রে ভুরু কুঁচকে খুঁটিয়ে দেখল। শেষ পর্যন্ত রায় দিল লিঙে, 'না ম্যাজ না। অত আদর্শবাদী হওয়া আমার ধাতেই নেই।'

'তবু তুমি যে এতদূর পথ এত কষ্ট করে এসেছ সে তো একজন অপরিচিত অসুস্থ মানুষেরই কথা শুনে!' ম্যাজ আশা ছাড়ে না।

লিঙের অসহিষ্ণুতা স্পষ্ট প্রকাশ পায় তার কথার তীব্রতায়, 'তুমি ভাবোটা কি? এই লোকটা আমারই বৌয়ের প্রেমিক জানলে তারপর আর এক পাও নড়তাম!'

'সে যাইহোক, এসে যখন পড়েইছো আর ওর এই অবস্থা··· কি করবে বলো?'

'কিচ্ছু না। কেন করবো? আমি কি ওর চাকর? ওই বরং আমার সর্বস্ব লুঠ করেছে।'

ম্যাজ কথা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় দরজায় ধাক্কা পড়ে।

'গেট্ আউট্!' চেঁচিয়ে ওঠে লিঙে।

'কোন সাহায্য লাগে যদি....'

'গেট আউট্! শুধু এক বাল্তি জল এনে দরজার বাইরে রেখে দিও।'

'তাহলে তুমি ওর চিকিৎসা....?' আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বলতে শুরু করেছিল ম্যাজ।

'আজ্ঞে না। মুখ হাত পা ধোব।'

বিশুদ্ধ বর্বরতার আঘাতে বিচলিত হয়ে পড়ল ম্যাজ। ঠোঁট দুটো তার শক্ত হয়ে উঠেছে।

'শোনো গ্র্যাণ্ট!' ম্যাজের কণ্ঠস্বর এখন শান্ত শীতল। আমি কিন্তু তাহলে ওর ভাইকে সব বলে দেবো। স্ট্র্যাণ্ডদের আমি চিনি। তুমি যদি পুরোনো দিনের কথা ভুলে যেতে পারো, আমিও পারি। তুমি যদি কিছু না করো, হ্যারি তোমাকে খুন করবে। হ্যারি কেন, আমি বললে টম ড'-ও তাই করবে।'

'তুমি তো আমাকে চেনো ম্যাজ, তারপরও ভয় দেখাচ্ছো?' গম্ভীর স্বরে ম্যাজকে ধমক লাগাল লিণ্ডে। ব্যাঙ্গের সুরে যোগ করল, 'তাছাড়া আমাকে মারলেও তাতে তোমার রেক্স স্ট্র্যাণ্ডের কি সুবিধে হবে বুঝতে পারছি না।'

ম্যাজের মুখ দিয়ে একটা চাপা গোঙানি বেরিয়ে আসে, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরে। ম্যাজ ছাখে লিণ্ডের চকিত দৃষ্টি ওর শিহরণ লক্ষ্য করছে।

'না গ্র্যাণ্ট, আমি হিস্টিরিয়ার রুগী নই।' ম্যাজ দ্রুত বেগে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বোঝাতে শুরু করে। দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি লাগে। 'কোনদিন কি দেখেছ আমায় এভাবে? কক্ষণো না। হঠাৎ কি যে হ'ল জানি না, সামলে নিতে পারবো ঠিকই। আসলে মাথার ঠিক নেই। রাগও হয়েছে প্রচণ্ড--তোমার ওপর। সেইসঙ্গে দুর্ভাবনা আর ভয়। ওকে আমি হারাতে চাই না। সত্যিই আমি ওকে ভালবাসি, গ্র্যাণ্ট। ও আমার রাজা, আমার মনের মানুষ। একটার পর একটা ভয়ঙ্কর দিনগুলো ঠায় ওর পাশে বসে কেটে গেছে। ও গ্র্যাণ্ট, প্লিজ—প্লিজ দয়া করো--'

'স্নায়ুর চাপ।' লিণ্ডের শুষ্ক মন্তব্য। 'সহ্য করার চেষ্টা করো, ঠিক হয়ে যাবে। ছেলে হলে বলতাম একটা সিগারেট ধরাও।'

অশক্ত পদক্ষেপে ম্যাজ সরে এল। টুলের ওপর বসে লিণ্ডের দিকে তাকিয়ে রইল। আত্মনিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ফায়ার প্লেস থেকে একটা ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা

যাচ্ছে। বাইরে নেকড়ে-কুকুর দু'টো ঝগড়া বাধিয়েছে। লোমশ কম্বলের নীচে আহত মানুষটার বুকের ওঠাপড়া এখানে বসেই বেশ দেখা যাচ্ছে। ম্যাজ লক্ষ্য করে লিগুের ঠোঁট দু'টোয় একটা অপ্রীতিকর হাসি ফুটে উঠছে।

'বলতো, ঠিক কতটা তুমি ওকে ভালবাসো?' লিগু প্রশ্ন করল।

ম্যাজের বুকটা ঘন ঘন ওঠানামা করে। লজ্জাহীন গর্বে ওর চোখ দুটো ঝলসে ওঠে। লিগু ঘাড় নেড়ে জানাল সে তার উত্তর পেয়ে গেছে।

'একটু সময় দাও আমাকে, কেমন?' লিগু বলল। ঘরের চারদিকে একবার দৃষ্টি বোলায়, কিভাবে শুরু করবে ঠিক করতে পারছে না। 'একটা গল্প পড়েছিলাম অনেক দিন আগে। বোধহয় হারবার্ট শ'-এর লেখা। গল্পটা বলছি, শোনো। অপূর্ব সুন্দরী এক নারী আর এক সৌন্দর্য প্রিয় সবল স্বাস্থ্যবান পুরুষের কাহিনী। জানি না, তার সঙ্গে তোমার রেক্স ওয়ার্নারের কতটা মিল। সে যাক্, এ লোকটা ছিল চিত্রশিল্পী, উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ও ভবঘুরে। কয়েক সপ্তাহ প্রেমের বন্যা বইয়ে, চুমুতে চুমুতে ভাসিয়ে, তারপর হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে গেল লোকটি। মেয়েটি ওকে যেভাবে ভালবাসতো, অনেকটা তোমারই মতো, মানে, আগে তুমি আমায় যেমন ভালবাসতে আরকি! সেই জেনেভা লেকের মতো। দশ দশটা বছর মেয়েটা শুধু কেঁদে কেঁদেই কাটিয়ে দিল। কোথায় হারিয়ে গেল তার রূপ সৌন্দর্য। জানতো, তীব্র দুঃখ যন্ত্রণায় অনেক মেয়েরই লাবণ্যের ধারা শুকিয়ে যায়। 'দশ বছর বাদে লোকটি যে কোন কারণেই হোক তার দৃষ্টিশক্তি খুইয়ে, একদিন অসহায় অবস্থায় শিশুর মতো অন্যের হাত ধরে মেয়েটির কাছে ফিরে এল। ওর আর কিছু করার নেই। ছবি আঁকা জন্মের মতো শেষ। মেয়েটিও খুব খুশী যে আর যাইহোক লোকটি তার মুখের চেহারা দেখতে পাবে না। মনে আছে নিশ্চয়, লোকটি ছিল সৌন্দর্যের পূজারী। কিছু না বুঝে সে নিশ্চিন্ত মনেই মেয়েটিকে আবার আঁকড়ে ধরলো। মেয়েটির সৌন্দর্যের কথা একটুও

ভোলেনি কিন্তু। বারবার সে তার রূপের কথা বলতো, আক্ষেপ করতো তার আর দেখার কোন উপায় নেই বলে।

'একদিন শিল্পী তার প্রেমিকাকে বলল, জীবনে তার শেষ সাধ হচ্ছে পাঁচটা ছবি আঁকা। পাঁচটা মহান সৃষ্টি। যদি কোন রকমে একবার দৃষ্টি ফিরে পেতো, এই পাঁচটা ছবি এঁকে নিশ্চিন্ত মনে বলতে পারত, আর আমার কিছু চাই না। এরপর যেভাবেই হোক্, মেয়েটি কোত্থেকে এক আশ্চর্য মলম যোগাড় করল। এই মলম চোখে লাগালে দৃষ্টি ফিরে পাবে অন্ধ শিল্পী।

'এবার বুঝতে পারছো, মেয়েটি কী সমস্যায় পড়েছিল? দৃষ্টি পেলে শিল্পী যেমন ছবি পাঁচটা আঁকতে পারবে, তেমনি মেয়েটিকেও ত্যাগ করবে। সৌন্দর্য নিয়ে তার কারবার। এই কুৎসিত মেয়েটিকে সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। পাঁচ দিন নিজের সঙ্গে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত মলমটা সে শিল্পীর চোখে লাগাল।'

লিণ্ডে কথা থামিয়ে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ম্যাজের দিকে তাকাল। উজ্জ্বল কালো চোখের তারায় বিন্দুসম প্রতিফলিত হচ্ছে ঘরের মধ্যে ঝোলান আলোগুলো।

'আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তুমিও কি রেক্স স্ট্র্যাণ্ডকে ঠিক এতটাই ভালবাস?'

'যদি তাই হয়!' ম্যাজও বেপরোয়া।

'সত্যিই কি তাই?'

'হ্যাঁ।'

'এতখানি স্বার্থত্যাগ করতে পারবে? ওকে ছাড়তে পারবে?'

অনিচ্ছুক ধীর কণ্ঠে উচ্চারণ করল জেন্, 'হ্যাঁ।'

'তুমি কি আমার সঙ্গে ফিরে যাবে?'

'হ্যাঁ!' এবার ম্যাজের কণ্ঠস্বর ফিসফিসানির পর্যায়ে গিয়ে নামে। 'আগে ভাল হয়ে যাক—তারপর।'

'আমি কি বলছি বুঝেছ? সেই জেনেভা লেকের মতো। তুমি আবার আমার স্ত্রী হবে।'

ম্যাক কুঁকড়ে নুয়ে যায় তবু ঘাড় নেড়ে সায় দেয়।

'বেশ—ওই কথাই রইল।' সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল লিণ্ডে, নিজের বোঁচকাটার দিকে এগিয়ে গিয়ে বাঁধন খুলতে শুরু করল। 'আমাকে সাহায্য করা দরকার। ওর ভাইকে ডাকো। যে ক'জন আছে সবাইকেই ডাকো। ফুটন্ত জল চাই—প্রচুর পরিমাণে। ব্যাণ্ডেজ এনেছি, কিন্তু তোমার কাছে কি আছে একবার দেখে নিই—'

ইতিমধ্যে সবাই ঘরে এসে ঢুকেছে। 'এই যে ড'— লিণ্ডে নির্দেশ দিল, 'এক্ষুণি একটা আগুন জ্বালিয়ে জল ফোটাতে শুরু করো। আর তুমি—ওই টেবিলটাকে সরিয়ে জানলার সামনে রাখো। পরিষ্কার করো ওটাকে—ঘষে ঘষে ছাল ছাড়িয়ে ফ্যালো একেবারে। যত পারো পরিষ্কার করো—আর মিসেস স্ট্র্যাণ্ড, তুমি আমার পাশে থেকে সাহায্য করবে। চাদর নেই নিশ্চয়? যাক্ গে, সে ব্যবস্থা করে নেওয়া যাবে। তুমি তো ওর ভাই? শোনো, আমি ওকে অজ্ঞান করবো, কিন্তু তারপর অ্যানাসথেসিয়ার ভারটা তোমাকেই নিতে হবে। এবার যা যা নির্দেশ দিচ্ছি, ভাল করে শুনে নাও। কিন্তু তার আগে—হ্যাঁ, ভাল কথা, নাড়ি দেখতে জানো তো?'

দুঃসাহসী এবং পারদর্শী শল্য চিকিৎসক হিসেবে চিরদিনই লিণ্ডের খুব খ্যাতি। কিন্তু কী দুঃসাহসিকতায় কী পারদর্শিতায় এবার সে তার নিজের খ্যাতিকেও ম্লান করে দিয়েছে। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ লড়াই চালিয়ে গেছে। এইরকম বীভৎসভাবে ছিন্ন-ভিন্ন, হাড়গোড় ভাঙা একটা রুগী, এইভাবে এতদিন বিনা চিকিৎসায় পড়ে থাকা একটা মানুষকে নিয়ে ডাক্তার লিণ্ডে কখনো কাজ করেনি। তবে সেইসঙ্গে এটাও ঠিক যে সে এ অবধি কোন দিন এত স্বাস্থ্যবান একজন মৃত্যুপথযাত্রীকে চিকিৎসা করার সুযোগ পায়নি। লোকটার জান বাঘের মতো, তা না হলে ডাক্তারের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যেত। কী মানসিক, কী শারীরিক, স্বীকার করতেই হবে, যে, অদ্ভুত ওর যোঝার ক্ষমতা।

দিনের পর দিন কেটেছে যখন ও প্রচণ্ড জ্বরে ভুল বকেছে,

দিনের পর দিন হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেকেছে অতি ক্ষীণ হয়ে, নাড়ি খুঁজে পাওয়ায় দুষ্কর হয়েছে। দিনের পর দিন জ্ঞান ফেরার পরেও মরা মানুষের মতো ক্লান্ত চোখ খুলে পড়ে থেকেছে, তীব্র যন্ত্রণায় সারা মুখ জুড়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। লিণ্ডেও অক্লান্ত পরিশ্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সুযোগ্য, নিষ্ঠুর, দুঃসাহসী আর ভাগ্যবান লিণ্ডে একের পর এক ঝুঁকি নিচ্ছে এবং জয়লাভও করছে। মানুষটাকে শুধু প্রাণে বাঁচিয়েই সন্তুষ্ট নয় সে। ঠিক সেই আগের সুস্থ সবল সম্পূর্ণ মানুষটাকে ফিরিয়ে দেবে বলেই একের পর এক অত্যন্ত জটিল আর বিপজ্জনক অস্ত্রোপচারের ঝুঁকি নিচ্ছে।

'ও কি পঙ্গু হয়ে যাবে?' ম্যাজ্ জিজ্ঞেস করল একদিন।

'মোটেই না। আগের সেই জোয়ান মানুষটাকে ভেঙচি কাটার মতো ও যে শুধু লেঙচে লেঙচে হাঁটবে, আর কথা কইবে, তাই নয়—ছুটবে, লাফাবে, নদী সাঁতরাবে, ভাল্লুক ধরবে, চিতার সঙ্গে লড়াই করবে—সাধ মিটিয়ে আহাম্মুকি করতে পারবে। তাছাড়া আমি এখনই তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, আগের মতোই মেয়েদের কিন্তু ও একইভাবে আকৃষ্ট করবে। সেটা কী তোমার খুব ভাল লাগবে? মনে রেখো কিন্তু, ওকে ছেড়ে তোমাকে চলে আসতে হচ্ছে।'

'বলো, বলো, বলে যাও।' দ্রুত নিশ্বাস পড়ে ম্যাজের। 'ওকে তুমি পুরো সারিয়ে দাও। যেমনটি ছিল তেমনি।'

একাধিক বার, স্ট্র্যাণ্ডের অবস্থা একটু ভাল বুঝলেই, লিণ্ডে ওকে অজ্ঞান করে সাংঘাতিক সব কাণ্ড করছে। ছিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-গুলোকে নতুন করে কাটছে, জুড়ছে, সেলাই করছে। ক'দিন বাদে বাঁ হাতটায় একটা খুঁত ধরা পড়ল। হাতটা খানিক দূর ঠিকই তুলতে পারছে কিন্তু তার বেশী আর নয়। সমস্যাটা নিয়ে চিন্তা করে লিণ্ডে। অনেক রকম ভাবে জোড়াতালি দেওয়া হাতটাকে আবার সে কেটে কুটে ফ্যালে। গোড়ার থেকে নতুন করে শুরু হয় অস্ত্রোপচার—খুঁতটা দূর করতেই হবে। এর পরেও ষ্ট্র্যাণ্ড যে প্রাণে

বেঁচে গেল সে শুধু তার অসাধারণ জীবনীশক্তি আর স্বাস্থ্যের জন্যে।

'তুমি ওকে খুন করে ফেলবে।' রকির ভাই অভিযোগ করে একদিন। 'আর কাটাকুটি করো না, অমনি থাকতে দাও। হাতটা আস্ত রেখে মরার চেয়ে পঙ্গু হয়ে বাঁচাও ভাল।'

লিণ্ডে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। 'বেরিয়ে যাও! এক্ষুণি বেরিয়ে যাও এখান থেকে। আমায় যা করার করতে দাও, তারপর এসে বলো বেঁচেছে না মরেছে। কেন বুঝতে পারছো না, এখন আমি যা বলবো প্রাণ গেলেও তাই তোমাদের করতে হবে। তোমার ভাইয়ের এখন জীবন-মরণ সমস্যা—মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে। একটু এদিক ওদিক হলেই—ব্যস! এবার বুঝতে পারছো? এসব কথা ওর কানে গেলে, একটু দুশ্চিন্তা দেখা দিলেও সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। যাও এখন বাইরে গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে মুখে হাসি নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে এসো। ঠিক বেঁচে যাবে। দুজনে মিলে ওই আহাম্মুকি করার আগে ঠিক যেমনটি ছিল, আবার তেমনি দেখতে পাবে। যাও যাও, বেরোও বলছি।'

হ্যারি ঘুষি পাকিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ম্যাজের দিকে তাকাল পরামর্শ নিতে।

'প্লিজ—যাও এখন।' অনুরোধ করল ম্যাজ। 'ঠিকই বলেছে ডাক্তার। সত্যি কথাই বলেছে।'

এরপর একদিন স্ট্র্যাণ্ডের অবস্থা একটু ভালর দিকে গেলে ওর ভাই বলল, 'সত্যি ডাক্তার, তুমি অসাধ্য সাধন করেছ। কিন্তু কী বিশ্রি ব্যাপার বলতো, তোমার নামটাই জিগ্যেস করা হয়নি।'

'নাম নিয়ে কি ধুয়ে খাবে! নিজের চরকায় তেল দাও গে যাও। যাও যাও, বিরক্ত করো না এখন!'

ডান হাতটা কিন্তু ঠিকমতো সারছে না। চামড়া ফেটে আবার পুঁজ বেরোচ্ছে, দগদগে হয়ে উঠেছে ঘা-টা।

'নেক্রোসিস!' লিণ্ডে মন্তব্য করল।

'ব্যস্—এইবার খতম।' হাহাকার ক'রে উঠল হ্যারি।

'চুপ করো।' ধমক লাগাল লিশু। 'বেরিয়ে যাও। শীগ্‌গির ড' আর বিল্‌কে নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। জ্যান্ত খরগোশ ধরে আনো দেখি—বেশ মোটাসোটা দেখে আনবে। ফাঁদ পেতে ধরবে। চারদিকে ফাঁদ পেতে দাও।'

'কটা চাই?' হ্যারি জিগ্যেস করল।

'চল্লিশ—চারশো—চারহাজার—যত পারো নিয়ে এসো। মিসেস স্ট্র্যাণ্ড—আমাকে একটু সাহায্য করা দরকার। হাতটা আরেকবার কেটে ব্যাণ্ডেজ করবো। কই—তোমরা গেলে না এখনো!'

লিশু নিপুণ হাতে ত্বরিতে ছুরি চালাল। হাড়ে পচ ধরেছে চেঁচে চেঁচে সরিয়ে দিচ্ছে পচা মাংসগুলো। কতদূর পচ লেগেছে দেখে নিচ্ছে লিশু।

'এরকম হবার কথা ছিল না কিন্তু।' ম্যাজকে বলল লিশু। 'আসলে শরীরের বিভিন্ন অঞ্চলে লড়াই চালাতে হচ্ছে বলে ওর প্রাণশক্তি সুযোগ পায়নি ক্ষত নিরাময় করার। আগেই দেখেছিলাম, তবু অপেক্ষা করেছি সেরে যায় কিনা দেখতে। নাঃ—হাড়টাকে বাদ দিতেই হবে। হাড়টা বাদ দিলেও প্রাণে মরবে না কিন্তু খরগোশের হাড়টা জুড়তে পারলে আগের মতোই আবার সব কিছু করতে পারবে।'

শ'য়ে শ'য়ে খরগোশের মধ্যে থেকে দেখে শুনে বাছাই করে বার বার পরীক্ষা করে, তারপর একটা পছন্দ করল লিশু। ক্লোরোফর্মের শেষ ফোঁটাটাও নিঃশেষ করে শেষ পর্যন্ত বোন্-গ্র্যাফটিঙ হল—কাঁচা হাড়ের সঙ্গে কাঁচা হাড়, জীবন্ত মানুষের সঙ্গে জীবন্ত প্রাণী—অনড় অবস্থায় ব্যাণ্ডেজের বাঁধনে এক হয়ে পড়ে রয়েছে। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া একটি নিখুঁত বাহুর জন্ম দিচ্ছে।

অধীর আগ্রহে দিনের পর দিন অপেক্ষা করে আছে সবাই। ফলাফল এখনো জানা যায়নি। এরই মধ্যে বেশ কয়েকবার লিশু

আর ম্যাজের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছে। লিণ্ডে যেমন সদয় নয় তেমনি ম্যাজও বিদ্রোহী নয়।

'কী বিশ্রী ব্যাপার বলতো!' লিণ্ডে একদিন ম্যাজকে বলল। 'তবু আইন যা আইন। তুমি ডিভোর্স না নেওয়া অবধি আমরা আবার বিয়ে করতে পারব না। তোমার কি ইচ্ছে? জেনেভা লেকে যাবে?'

'তুমি যা বলো।'

আরেক দিন লিণ্ডে ম্যাজকে বলেছে, 'আচ্ছা, ওই লোকটার মধ্যে তুমি এমন কি দেখেছিলে বলতো? জানি, ওর অনেক পয়সা ছিল। কিন্তু আমরাও তো মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যেই দিন কাটাচ্ছিলাম। তখন তো বছরে প্রায় গড়ে চল্লিশ হাজার করে পেতাম ডাক্তারি ক'রে। রাজপ্রাসাদ আর স্টীম নৌকো বাদ দিলে আর কিছুর অভাব ছিল না তোমার।'

'তোমার কথার মধ্যেই বোধহয় তোমার প্রশ্নের উত্তরও লুকিয়ে আছে। মনে হয় তুমি তোমার ডাক্তারি নিয়ে খুব বেশী ব্যস্ত ছিলে, সময় দিতে পারনি একটুও। আমাকে তুমি ভুলে গেছলে তখন।'

'তাই নাকি!' তির্যক ভাবে বলল লিণ্ডে। 'কিন্তু তোমার রেক্সও তো দেখছি চিতাবাঘ আর ছোট ছোট কাঠি নিয়ে খোঁচা দেওয়ার খেলায় ঠিক তেমনি ব্যস্ত।'

লিণ্ডে ক্রমাগত খুঁচিয়ে চলে ম্যাজকে। রেক্সের প্রতি তার এই প্রবল আকর্ষণের কারণ কি বুঝিয়ে বলতেই হবে।

'এর কোন ব্যাখ্যা নেই।' বারবার এই একই কথা বলেছে ম্যাজ। শেষ পর্যন্ত একদিন রেগে যায়, 'কেন প্রেমে পড়েছে কেউ বোঝাতে পারে না। আমি তো নয়ই। আমি শুধু বুঝতে পেরেছি যে প্রেমে পড়েছি। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক একটা ব্যাপার, রেহাই পাবার কোন উপায় নেই। সবাই জানে গরুর লেজটা নীচের দিকে ঝোলে। কেউ যদি প্রশ্ন করে, লেজটা কেন নীচের দিকেই শুধু

ঝোলে? উত্তর দেওয়া যাবে না, তবু লেজটা কিন্তু সেই নীচের দিকেই ঝুলে থাকবে।'

'তুমি এত চালাক না!' বিরক্তিতে লিণ্ডের চোখ ছুটো জ্বলে উঠল।

'তা এত জায়গা থাকতে ক্লনডাইকে এসে হাজির হয়েছিলে কেন?' একদিন প্রশ্ন করল ম্যাজ।

'টাকার গরম। বৌ নেই যে খরচ করব। একটু বিশ্রাম চাইছিলাম। বোধহয় খাটাখাটুনি বেশী হয়ে গেছল। প্রথমে কলোরাডোতে গেলাম কিন্তু রেহাই পাইনি—টেলিগ্রামের পর টেলি-গ্রাম আসছে, এমনকি রুগীরাও সশরীরে এসে হাজির হচ্ছে। সিয়াটেলে গেলাম। সেখানেও একই ব্যাপার। র‍্যানসাম তার বৌকে পাঠিয়ে দিল স্পেশাল ট্রেনে চাপিয়ে। এড়াবার কোন উপায় রইল না। অপারেশন সার্থক—স্থানীয় সংবাদপত্রে খবর—বাকীটুকু অনুমান ক'রে নাও। গা ঢাকা দিতে পালিয়ে এলাম ক্লনডাইক। টম ড'র সঙ্গে যখন দেখা হল তখন কেবিনে বসে তাস খেলছিলাম।'

এরপর একদিন সকালে স্ট্র্যাণ্ডকে খাটশুদ্ধ ঘরের বাইরে এনে রোদ্দুরে শোয়ানো হল।

'এবার তাহলে ওকে বলি?' লিণ্ডকে জিজ্ঞেস করল ম্যাজ।

'না। এখনো সময় হয়নি।'

আরো কয়েকদিন কাটল। স্ট্র্যাণ্ড এখন খাটের ধারে পা ঝুলিয়ে বসতে পারছে। ছু'পাশে ছু'জনের কাঁধে ভর রেখে টলমল করে হাঁটছে।

'এবার তাহলে বলে ফেলি?' আবার জিজ্ঞেস করে ম্যাজ।

'না। আমি কোন আধ খেঁচড়া কাজ করতে চাইনা। চাইনা আবার নতুন কোন উপসর্গ দেখা দিক্। এখনো ওর বাঁ হাতে একটু ত্রুটি রয়ে গেছে। ব্যাপারটা সামান্য হলেও আমি ছাড়তে রাজী নই। ঠিক ভগবান যেমনভাবে ওকে সৃষ্টি করেছিল, আমি

আবার নতুন করে তাই করবো। কালকেই আমি হাতটার একটা ব্যবস্থা করবো। আবার অবশ্য ওকে ক'দিন বিছানায় শুয়েই কাটাতে হবে। জানি, একটুও ক্লোরোফর্ম নেই কিন্তু আমি নিরুপায়। ওকে দাঁতে দাঁত টিপে সহ্য করতে হবে। পারবে, ঠিক পারবে। ডজন খানেক মানুষের সহ্য ক্ষমতা আছে ওর একার।'

গ্রীষ্মকাল এসে পড়ে। দূরে পূর্ব দিকে পাহাড়ের চূড়োগুলো বাদ দিলে আর কোথাও এখন তুষারের চিহ্ন নেই। দিনটা ক্রমশ বড় হতে হতে শেষে আর রাত বলে কিছু থাকে না। উত্তর দিকে মাঝরাত বরাবর কয়েক মিনিটের জন্যে শুধু দিগন্তপারে সূর্যদেব মুখ লুকোয়। লিঙে এখনো স্ট্র্যাঙকে রেহাই দেয়নি। ওর হাঁটা চলা, প্রতিটি অঙ্গভঙ্গির ওপর নজর রাখছে। বারবার জামা খুলিয়ে হাজার বার শুধু মাংসপেশীগুলোর কার্য-ক্ষমতা পরীক্ষা করছে। ম্যাসেজের তো আর অন্ত নেই। লিঙেও স্বীকার করে যে ম্যাসেজ করতে করতে টম ড', বিল আর হ্যারি প্রত্যেকেই এখন হাসপাতালের কর্মীর মতো দক্ষতা অর্জন করেছে। তবু লিঙের মন ভরে না। স্ট্র্যাঙকে দিয়ে সে সবরকম পরিশ্রমের কাজ করায়। কোথাও যদি গোপন দুর্বলতা থাকে টের পেয়ে যাবে। লিঙে আবার এক সপ্তাহের জন্যে বিছানায় শুইয়ে ফেলল স্ট্র্যাঙকে। পায়ের ওপর ফের কাটাকুটি শুরু করল কয়েকটা ছোট শিরা নতুন ক'রে জুড়বে ব'লে। কফির দানার মতো ছোট এক টুকরো হাড়কে ঘষে ঘষে সমান করে শেষ পর্যন্ত চামড়া টেনে স্টিচ করে জুড়ে দিল।

'এবার বলতে দাও!' ম্যাঙ্গ অনুরোধ করল।

'উঁহু'—সময় হলে আমিই তোমায় বলতে বলব।'

জুলাই পার হয়ে গেল, আগস্টও শেষ হব হব করছে, এমনি সময় লিঙে একদিন হুকুম করল, আজ স্ট্র্যাঙকে হরিণ শিকারে বেরোতে হবে। লিঙে স্ট্র্যাঙের পিছু নিল। সজাগ নজর রাখছে। ছিপছিপে গড়ন স্ট্র্যাঙের, মাংসপেশীতে বাঘের শক্তি। লিঙে কখনো এমন ভাবে কোন মানুষকে হাঁটতে দেখেনি। এত

অনায়াস তার ভঙ্গি, দেহের প্রতিটি অঙ্গ যেন মদত যোগাচ্ছে, কাঁধের মাংসপেশী পর্যন্ত যেন সহযোগিতা করছে। প্রয়াসের কোন বালাই নেই তাই তার লঘু পায়ের গতি এত অপূর্ব। বড় ছলনাময় ওর হাঁটার গতি। দেখে একটুও বোঝা যায় না যে ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটতে যাওয়া মূর্খতা। টম ড'ও এই অভিযোগ করেছিল। ঘেমে নেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে লিওে ওর পিছনে পিছনে চলেছে। সমতলভূমি পেলেই খানিকটা করে ছুটে গিয়ে ওর নাগাল পেতে হচ্ছে। দশ মাইল পার হতেই লিওে ওকে থামতে বলে। সটান ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে।

'ব্যস্ ব্যস—আর নয়। তোমার সঙ্গে ছোটার সাধ্য নেই আমার।' মুখ মোছে লিওে। গরমে ঘেমে লাল হয়ে গেছে। স্ট্র্যাণ্ড একটা গাছের গুঁড়ির ওপর চড়ে বসে। ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে হাসে আর প্রকৃতিপ্রেমীর মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারধারের শোভা উপভোগ করে।

'কোথাও কোন খেঁচকা, ব্যথা, জ্বালা বা জ্বালার ভাব টের পাচ্ছো কি?' লিওে জানতে চাইল।

স্ট্র্যাণ্ড কোঁকড়া চুলভর্তি মাথাটা নেড়ে, পা ছড়িয়ে, শরীরটা টান্ ক'রে বসল। ওর দেহের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে প্রাণপ্রাচুর্য খুশীর গান গাইছে।

'তোমার আর ভাবনা নেই, প্রথম দু'একটা বছর শীতকালে হয়তো পুরনো ক্ষতগুলোয় একটু ব্যথা হবে, কিন্তু সেটা থাকবে না। এমনও হতে পারে যে কোন ব্যথাই তুমি টের পাবে না।'

'সত্যি ডাক্তার, অসাধ্য সাধন করেছ তুমি। কি করে যে ধন্যবাদ দেবো জানিনা। তোমার নামটা অবধি জানা হয়নি।'

'নামে কি যায় আসে। তোমাকে যে সারিয়ে তুলেছি সেটাই বড় কথা।'

'কিন্তু তোমার যে বেশ নাম-ডাক আছে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। হয়তো তোমার নামটাও আমার পরিচিত।'

'হবে হয়তো।' লিণ্ডে কথাটা এড়িয়ে গেল। 'কাজের কথায় আসা যাক। এবার তোমার শেষ পরীক্ষা। এটাতে যদি সফল হও, ব্যস্ আমার কাজ শেষ। শুনেছি এই খাঁড়ির মাথার দিক দিয়ে বিগ্ ওয়াইণ্ডি নদীর একটি শাখা নদী বয়ে যাচ্ছে। ড'র মুখে শুনেছি, গত বছর তুমি এই নদীটার মাঝের ফালি অবধি গিয়ে ফিরে এসেছিলে। মাত্র তিন দিনে। ড' বলেছিল তুমি নাকি ওর প্রাণ বার করে ছেড়ে দিয়েছিলে। আজকের রাতটা তুমি এখানেই থাকবে। ছাউনি ফেলার সাজ-সরঞ্জাম সমেত আমি এখুনি ড'কে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আগের বছরের মতো তিন দিনের মধ্যে তোমাকে ওই অবধি গিয়ে ফিরে আসতে হবে। তবে বুঝবো একেবারে শরীর সেরেছে।'

'এক ঘণ্টার মধ্যে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে হবে।' লিণ্ডে হুকুম করল ম্যাজকে। 'আমি যাচ্ছি নৌকোর ব্যবস্থা করতে। বিল্ হরিণ মারতে গেছে কাজেই তিন দিনের আগে ফিরছে না। আজই আমরা আমার কেবিনে পৌঁছে যাবো। সপ্তাহ খানেক লাগবে ডসন্ পৌঁছতে।'

'আমি আশা করেছিলাম......' কথাটা শেষ করল না ম্যাজ।

'আশা করেছিলে আমি পারিশ্রমিকটা চাইবো না?'

'চুক্তি যা চুক্তি—মানতেই হবে। তবে এরকম বিশ্রীভাবে ব্যাপারটা না ঘটালেও চলতো। তুমি কিন্তু অন্যায় করলে। তিন দিনের জন্যে ওকে এমন এক জায়গায় পাঠিয়ে দিলে যে শেষ ক'টা কথা বলারও সুযোগ দিলে না।'

'চিঠি লিখে রেখে যাও।'

'কোন কথাটাই লিখতে আমি বাদ দেব না।'

'হ্যাঁ তাই লিখো, না হলে সেটা আমাদের তিনজনের প্রতিই অন্যায় করা হবে।'

নৌকার ব্যবস্থা করে ফিরে এসে লিণ্ডে দেখল, ম্যাজ জিনিস পত্র বেঁধে ফেলেছে, চিঠি লেখার কাজও শেষ।

'চিঠিটা একবার পড়তে পারি? যদি তুমি চাও, তবেই অবশ্য।'

ক্ষণেকের জন্যে ইতস্তত করে ম্যাজ চিঠিটা বাড়িয়ে দিল।

'একেবারে সোজাসুজি লিখেছ।' চিঠিটা শেষ করে মন্তব্য করল লিণ্ডে। 'এবার চলো তাহলে।'

ম্যাজের বোঁচকাটা নদীর তীর অবধি বয়ে নিয়ে এল লিণ্ডে। হাঁটু গেড়ে বসে এক হাত দিয়ে নৌকোটাকে স্থির করে, অন্য হাতটা বাড়িয়ে দিল ম্যাজের দিকে। নৌকায় উঠতে সুবিধে হবে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ম্যাজের মুখের দিকে তাকাল লিণ্ডে। আশ্চর্য — অস্থিরতার কোন লক্ষণ নেই। একটুও ভেঙে পড়েনি ম্যাজ। লিণ্ডের হাত ধরে নৌকায় পা দেবে বলে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

'দাঁড়াও।' লিণ্ডে বলল। 'এক সেকেণ্ড দাঁড়াও। সেই যে তোমাকে যাত্ মলমের গল্পটা বলেছিলাম মনে আছে তো? গল্পের শেষটা বলা হয়নি। শিল্পীর চোখে ধূপ লাগিয়ে মেয়েটি বিদায় নিতে যাবে, সহসা তার আয়নায় চোখ পড়ে গেল। কী আশ্চর্য — সে তার আগের রূপ ফিরে পেয়েছে। শিল্পী চোখ মেলেই তার সুন্দরী প্রেয়সীকে দেখতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরল।'

অধীর উত্তেজনা কোনক্রমে প্রশমিত করে নীরবে অপেক্ষা করে ম্যাজ। লিণ্ডের মুখের শেষ কথাটি জানবার জন্য অধীর আগ্রহ অনুভব করছে। তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে বিস্ময়ের প্রথম আভাস।

'সত্যিই তুমি সুন্দরী ম্যাজ।' একটু থেমে লিণ্ডে এবার শুষ্ক কণ্ঠে যোগ করল, 'বাকীটুকু আর বলার প্রয়োজন আছে কি? রেক্স স্ট্র্যাঙকে আর বেশীদিন বিরহ জ্বালা সহ্য করতে হবে না। গুড বাই —'

'গ্র্যাণ্ট ...' অস্ফুট কণ্ঠে ডাকল ম্যাজ। ডাকের মধ্যেই তার অন্তরের সব কথা লুকিয়ে আছে, কথা ব'লে বোঝাবার কোন প্রয়োজন নেই।

কুৎসিত ভাবে হাসে লিণ্ডে। 'আমি তোমাকে দেখাতে চেয়েছিলাম যে লোকটা আমি ততটা খারাপ ন'ই। শুধু আগুন—জ্বলন্ত আগুন।'

'গ্র্যাণ্ট—'

নৌকোয় পা দিয়ে লিণ্ডে তার লম্বা হাতটা বাড়িয়ে দিল। উত্তেজনায় কাঁপছে হাতটা।

'গুড্ বাই—'

ম্যাজ তার দু' হাতে জড়িয়ে ধরল লিণ্ডের হাতটা।

'গ্র্যাণ্ট—আমার গ্র্যাণ্ট—' ম্যাজের কণ্ঠে গুঞ্জন ওঠে। মুখ নীচু ক'রে হাতের ওপর চুমু খায়।

এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে পাড়ের ওপর ঠেলা মেরে নৌকো ছেড়ে দিল লিণ্ডে। জলের মধ্যে দাঁড় নামিয়ে নৌকা বাইতে শুরু করে দিল। সামনেই দেখা যাচ্ছে নদীর শান্ত জলস্রোত একটা বাধার সম্মুখীন হয়ে প্রবল উচ্ছ্বাসে সাদা ফেনার মেঘ উড়িয়েছে।